যায় না? সতীশ বাবুর অনুরাগ আছে, ক্ষমতা আছে, এজন্ত তাঁহাকে সাধু হরিনাথের একখানি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে অনুরোধ করি। তিনি যাহা উপহার দিয়াছেন, সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আরো চাই। যদি তাহা না পাওয়া যায়, এই অমূল্য জীবন-রত্ন কালসাগরে ডুবিয়া যাইবে।

১৮। কবিতা-কোরক।—শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টাচার্য্য বিরচিত, মূল্য ৵৹। স্কুলের পাঠ্য করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত, স্কুলের শিক্ষকগণের নিকট আমরা এরূপ পুস্তক আশা করি না। না আছে ভাব সমন্বয়, না আছে যতির মিলন, না আছে কবিত্বের উচ্ছ্বাস।

১৯। জীব-সংস্কার।—শ্রীঅন্নদা প্রসাদ সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ।৹। পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ পুস্তক প্রচারে উপকারের পরিবর্ত্তে, অপকার অধিক হয়। এরূপ শিক্ষায় মানুষের মনে এমন অনেক কথা জাগে, যাহা কখনও জাগা সম্ভব ছিল না।

২০। সরল শুভঙ্করী।—শ্রীভগবান-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।৹। শুভঙ্করীর মূল কথাগুলি সুন্দর উদাহরণ সব বিবৃত করা হইয়াছে। ছাত্রগণের প্রভূত উপকার হইবে।

২১। কোহহম।—(আমি কে?) বশীরহাট ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, বি-এ, প্রণীত, মূল্য ।৹। আমিতত্ত্ব, সকল তত্ত্বের মূল। এই তত্ত্ব যে জন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর কোন শিক্ষা বাকী নাই। দুঃখের বিষয়, এ শিক্ষা লাভে সকলেই উদাসীন। পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল, জ্যোতিষ গণিত মানুষ কণ্ঠস্থ করিবে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে চিরদিনই মূর্খ। ঘরে এ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই, স্কুলে নাই, সমাজে নাই—কোথাও নাই। দেখিয়া সুখী হইলাম, যজ্ঞেশ্বর বাবু এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্টিত। তিনি অনেক খাটিয়া, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, অনেক সাধন করিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অতি মধুর। বিষয়টী প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইতে তিনি খুব কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এ পুস্তকের আদর হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

২২। "উনবিংশ শতাব্দীর মহা-ভারত"—সমালোচনা।—শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। যাঁহারা কবি-বর নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এ পুস্তক পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কবিবর ঐ পুস্তকত্রয়ে মহাভারতকে কিরূপ বিকৃত করিয়াছেন, 'উত্তরা কি কমলমণি হইতে পারে,' প্রভৃতি প্রবন্ধে নব্যভারতের পাঠকগণ তাহা কতক অবগত আছেন। বীরেশ্বর বাবু তন্ন তন্ন করিয়া নবীন বাবুর মতের অলীকতা এবং অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী লেখক। তিনি এই গ্রন্থে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এ দেশে বড়ই দুর্লভ। গ্রন্থকার উপসংহারে বলিয়াছেন—"নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে হইলে, দোষগুণ উভয়েরই আলোচনা করিতে হয়; সেই জন্য আমরা কাব্য-ত্রয়ের গুণের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মন খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারা যায়, এমন বিষয় খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে কবির একটী অতি উচ্চ গুণ আছে। কবির ভাষা বড় "মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড় মদিরা-ময়।" বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ এই পুস্তকের কি উত্তর দেন, আমাদের জানিতে একান্ত আগ্রহ রহিল। কেননা, নবীনচন্দ্র-প্রতিভা প্রতিষ্ঠায়, এযুগে, তিনিই বদ্ধপরিকর। তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইলে, উভয় পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

২৩। হীরক যুবিলি উপহার।—কুমিল্লা আদালতের উকীল শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ বিরচিত। রাজভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

২৪। মাতৃভক্তি।—শ্রীতারানাথ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৴১০। মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস পড়িয়া কে না সুখী হইতে পারে?

২৫। সুধা ও সৌন্দর্য্য।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৵০। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, এ সুধা ও সৌন্দর্য্যের কবিত্বে আমরা মোহিত হইতে পারিলাম না।

২৬। অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়-বাদ।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৵০। এই পুস্তকে গ্রন্থকার ব্রহ্মতত্ত্বে কারণবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্বে প্রজ্ঞাবাদ এত বিশদ ও পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে, আমরা বারম্বার গ্রন্থকারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতেছি। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম মীমাংসায় ক্ষিতীন্দ্র বাবু যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পক্ষেই সম্ভব। এই পুস্তক পাঠে আমরা বিমল আনন্দ পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, যিনি এ পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই বিমল আনন্দ পাইবেন।

২৭। দেব-সুন্দরী।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ৷৵০। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি। পূর্ণ বাবু বলেন—

"হিন্দুদিগের দেবদেবী Idolatry নহে, তাহা Symbollism। তাহা ঋষিদিগের ধ্যানজ রূপ কল্পনা। সূক্ষ্মরূপ স্থূলে প্রকটিত। অনন্তদেব শত সহস্র বিভূতিতে প্রকাশিত। অজ্ঞজনগণের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য এই প্রথম সোপান, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমালা।"

পূর্ণ বাবু হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এ গ্রন্থে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এক দিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র চেষ্টা করিয়াছিলেন—আজ পূর্ণ বাবুকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। ধর্ম্ম বিশ্বাসের উৎকর্ষ ভিন্ন, এ পতিত ভারতের উদ্ধারের আর উপায় নাই। যিনি, যে উপায়ে এ কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন, তিনিই পূজ্য। পূর্ণ বাবুর অকাট্য যুক্তি বলে, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলে হিন্দু ধর্ম্মের অনেক সারতত্ত্ব উদ্ধার হইবে, আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠে আরো বদ্ধমূল হইল।

২৮। শুশ্রূষা।—প্রথম ভাগ, শ্যামাচরণ দে প্রণীত, মূল্য ১৲। উৎকৃষ্ট ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ এবং উৎকৃষ্ট বাঁধা। বিষয় নির্ব্বাচন ভাল, এবং ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত। এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য আরো সুলভ হইলে ভাল হইত।

২৯। গোবিন্দগীতামৃত।—শ্রীঅমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি-প্রণীত। এই পুস্তক, গোপী প্রেম, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, নিকুঞ্জলীলা, বৃন্দাবনলীলা, অবসান এবং রাই উন্মাদিনী নামক ছয় খণ্ডে বিভক্ত। এ যুগে কৃষ্ণ ভক্তির এরূপ সুন্দর এবং প্রাঞ্জল বিবৃতি আর প্রকাশিত হয় নাই। এ পুস্তকে লেখকের কবিতা লিখিবার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।—শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ-প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। জীবাত্মার অস্তিত্ব, নিত্যত্ব, জন্মান্তর পরিগ্রহ ও মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত এবং ভারতীয় দর্শন সমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নব্যভারত পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত। তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য, চিন্তা এবং প্রতিভার যে পরিচয় পাঠকগণ অল্প পরিমাণে পূর্ব্বে পাইয়াছেন, তাহার পরিস্ফুট পরিচয় এ পুস্তকের পৃষ্ঠায় ২ রহিয়াছে। গভীর ন্যায়দর্শন সিন্ধু মন্থন করিয়া সতীশ বাবু এই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। যিনি যত্ন পূর্ব্বক পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

৩১। সাধু তুকারামের জীবন-চরিত।—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০। "তুকারাম ও রামপ্রসাদ" প্রবন্ধ ১২৯২ ও ১২৯৩ বঙ্গাব্দে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক তাহারই পরিণতি। আমরা মহাত্মা তুকারামের জীবনের অমূল্য উপদেশের জন্য দীননাথ বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ক্রমশঃ

রাজতরঙ্গিণী।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভে কহ্লণ পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জয়সিংহ দেবের রাজত্বকালের দ্বাবিংশতিতম বর্ষে, কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী" রচনা করেন। ১০৭০ শকাব্দে (১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) কহ্লণ পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণী" সমাপ্ত করেন। তখন ৪২২৪ লৌকিকাব্দ প্রচলিত ছিল।

"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে, শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্র পরিবৎসরাঃ ॥"
(রাজতরঙ্গিণী, ১৫২)

কহ্লণ ও তাঁহার পিতা চম্পক পণ্ডিত উভয়েই কাশ্মীর রাজের অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সমকালীন প্রথম গোনর্দ্দ (গোনন্দ) হইতে "রাজতরঙ্গিণী" আরম্ভ হইয়াছে। কহ্লণ পণ্ডিতের সমসাময়িক কাশ্মীররাজ জয়সিংহদেবের সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস এই পদ্যময় পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় কোনও ইতিহাস রচিত হয় নাই। সুকবি কহ্লণ পণ্ডিতের "রাজতরঙ্গিণী" এই অপবাদ বিদূরিত করিয়াছে। "রাজতরঙ্গিণী" ভারতীয় হিন্দুদিগের অতি আদরের ধন ও পুরাতত্ত্ববিৎগণের পক্ষে অতি অমূল্য গ্রন্থ। প্রাচীন সময়ের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া, আধুনিক ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে গ্রন্থকার ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই "রাজতরঙ্গিণী" অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বটে। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে তাহার সমালোচনা অদ্যাপি হয় নাই। স্বর্গীয় রামদাস বাবুর 'ঐতিহাসিক' রহস্যে এক পৃষ্ঠায় এবং 'বিশ্বকোষ' নামক বিখ্যাত বাঙ্গলা অভিধানে অষ্টাদশ পংক্তিতে কহ্লণ পণ্ডিত ও "রাজতরঙ্গিণীর" পরিচয় সমাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য 'রাজতরঙ্গিণীর' সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইব।

কহ্লণ পণ্ডিতের 'রাজতরঙ্গিণী' আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের নাম তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে ৩৭৪, দ্বিতীয় তরঙ্গে ১৩২, তৃতীয় তরঙ্গে ৫৩০, চতুর্থ তরঙ্গে ৭২১, পঞ্চম তরঙ্গে ৪৮৪, ষষ্ঠ তরঙ্গে ৩৬৯, সপ্তম তরঙ্গে ১৭৩৩ এবং অষ্টম তরঙ্গে ৩৪৫০টী শ্লোক বিদ্যমান আছে। ইহাতে মোটে ৭৭৯৩টী শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচিত হইয়াছে, অধিকাংশ শ্লোক অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত।

গ্রন্থারম্ভে কহ্লণ পণ্ডিত মহাদেবের নমস্কার করিয়াছেন। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে কবিদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। কবি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি অতীত কালের ব্যাপার প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিতে পারেন? কবিই নিজের প্রতিভাবলে অতীত ঘটনাকে দৃষ্টবৎ অনুভূত করাইতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। কহ্লণ পণ্ডিতের আবির্ভাব কালের পূর্ব্বে যে সংস্কৃতভাষায় অপক্ষপাতিতার সহিত ইতিহাস রচিত হইত, 'রাজতরঙ্গিণীর' উপক্রমণিকা হইতে তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

"কোঽন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ?
কবি প্রজাপতীংস্ত্যক্ত্বা, রম্যনির্ম্মাণশালিন ॥৪॥
শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী ॥ ৭ ॥
দাক্ষ্যং কিয়দিদং তস্মাদস্মিন্ ভূতার্থবর্ণনে।
সর্ব্বপ্রকারং স্খলিতে, যোজনায় মমোদ্যমঃ ॥" ১০ ॥

কহ্লণ পণ্ডিতের পূর্ব্বে নীলমুনি, সুব্রত,

ক্ষেমেন্দ্র, হেলারাজ, পদ্মমিহির, ও শবিল্লাকর প্রভৃতি কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করেন। কহ্লণ পূর্ব্বতন দ্বাদশ জন ঐতিহাসিকের প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে স্বকীয় "রাজতরঙ্গিণী" রচনা করেন। এই ইতিহাস রচনায় পূর্ব্বতন নরপতিদিগের দানপত্র, শাসনলিপি, ওপ্রশস্তি প্রভৃতি কহ্লণের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে।

"দৃগ্‌গোচরং পূর্ব্বসূরিগ্রন্থা রাজকথাশ্রয়াঃ।
মম ত্বেকাদশ গতা, মতং নীলমুনেরপি ॥ ১৪ ॥
দৃষ্টৈশ্চ পূর্ব্বভূভর্ত্তৃ প্রতিষ্ঠাবস্তুশাসনৈঃ।
প্রশস্তিপট্টৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ শান্তোঽশেষ—ভ্রমক্লমঃ ॥১৫॥
তদমন্দরসস্যন্দসুন্দরেয়ং নিপীয়তাং।
শ্রোত্রশুক্তিপুটৈঃ স্পষ্টমত্র রাজতরঙ্গিণী।" ২৪ ॥

১১—১৯ শ্লোকে পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদিগের নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক, কহ্লণ 'রাজতরঙ্গিণী' আরম্ভ করিয়াছেন। ২৫-৪৩ শ্লোকে কাশ্মীর দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতের গর্ভে ছয় মন্বন্তর পর্য্যন্ত 'সতীসর' নামে জলপূর্ণ হ্রদ বিদ্যমান ছিল। তথায় 'জলোদ্ভব' নামে অসুর বাস করিতেন। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আরম্ভে প্রজাপতি কশ্যপ দেবগণের সাহায্যে জলোদ্ভবকে বিনাশ করিয়া, 'সতীসর' মৃত্তিকায় পরিণত করেন। কশ্যপের স্থাপিত স্থল 'কশ্যপমীর' বা কাশ্মীর নামে খ্যাতি লাভ করে। প্রথমে নাগপতি নীল কাশ্মীর রাজ্য পালন করিতেন। পুণ্য-সলিলা বিতস্তা নদী কাশ্মীর দেশের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত। দেবী সরস্বতী কাশ্মীরে সদা বিরাজিত রহিয়াছেন।

'নীল পুরাণ' হইতে কহ্লণ এই বিবরণ সংগৃহীত করিয়া থাকিবেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই কাশ্মীর বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশ্মীরেও পঞ্জাবে আর্য্যজাতি প্রথমে উপনিবিষ্ট হয়। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য কাশ্মীর প্রাচীন কালে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে।

কাশ্মীরে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আর্য্য-জাতি ভাষা শিক্ষা করিতে যাইত। এই নিমিত্তই বোধ হয় কাশ্মীর 'সারদাপীঠ' নামে খ্যাত, এবং কাশ্মীরের প্রচলিত অক্ষর 'শারদা অক্ষর' নামে পরিচিত 'মহাভারতে' কাশ্মীর ও জম্মু পবিত্র প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিতস্তার পুণ্যশালিতা মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশ্মীরের অশ্ব উৎকৃষ্ট বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। 'হরিবংশে' কাশ্মীরের নরপতি গোনর্দ্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মগধরাজ জরাসন্ধের পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কহ্লণের মতে এই প্রথম গোনর্দ্দ (গোনন্দ) কুরু পাণ্ডবদিগের সময়ে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধের সমসাময়িক নরপতি। জরাসন্ধের অনুরোধে কাশ্মীরাধিপতি গোনন্দ সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিয়া, যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

এই গোনর্দ্দের পর তাহার পুত্র দামোদর পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। গান্ধার রাজ্যের রাজধানীতে রাজকুমারীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে দামোদর উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তথায় আহূত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে পিতৃহন্তা বলরাম ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া, দামোদর কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম কাশ্মীরে উপনীত হইয়া, মৃত নরপতির পত্নী যশোবতীর হস্তে কাশ্মীরের শাসনভার অর্পণ করেন। কালক্রমে যশোবতীর গর্ভে দামোদরের পুত্র দ্বিতীয় গোনর্দ্দের জন্ম হয়। বালক বলিয়া এই গোনর্দ্দ কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধে নিমন্ত্রিত হন নাই। এই গোনর্দ্দের পরবর্ত্তী ৩৫জন রাজার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

"ইতি কাশ্মীরিকো রাজা বর্ত্তমানঃ স শৈশবে।
সাহায্যকার সময়ে ন নিন্যে কুরুপাণ্ডবৈঃ ॥৮২॥
আম্নায়ভ্রংশাদ্বিঃ নামকৃত্যা স্তুতঃ পরঃ।
পঞ্চত্রিংশন্মহীপালা মগ্না বিস্মৃতিসাগরে ॥৮৩॥"

মহাভারত ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত অপ্রকৃত ব্যাপার নহে। এই ঘটনা হইতে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সময় নির্ণীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতের মতে দ্বাপর যুগের অন্তে ও কলিযুগের আরম্ভে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শুক্রবারে ও মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। এই যুগ দ্বাপরের অর্দ্ধ ও ত্রেতার তৃতীয়াংশ ও সত্যযুগের চতুর্থাংশ সময় ব্যাপী। হিন্দুদিগের মতে কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসর গতে সংবতাব্দ, ৩১৭৯ বর্ষ গতে শকাব্দ ও ৩১০১ বর্ষ অতীতে খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছে।

শতানন্দ নামে একজন জ্যোতির্ব্বিৎ উড়িষ্যায় আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শঙ্কর ও মাতার নাম সরস্বতী। তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার অন্তর্গত জগন্নাথ ক্ষেত্রে (পুরীতে) জন্ম গ্রহণ করেন। শতানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। 'সূর্যাসিদ্ধান্ত' ও বরাহমিহিরের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া, তিনি 'ভাস্বতী' নামে একখানি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪২০০ কলিযুগাব্দে বা ১০২১ শকাব্দে (১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) শতানন্দের 'ভাস্বতী' প্রণীত হয়। শতানন্দ কহ্লণ পণ্ডিতের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। 'ভাস্বতী'র উপক্রমণিকা হইতে জানা যাইতেছে যে 'ভাস্বতী' রচনার ৪২০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগের অব্দ গণনা আরম্ভ হয়। শকাব্দের ৩১৭৯ (৪২০০–১০২১) বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ হয়। শতানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যাবতীয় আর্য্যাবর্ত্তে সেই সময়ে বরাহমিহিরের মত সবিশেষ প্রচলিত ছিল।

"নত্বা মুরারে শ্চরণারবিন্দং,
শ্রীমান্ শতানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
তাং ভাস্বতীং শিষ্যহিতার্থমাহ,
শাকেবিহীনে শশি-পক্ষ-খৈকে ॥
অথ প্রবক্ষ্যে মিহিরোপদেশাৎ।
তৎসূর্য্যসিদ্ধান্তসমং সমাসাৎ।
... ... ॥
খখাব্ধিবেদাজ্ঞগতে যুগাব্দে
দিব্যোক্তিতঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য।
শ্রীমান্ শতানন্দ ইমাং চকার,
সরস্বতি-শঙ্করয়ো স্তনূজঃ ॥" (ভাস্বতী)

পরাশর হিন্দু জ্যোতিষের জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ডেভিস সাহেবের মতে পরাশর ১৩৯১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, ও বেণ্টলি সাহেবের মতে খ্রীঃ পূঃ ১১৮০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময়ে পরাশর বর্ত্তমান ছিলেন। কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১৩৬৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে; এবং ২৩৯১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পরাশর বিদ্যমান ছিলেন। উইলসনের মতে খ্রীষ্টীয় পূর্ব্বতন চতুর্দ্দশ, বুকানন হেমিলটনের মতে খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ (১৩০০) হজসন প্র্যাটের মতে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রিন্সেপের মতে ১০৪৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ইহা ঘটিয়াছিল। বেণ্টলি সাহেবের মতে খ্রীঃ পূঃ ৯৫০ অব্দে রামচন্দ্র এবং খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫ অব্দে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। তাঁহার মতে ২৯১

খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ ও ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারত সঙ্কলিত হয়।

গর্গ পরাশরের বহু অধস্তন জ্যোতির্ব্বিৎ। অধ্যাপক কারণের মতে খ্রীঃ পূঃ ৫০ অব্দে গর্গ আবিভূর্ত হইয়া, 'গর্গ-সংহিতা' রচনা করেন। শকজাতির উল্লেখ দৃষ্টে অধ্যাপক মেক্স মূলার গর্গকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গর্গ সংহিতায় সাকেত ও মথুরা নগর অবরোধের বিষয় স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। খ্রীঃ পূঃ ১৪৪ অব্দে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক নরপতি মিনেণ্ডার উক্ত দুই নগর অবরোধ করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গর্গ সংহিতা খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। গর্গ সংহিতার মতে কলির আরম্ভে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে। মহাভারতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক গর্গ সংহিতায় প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

"অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥" (মহাভারত)

বরাহমিহির গর্গের বহু অধস্তন জ্যোতির্ব্বিৎ। তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মালব দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে আবির্ভূত হন। ৪২১-৫০৯ শকাব্দ (৪৯৯-৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত বরাহমিহির জীবিত ছিলেন। বরাহমিহিরের পিতা আদিত্যদাস সম্ভবতঃ "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" রচনা করেন। বরাহমিহির গর্গ সংহিতার প্রাগুক্ত মতকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বরাহমিহিরের মতে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তখন 'সপ্তর্ষি' নামে নক্ষত্র মণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। শকাব্দের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর (২৫২৬+৬৫৩) পূর্ব্বে কলিযুগের অব্দ গণনা আরম্ভ হয়।

বরাহমিহিরের এই অভিমত কহ্লণ পণ্ডিত স্বরচিত "রাজতরঙ্গিণীর" আরম্ভে গ্রহণ পূর্ব্বক গর্গোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের ২৫২৬ এবং খ্রীষ্টাব্দের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল প্রায় হয়। কহ্লণের মতে এই সময়ে তৃতীয় গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

তত্র কৌরবকৌন্তেয়সমকালভবাং কলৌ।
আগোনন্দাৎ স্মরন্তিস্ম ন দ্বাপঞ্চাশতং নৃপান্॥ ৪৪॥
তস্মিন্ কালে ধ্রুবং তেষাং কুকৃত্যৈঃ কাশ্যপীভুজাং।
কর্ত্তারঃ কীর্ত্তিকায়স্য নাভুবন্ কবিবেধসঃ॥ ৪৫॥
অষ্টষষ্ঠ্যধিকামব্দশতদ্বাবিংশতি নৃপাঃ।
অপীপলংস্তে কাশ্মীরান্, গোনন্দাদ্যাঃ কলৌযুগে॥৪৮॥

কুরুপাণ্ডবদিগের আবির্ভাব কালে কাশ্মীরে প্রথম ও দ্বিতীয় গোনন্দ রাজত্ব করেন। প্রথম গোনন্দ হইতে দ্বিপঞ্চাশৎ জন নরপতি কলিযুগের ২২৬৮ বৎসর কাশ্মীর শাসন করেন। তৎপর কাশ্মীর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তুরস্কজাতীয় নৃপতিদিগের পদানত হয়। তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অনুষ্ঠিত কুকার্য্য তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে।

"ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥ ৪৯॥
লব্ধাধিপত্যসংখ্যানাং বর্ষান্ সংখ্যায় ভূভুজাং।
ভুক্তাৎ কালাৎ কলেঃ শেষো নাস্ত্যেবন্তাং
তদবিবর্জ্জিতাৎ॥ ৫০॥

মহাভারতের বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ দ্বাপর যুগের অন্তে সংঘটিত হয়। এই ভ্রান্ত মতে আস্থাবান হইয়া, অনেকে কাশ্মীররাজ্যের নরপতিদিগের কালনির্ণয় সম্পর্কে মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর

গতে, কুরুপাণ্ডবেরা ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন। সম্প্রতি 'রাজতরঙ্গিণী' রচনার কালে ১০৭০ শকাব্দ প্রবহমান। কুরুপাণ্ডবদিগের সমসাময়িক প্রথম গোনন্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৫৯৬ (২৩০০+১২৬৬) বৎসর অতীত হইয়াছে। এই ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ২২৬৮ বৎসর সময় মধ্যে ৫২ জন নরপতি কাশ্মীরে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শকাব্দের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে যৌধিষ্ঠিরাব্দের কালগণনা আরম্ভ হয়। সেই সময়ের পূর্ব্বে মহাভারতীয় ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। শতবর্ষের পর এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতাকার বরাহমিহিরের উপরি উল্লিখিত মত প্রামাণিক বোধে "রাজতরঙ্গিণীতে" গৃহীত হইয়াছে।

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ৫১ ॥
লৌকিকেঽব্দে চতুর্বিংশে, শককালস্য সাম্প্রতং।
সপ্তত্যভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ ॥ ৫২ ॥
প্রায় দ্বিতীয়গোনন্দাদারভ্য শরদা তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ং ॥ ৫৩ ॥
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়্ভিশ্চ সংযুতা।
ভূভুজাং কালসংখ্যায়াং, তদ্দ্বাপঞ্চাশতো মতা ॥ ৫৪ ॥
ঋক্ষাদ্ ঋক্ষং শতেনাব্দে যাৎস্থ চিত্রশিখণ্ডিষু।
তচ্চারে সংহিতাকারৈ রেবং দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ ॥ ৫৫॥
'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ, শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ
ষড়্-দ্বিক-পঞ্চ দ্বি-যুতঃ শককাল,স্তস্য রাজ্যস্য' ॥৫৬॥

বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ (খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮) বৎসরে মহাভারতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তখন কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অতএব শকাব্দের পূর্ব্বতনবর্ষে ৩১৭৯(=২৫২৬+৬৫৩) কলিযুগ আরব্ধ হয়। ৩৫৯৬ (=২৫২৬+১০৭০) বৎসরের ইতিবৃত্ত কহ্লণ পণ্ডিত স্বরচিত "রাজতরঙ্গিণী" পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই ১০৭০ শকাব্দে (১১৪৮ খ্রীঃ) জয়সিংহদেবের রাজত্বের দ্বাবিংশতম বর্ষ অতীত হয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মহাভারতীয় যুদ্ধের সমসাময়িক তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে কহ্লণ পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণী" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের মত অনুসারে কহ্লণ পণ্ডিত শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ অব্দে (খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ বর্ষে) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন মত পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "রাজতরঙ্গিণী" হইতে কলিযুগাব্দ, যৌধিষ্ঠিরাব্দ, লৌকিকাব্দ ও শকাব্দের সময় নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৯৬ বৎসর পরে পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় রাজপদ লাভ করিয়া ৪৮ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। তখন কলিযুগের ১২০০ দ্বাদশ শততম বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের পূর্ব্ব ৩১৭৯ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়। তদনুসারে শকাব্দের পূর্ব্বতন ১৯৮০ (খ্রীঃ পূ ১৯০২ অব্দে) বর্ষে পরীক্ষিৎ যুধিষ্ঠিরের পর সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। পরীক্ষিতের ১০১৫ বৎসর পর নন্দবংশ কৌটিল্যের যত্নে উন্মূলিত হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা মগধে মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষিতের ১১১৫ বৎসর পরে মগধে চন্দ্রগুপ্ত অভ্যুদিত হন। (খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব বিষ্ণু-

পুরাণের মত অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ (শকাব্দের পূর্ব্বতন ১৫০৮) অব্দ পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ হয়। পরীক্ষিতের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির মহাভারতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। বিষ্ণুপুরাণের অভিমত অপেক্ষা "রাজতরঙ্গিণীর" মত অধিক প্রামাণিক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের প্রচারিত মতের উপর 'রাজতরঙ্গিণীর' কালগণনা আরম্ভ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ (১২০০+১৫০৮)অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়।*

মহাভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতদিগের দ্বারা যেমন বিভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ ভারতবর্ষেও নানা মত প্রচলিত আছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে কলিযুগের আরম্ভ সম্বন্ধেও মতভেদ ঘটিয়াছে।

* যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্ বর্ষ-সহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥৩২॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ, দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং, দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥৩৩॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা স্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলে দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ ॥৩৪॥
প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিংগমিষ্যতি ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪)
"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিংগমিষ্যতি ॥"
(ভাগবত, ১২।২।৩২)

বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে পরীক্ষিৎ হইতে ১০১৫ বৎসর পরে মহাপদ্ম নন্দ মগধে আবির্ভূত হন। শত বৎসর রাজত্বের পর নবনন্দ কৌটিল্যের বুদ্ধিকৌশলে বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণের ১০১৫ বৎসরকে বায়ু ও মৎস্য পুরাণ ১০৫০ বর্ষে পরিণত করিয়া, নন্দের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পুরাণের মত প্রদর্শিত হইয়াছে।

রবিকীর্ত্তি নামে জনৈক জৈনধর্ম্মাবলম্বী কবি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কল্যাণ নগরের সুবিখ্যাত নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬১০-৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ) সভায় বিদ্যমান ছিলেন। চালুক্য রাজ এই সত্যাশ্রয় পুলকেশী কান্যকুব্জের বর্দ্ধন বংশীয় মহারাজ হর্ষ বর্দ্ধনের সমসাময়িক। পুলকেশীর বাহুবীর্য্যের নিকট হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল প্রতাপ খর্ব্বীভূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি এই পুলকেশীর সভায় ৬৩৯ খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ উপস্থিত ছিলেন। ৫৫৬ শকাব্দের (৬৩৪ খ্রীঃ) লিখিত এক শিলালিপি ঐহোলী নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুলকেশীর আদেশে এই রাজপ্রশস্তি জৈন কবি রবিকীর্ত্তির দ্বারা রচিত হয়। এই শিলালিপিতে মহাকবি কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত দেখা যায়। রবিকীর্ত্তির মতে মহাভারতীয় যুদ্ধ শকাব্দের(৩১৭৯=৩৭৩৫-৫৫৬খ্রী) বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এই জৈন কবির মতে কলির আরম্ভেই মহাভারতীয় যুদ্ধ ঘটে। তিনি গর্গ সংহিতা ও মহাভারত হইতে এই মত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রবিকীর্ত্তি বরাহমিহিরের অধস্তন গ্রন্থকার। তিনি কবি ও বরাহমিহির জ্যোতির্ব্বিৎ। কবির বাক্য জ্যোতির্ব্বিদের অভিমত অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বরাহমিহিরের মত নিঃসন্দেহ পূর্ব্বোক্ত সকল মত অপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া, "রাজতরঙ্গিণীতে" কহ্লণ পণ্ডিত দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। *

* "ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু ॥ ৩৩ ॥

"রাজতরঙ্গিণীর" শেষভাগে কহ্লণ পণ্ডিত ৪৩টী শ্লোকে কাশ্মীরের নরপতিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিযাছেন। এই পরিশিষ্টের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া, "রাজতরঙ্গিণী"র বিবরণ সংক্ষেপে সমাপ্ত করিব। ভবিষ্যতে কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

"প্রয়াতে ত্র্যধিকেবর্দ্ধসমাষট্‌কশতে কলেঃ।
কাশ্মীরেষাত্ত গোনন্দঃ, পার্থানাং সেবয়া নৃপঃ ॥১॥
স্বমূর্দ্দামোদরোহস্যাস্ত, তস্য পত্নী যশোমতী।
গোনন্দোহস্ত স্বৎসুতোহপি,ততোহতীত্য মহীপতীনাং
পঞ্চত্রিংশতমজ্ঞাতাস্নু গ্রহাভিজনাভিধান্।
রাজা ভবন্নবো নাম, শূস্নু স্তস্য কুশ স্তুতঃ ॥৩॥
স্বৌ খগেন্দ্রস্নুরেন্দ্রাখ্যৌ পুত্র পুত্রাবমুষ্য তু।
গোধবোহথান্যকুলজঃ, সুবর্ণাখ্য স্তদাত্মজঃ ॥৪॥
তজ্জন্মা জনকোহপ্যা-সীৎ সূমুঃ শচ্যাঃ শচীনরঃ।
অথাশোকোহভবদ্ ভূভৃদ রাজ্ঞোহস্য প্রপিতৃব্যজঃ ॥৫॥
তজ্জো জলৌকঃ, সম্পিগ্ধবংশো দামোদর স্তুতঃ।
তুল্যং ত্রয়োহথ হুষ্কাদ্যা স্তুরুষ্কাভিজনোত্তমাঃ ॥৬॥
অভিমন্যু, স্তৃতীয়শ্চ গোনন্দোহথ বিভীষণঃ।
তাবিন্দ্রজিদ্ রাবণশ্চ পিতাপুত্রৌ ক্রমান্নৃপৌ ॥৭॥
অন্যো বিভীষণঃ সিদ্ধ উৎপলাক্ষশ্চ তৎসুতঃ।
পশ্চাত্তজো হিরণ্যাক্ষো হিরণ্যকুল ইত্যভূৎ ॥৮॥
রাজা বসুকুল্য স্তস্য সূনুঃ খ্যাত স্ত্রিকোটিহা।
মিহিরকুলসংজ্ঞশ্চ, বক আসীত্তদাত্মজঃ ॥৯॥
ক্ষিতিনন্দো বকাত্মজো, বসুনন্দ স্তদাত্মজঃ।
নরোহন্যোহক্ষ স্ততো গোপাদিত্যগোকর্ণকৌ ক্রমাৎ॥১।
তস্মান্নরেন্দ্রাদিত্যোহভূত্তৎপুত্রোহন্ধযুধিষ্ঠিরঃ ॥"

'রাজতরঙ্গিণীর' প্রথম তরঙ্গে এই সকল রাজার নাম ও রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিভীষণ দ্বিতীয়ের অপর নাম কিন্নর। এই তরঙ্গে ৩৮ জন নরপতির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কহ্লণের মতে এই সকল নৃপতিগণ ১০১৪ বৎসর রাজত্ব করেন।

"চতুর্দ্দশাধিকং বর্ষসহস্রং, নব বাসরাঃ।
মাসাশ্চ বিগতা ষণ্নিয়ষ্টাত্রিংশতি রাজসু ॥"

খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে 'রাজতরঙ্গিণী'র উল্লিখিত প্রথম নরপতি গোনন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ২২৬৮ বর্ষ রাজত্বের পর কাশ্মীরে তরুষ্কাধিকার আরম্ভ হয়। গোনন্দ হইতে

পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতেষু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাং ॥ ৩৪ ॥
*　　*　　*　　*
সত্যাশ্রয়স্য পরমাপ্তবতা প্রসাদং।
নির্ম্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্ত্তিনেদং ॥৩৭॥
যেনাযোজিতবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতং কালিদাস
ভারবি কীর্ত্তি ॥

শেষোক্ত কবিতায় কালিদাস ও ভারবির নাম দৃষ্টে, তাঁহাদিগকে রবিকীর্ত্তির উর্দ্ধতন গ্রন্থকার বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতি হইতেছে। রবিকীর্ত্তির সমসাময়িক বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে ও কুমারিল ভট্ট 'তন্ত্র বার্ত্তিকে কালিদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কারণ ও মেক্ষমুলারের মতে কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। সিংহলীয় বৌদ্ধদিগেরও এই মত। সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমারদত্ত ও রামদাস সেন মহোদয় এই সময় নির্দ্ধারণে আস্থাবান হইয়াছেন। ডাক্তার ভাউদাজীর মতে কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত অভিন্ন। এই মাতৃগুপ্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীরে চারি বৎসর রাজত্ব করেন। মল্লিনাথের মতে কালিদাস ও বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ সমসাময়িক। উভয়েই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। জেকোবির মতে কালিদাস ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থকার। বেবারের মতে কালিদাস খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী মধ্যে গুপ্ত সম্রাটদিগের কাহারও সভাসদ ছিলেন। লাসেনের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন। এই বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সংবতাব্দ প্রচলিত করেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে মালব ও কনোজের সম্রাট যশোবর্ম্ম দেবেরই নামান্তর বিক্রমাদিত্য। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস তাঁহার সভায় বর্ত্তমান ছিলেন।

৫২ জন রাজা এই ২২৬৮ বৎসর কাশ্মীর পালন করেন। প্রত্যেক নরপতি এই হিসাবে ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ১৮০ অব্দে কাশ্মীরে তুরুস্কাধিকার আরব্ধ হয়। তুরুস্ক বংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। কানিংহাম সাহেবের মতে এই তিন জন পরস্পরের ভ্রাতা ছিলেন। এই মত অমূলক। তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। কহ্লণ নিজের গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গের প্রথম ও শেষ ভাগে পরস্পর-বিরোধী সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়।

দ্বিতীয় তরঙ্গে প্রতাপাদিত্য হইতে আর্য্যরাজ পর্য্যন্ত ছয় জন রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কহ্লণের মতে এই ছয় জন ১৯২ বর্ষ কাল কাশ্মীর শাসন করেন।

"শতদ্বয়ে বৎসরাণামষ্টভিঃ পরিবার্জ্জিতে।
অস্মিন্ দ্বিতীয়ে ব্যাখ্যাতাঃ ষট্ প্রখ্যাতগুণাঃনৃপাঃ।।

তৃতীয় তরঙ্গে মেঘবাহন হইতে বালাদিত্য পর্য্যন্ত একাদশ জন নরপতির শাসনকাল বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গে বর্ণিত নরপতিদিগের নাম "রাজতঙ্গিণী"র পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

"তস্মিন্ প্রভ্রংশিতে ভূত্যৈরন্যান্তিজনসম্ভবঃ।
ভূপঃ প্রতাপাদিত্যোঽভূৎ,জলৌকোঽপি তদাত্মজঃ।।১২।
তুঞ্জীনো নিঃসুতে তজ্জো, বিজয়োঽন্যকুলোদ্ভবঃ।
জয়েন্দ্র স্তৎসুতো পুত্রঃ, সচিবঃ সন্ধিমানভূৎ।।১৩।।

জয়েন্দ্রের আদেশে তাঁহার মন্ত্রী সন্ধিমান নিহত হইলে, আর্য্যরাজ কিছুকাল কাশ্মীর শাসন করেন। তদনন্তর মেঘবাহন রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই মেঘবাহন গোনন্দকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপাদিত্যের পুত্র ও যুধিষ্ঠিয়ের পৌত্র। এই মেঘবাহন উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য প্রসারিত করেন।

"যুধিষ্ঠিরস্য পৌত্রেণ গোপাদিত্যাত্মজন্মনা।
শ্রীমেঘবাহনেনাথ গোনন্দস্যোদিতং কুলে।।১৪।।
ততঃ প্রবরসেনোঽভূদ্, ভূপঃ কাশ্মীরমণ্ডলে।
তৎসুনুশ্চ হিরণ্যোঽভূৎ, পালয়ন্ ক্ষিতিমণ্ডলং।।১৫।।
মাতৃগুপ্তোঽভবদত্তরাজ্য স্তেন শকারিণা।
ততঃ প্রবরসেনোঽন্য, স্তোড়মাণাত্মজঃ ক্ষিতিং
লেভে হিরণ্যভ্রাতৃব্য স্তস্য পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।।১৬।।
ততো নরেন্দ্রাদিত্যশ্চ রণাদিত্যশ্চ ভূপতিঃ।
ক্রমাদভূতাং তৎপুত্রো বিক্রমাদিত্যভূপতিঃ।।
বালাদিত্যশ্চোদভবদ, বিক্রমাদিত্যনন্দনঃ।।১৭।।

শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ অব্দে (খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে) "রাজতরঙ্গিণী"র বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম তরঙ্গে ৭৩ জন নৃপতির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তরঙ্গে ৬ জন ও তৃতীয় তরঙ্গে ১১ জন ভূপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তিন অধ্যায়ে ৯০ জন নরপতির বিবরণ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। গড়ে প্রতি রাজার শাসন কাল ৩৪ বৎসর ধরিলে, ৩০৬০ বৎসর কাল ৯০ জন নরপতি রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা হইতে নবতিতম নরপতি৷ বিক্রমাদিত্যের পুত্র) বালাদিত্যের রাজত্ব (৩০৬০—২৪৪৮)৬১২ খ্রীঃ অবসান হয় বলিয়া অনুমিত হয়। বালাদিত্যের তনয়া অনঙ্গলেখার সহিত কর্কোটবংশীয় দুর্ল্ভবর্দ্ধনের পরিণয় হয়। বালাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা দুর্লভবর্দ্ধন কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উইলসন সাহেবের মতে ৬১৫ খৃঃ কানিংহাম সাহেবের মতে ৬২৫ খ্রীঃ এবং শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে ৫৭৮ খ্রীঃ—দুর্ল্ভবর্দ্ধন কাশ্মীরে কর্কোটকবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কর্কোটকবংশীয় সপ্তদশ জন রাজা ২৬০ বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

"বালাদিত্যস্ত জামাতা ততো দুর্লভবর্দ্ধনঃ।
সূনু দুর্লভক স্তস্য, চন্দ্রাপীড়োঽভবত্ততঃ॥
তারাপীড়োঽনুজন্মস্য, মুক্তাপীড়োঽস্য চানুজঃ॥১৮॥
ভূপাবাস্তাং কুবলয়াপীড়ো দ্বৈমাতুরোঽস্য চ।
বজ্রাদিত্যঃ সুতৌ রাজ্ঞো মুক্তাপীড়স্য দ্বৌ সুতৌ॥১৯॥
পৃথিব্যাপীড় সংগ্রামাপীডাবাস্তাং মহীভজৌ।
জয়াপীড়শ্চ তন্মধ্যে জজ্ঞঃ, পুত্রাবপি ক্রমাৎ॥২০॥
ললিতাপীড়সংগ্রাপীডৌ,জ্যেষ্ঠাত্মজ স্তুতঃ।
শ্রীচিপ্পটজয়াপীড়ঃ কল্পাপাল্যাম্মবোঽভবৎ॥২১॥
অভিচারেণ তং হত্বা সামাত্যাদিতরেতরং।
উৎপলাদৌ-রসংপ্রাপ্তরাজৌ স্তন্মাতুলৈঃ কৃতঃ॥২২॥
ভ্রাতুঃ পুত্রোঽজিতাপীড়ো জয়াপীড়স্য, তৎপদে।
অনঙ্গাপীড়নামা চ সংগ্রামাপীড়জ স্তুতঃ॥২৩॥
তমুৎপাট্যোৎপলাপীড়োঽস্যাজিতাপীড়নন্দনঃ॥২৪॥

৬১৫—৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্কোটকবংশ ২৬০ বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অবন্তীবর্ম্মা স্বীয় প্রভু উৎপলাপীড়ের প্রাণসংহার করিয়া, কাশ্মীরের শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। ৮৭৬—৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৪ বৎসর কাল উৎপলবংশীয় একাদশ জন নরপতি কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব ১৮ বৎসর ও রমেশ বাবু ১৫ বৎসর প্রতি নৃপতির রাজত্বকালের হার গ্রহণ করিয়াছেন। মাননীয় রমেশ বাবুর মতে ৮৫৫—৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবন্তীবর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত বংশ কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অবন্তীবর্ম্মার পিতার নাম শূরবর্ম্মা, পিতামহের নাম সুখবর্ম্মা ও প্রপিতামহের নাম উৎপলবর্ম্মা। উৎপলের বংশধর অবন্তীবর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'উৎপলবংশ' নামে খ্যাত। পিতা শূরবর্ম্মার সাহায্যে অবন্তীবর্ম্মা কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

"অবন্তীবর্ম্মা শূরেণ তং নিবাহ্যাথ মন্ত্রিণা।
নপ্তোৎপলস্য বিদধে সাম্রাজ্যে সুখবর্ম্মজঃ॥২৫॥
সূনুঃ শঙ্করবর্ম্মা স, গোপাল স্তস্য চাত্মজঃ।
রথ্যাগৃহীতঃ প্রাক্তুস্চ তদ্‌ভ্রাতা শঙ্কটাভিধঃ॥২৬॥
সুগন্ধাখ্যা তয়োর্মাতা তং বিনাশ্যাথ ভূভুজং।
শূরবর্ম্মপ্রনপ্তাবং পঙ্গুং তস্মিপদাতযঃ।
চক্র, নির্জ্জিতবর্ম্মাণং, তজ্জঃ পার্থ, স্তুতঃ ক্রমাৎ॥২৭॥
চক্রবর্ম্মা শূরবর্ম্মা চেতি নির্জ্জিত-বর্ম্মজঃ॥২৮॥
চক্রবর্ম্মণ্যতীতেঽথ পাপী পার্থাত্মজঃ ক্রমাৎ।
উন্মত্তাবন্তীবর্ম্মাসীৎ, তৎ পুত্রে শূরবর্ম্মণি॥২৯॥

রাজতরঙ্গিনীর চতুর্থ তরঙ্গে কর্কোটক বংশীয় নৃপতিগণের ও পঞ্চম তরঙ্গে উৎপল বংশের শাসন কাল বর্ণিত হইয়াছে। শূরবর্ম্মাই উৎপল বংশের শেষ নরপতি। শূরবর্ম্মার পর যশস্করদেব রাজপদ প্রাপ্ত হন। উৎপলবংশের অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া মন্ত্রী যশস্করদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। যশস্করের পিতার নাম প্রভাকরদেব। তিনি কানদেবের পৌত্র ও বীরদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। যশস্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সংগ্রামদেব পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই রাজা সংগ্রামদেব নিহত হন এবং বর্ণটদেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। এই বর্ণট যশস্করদেবের পিতৃব্য ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মন্ত্রী পর্ব্বগুপ্ত বর্ণটরাজকে নিহত করিয়া, কাশ্মীরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

পর্ব্বগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্ষেম গুপ্তের পত্নীর নাম দিদ্দা। শঙ্করবর্ম্মার পত্নী সুগন্ধার ন্যায় ক্ষেমগুপ্তের পত্নী দিদ্দা ব্যভিচারিণী ও চরিত্রহীনা রমণী ছিলেন। উভয়ে কাশ্মীরের ইতিহাসে আপনাদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ক্ষেমগুপ্তের পর অভিমন্যু, নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত কাশ্মীর শাসন করেন। দিদ্দা মহিষীর ষড়যন্ত্রে ক্ষেমগুপ্তের প্রপৌত্র ভীমগুপ্ত নিহত হয় এবং দিদ্দার ভ্রাতষ্পুত্র সংগ্রামরাজ কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পূর্ব্বোক্ত

যশস্করদেব হইতে সংগ্রামরাজ পর্য্যন্ত যাবতীয় নরপতির বিবরণ ষষ্ঠ তরঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ৯৬০—১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬৪ বৎসরের ইতিহাস এই অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে।

রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টে দিবং চক্রে রাজ্যোমন্ত্রী যশস্করঃ।
প্রবিত্তৃব্যাখ্যস্তু বর্ণয়িষ্যতেযোঽদ্ভুতম্ ॥৩০॥
রাজ্যে বকাজ্জিৎ সংগ্রাম স্তম্ভো নিষ্পাট্য তংততঃ।
অমাত্যঃ পর্ব্বগুপ্তাখ্যো রাজ্যং দ্রোহেণ লব্ধবান্ ॥৩১॥
ক্ষেমগুপ্তঃ সুতোঽস্যাসীদভিমন্যো তদাত্মজে।
শান্তে, মাত্রা পাল্যমানে নন্দিগুপ্তে চ তৎসুতে ॥৩২॥
তত ত্রিভুবনে ভীমগুপ্তে চ ক্রূরচেষ্টয়া।
পৌত্রে তথৈব নিহতে স্বয়ং দিদ্দাখ্যয়া কৃতে।
রাজ্যে সংগ্রামরাজোঽপি ভ্রাতৃব্যোঽস্তে নৃপঃ
কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব "রাজতরঙ্গিনী" হইতে কাশ্মীরের নরপতিদিগের যে বিবরণ সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করেন *, তাহা দ্বিতীয় সংগ্রাম দেবের রাজত্বকালেই সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি সপ্তম ও অষ্টম তরঙ্গের বিবরণ সংগ্রহে কোন চেষ্টা করেন নাই। উইলসন সাহেব প্রথম গোনর্দ্দ হইতে দ্বিতীয় সংগ্রামদেবের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস আপনার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 'রাজতরঙ্গিণীর' নির্দ্দিষ্ট সময় তিনি সংশোধিত করিয়াছেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব 'রাজতরঙ্গিণীর' নির্দ্দিষ্ট কাল প্রদান পূর্ব্বক কাশ্মীরের নৃপতিদিগের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি কহ্লণ, উইলসন সাহেব ও স্থানে স্থানে নিজের অনুমিত সময় ধারাবাহিক ক্রমে প্রদান করিয়াছেন †। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বরচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' "History of Civilization in India" কনিষ্ক হইতে জয়সিংহদেব পর্য্যন্ত কাশ্মীর নরপতিগণের নাম মালা, তাঁহার অনুমিত সময়ের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজপদ প্রাপ্তির কাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহদেবের রাজ্যারম্ভ সময় অনুমান করিয়াছেন। 'বিশ্বকোষে' প্রিন্সেপ সাহেবের তালিকা গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রিন্সেপের নাম উল্লিখিত হয় নাই। 'বিশ্বকোষ' কার সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে রমেশ বাবুরই পদ অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই নামমালা ও আনুমানিক সময় প্রদর্শন করিয়া, পরে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিব।

দ্বিতীয় সংগ্রামরাজ দেবের পর হরিরাজ, অনন্তদেব, কলসদেব, উৎকর্ষদেব ও হর্ষদেব যথাক্রমে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। হর্ষদেব সংগ্রামরাজের প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ নরপতি। তদনন্তর উচ্চল কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় শত বর্ষকাল সংগ্রামরাজের বংশধরেরা কাশ্মীর পালন করেন। এই শতবর্ষের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র সপ্তম তরঙ্গে কহ্লণ বর্ণনা করিয়াছেন। রমেশ বাবুর মতে ১১০১ খ্রীঃ অব্দে উচ্চলের রাজত্ব আরব্ধ হয়। সংগ্রামরাজের পিতৃব্য কান্তিরাজ হইতে উচ্চল উদ্ভূত হন। উচ্চল দিদ্দা রাণীর ভ্রাতা এই কান্তিরাজের অধস্তন চতুর্থতম বংশধর ছিলেন। কাশ্মীর নরপতিগণের বংশাবলী ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

"পৌত্রে তথৈব নিহতে স্বয়ং দিদ্দাখ্যয়া কৃতে।
রাজ্যে সংগ্রামরাজোঽপি ভ্রাতৃব্যোঽস্তে নৃপঃ কৃতঃ॥৩৪॥
হরিরাজানন্তদেবাবাপ্তাঃ তস্যাত্মজৌ ততঃ।
কলশোঽনন্ততনয়ঃ, ক্রমাদ্ ভূপৌ তদাত্মজৌ ॥৩৫॥

* Asiatic Researches, XV.I.

† J. Prinsep's useful Tables, part second, (1836), p. 101—104.

উত্তাবুৎকর্ষহর্ষাখ্যেহপি নিষ্পাট্য ভূপতিং।
হর্ষদেবং তমুদ্দামবিক্রমোহনন্তবংশজঃ ॥৩৬॥
ভ্রাতুঃ পুত্রস্য দিদ্দায়া জস্যরাজস্য নপ্তৃতঃ।
মল্লাভিধানাদ্ভূতো ভূপতামুচ্চলোহভজৎ ॥৩৭॥

উচ্চলের পর শঙ্খরাজ, মল্ল, সুস্মল ও ভিক্ষাচর যথাক্রমে রাজত্ব করেন, ভিক্ষাচর হর্ষদেবের পৌত্র। তিনি ছয় মাস মাত্র কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। অনন্তর সুস্মল পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুস্মল উচ্চলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুস্মলের পরে তাঁহার পুত্র জয়সিংহদেব কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই কয়জন নরপতির রাজত্ব কাল 'রাজতরঙ্গিণী'র অষ্টম তরঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। কহ্লণ পণ্ডিত এই জয়সিংহদেবের অমাত্য ও সভাসদের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, স্ব-সাময়িক ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বতন ঘটনা সপ্তম ও অষ্টম তরঙ্গে অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেই কহ্লণ পণ্ডিতের 'রাজতরঙ্গিণী' সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ৩৫৯৬ বৎসরের কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে।

"দ্রোহেণতং হতবতাং ভৃত্যানামগ্রত স্তুতঃ।
শঙ্খরাজাভনামাভূদ্ রডডাখ্যঃ ক্ষণিকো ভূপঃ ॥৩৮॥
গগোন নিহতে তস্মিন্ মল্লো বৈমাতুরোহপ্যভূৎ।
তস্যোচ্চলমহীভর্ত্তুর্ভ্রাতানির্ব্বধ্য তং বলী।
সুস্মলাখ্যোহগ্রহীদ্ রাজ্যং মাল্লিরুচ্চলসোদরঃ ॥৩৯॥
বিরক্তৈঃ পাটিতে তস্মিন্ রাজ্যাদভূত্যৈঃ নৃপঃ কৃতঃ।
নৃমাষান্ হর্ষভূসাভর্ত্তুর্ন প্তা ভিক্ষাচরাভিধঃ ॥৪০॥
পুন র্নিবাস্য তং প্রাপ্তরাজ্যে সুস্মলভূভৃতি।
ক্রমাদ্রবক্তৈর্বিশ্বস্তৈ র্বৈরাজ্যোদ্বেজিতে হতে ॥৪১॥
লবণ্যান্নিখিলাং স্তং চ হত্বা ভিক্ষাচরং নৃপং।
সুতঃ সুস্মলভূভর্ত্তুঃ সংপ্রাপ্তপ্রতিক্রমঃ।
নন্দয়ন্ মেদিনীমাস্তে জয়সিংহো মহীপতিঃ" ॥৪২॥

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

দার্শনিক মতভেদ। (৫)

বেদান্তীর সৃষ্টিবাদ-প্রসঙ্গকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়া লইলাম। সৃষ্টির প্রকরণ বলিবার পূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চাই, বেদান্তের নিকট চিদচিতের বিভিন্নতা মিথ্যাদৃষ্টি বা মায়িক অথবা ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। যিনি প্রকৃতরূপে বেদান্তের অধিকারী,তাহার নিকট অচিৎ কিছুই নাই, সকলই চিদ্‌ব্রহ্ম, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সেই চিদব্রহ্মের রূপ বা বিবর্ত্ত মাত্র। কি প্রকারে এই চিদ্‌ব্রহ্ম এইরূপ ধারণ করিলেন, কি প্রকারে তিনি এইরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তাহাই বেদান্তের সৃষ্টি প্রকরণ। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাহা চিদচিৎ বলিয়া প্রতীত, তাহা যদি এক মাত্র চিৎই না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে বলিতে পারি, এ বিশ্ব চিদ্‌ব্রহ্মের রূপ? এ জন্য বেদান্তের সৃষ্টিবাদ বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে এই চিদচিৎ পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্বের অচিৎ রূপ মিথ্যাদৃষ্টির অপনয়ন করা উচিত। যাহা আমাদের স্থূলজ্ঞানে অচিদ্রূপে প্রতীয়মান, তাহা কি বাস্তবিক অচিৎ? অচিৎ বলিয়া কি কোন বস্তু আছে?

অচিৎ বলিয়া কোন বস্তু আছে কি না, একথা মীমাংসা করিতে হইলে প্রকৃত বস্তুজ্ঞান আবশ্যক। যদি চিৎই প্রকৃত বস্তু হয়, তবে অচিৎ বস্তু নহে। যদি অচিৎ বস্তু হয়; তবে চিৎ বস্তু নহে। প্রকৃত বস্তু কি, তাহা কেবল ব্রহ্মেরই বিদিত এবং যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন, অন্যে নহে। বেদান্ত

সেই ব্রহ্মবিৎ ঋষি ও দেবগণের বাক্য, এজন্য সেই বেদান্তবাক্য অনুসরণ করিলেই প্রকৃত বস্তু কি, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। যাহা বেদান্তে প্রকৃত বস্তুরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয়। কিন্তু সেই বেদান্তবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণের উপায় কি? সেই বেদান্তবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে ত বেদান্তের অর্থ গ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না। এজন্য বেদান্তের অধিকারী কে, সে কথা উত্থাপিত হইল। সেই অধিকার শঙ্করাচার্য্য প্রথম সূত্রেই সূচনা করিয়াছেন।

শঙ্কর বলেন, যাঁহারা এই সাধন চতুষ্টয় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদান্তজ্ঞানের অধিকারী :—

(১) "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (২) ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ (৩) শমদমাদিসাধনসম্পৎ,(৪) মুমুক্ষুত্ব।"

কি নিত্য, কি অনিত্য এইরূপ বস্তুবিবেক যাহাদের জন্মিয়াছে, ঐহিক ও স্বর্গভোগাদি স্বরূপ পারলৌকিক সুখভোগের প্রতি যাহাদের বিরাগ জন্মিয়াছে, শমদম (বহিঃ ও অন্তঃরেন্দ্রিয়ের সংযম), উপরতি (ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ানুভব হইতে বিরতি), তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধান (আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ) ও শ্রদ্ধা (গুরু বা বেদান্তবাক্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস) এই ষট্সম্পৎ যাহাদের লব্ধ হইয়াছে এবং যাহারা একান্ত মুক্তি অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহারাই বেদান্তের অধিকারী।

এইরূপ অধিকারী হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরাৎ সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কি মনন বা চিন্তাতে, কি ধ্যান বা ধারণাতে, সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা আলোচনা করিলে তবে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্যক্ জ্ঞানলব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না। সেই সম্যক্ জ্ঞানে সমস্তই ব্রহ্মময় উপলব্ধি হয়। তখন আর চেতনাচেতন ভেদজ্ঞান থাকে না। কারণ, শ্রুতি বলেন, সকলই যদি ব্রহ্মময় হইল, তবে আর কি দিয়া কি দেখিবে, কি জানিবে? যাহা দিয়া যাহা দেখিবে ও জানিবে, সে সমস্তই ত এক অদ্বয় ব্রহ্ম।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা"।

জীব, যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, তখনই সে ভূমা (ব্রহ্ম) হয়।

"যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ"

যখন তাঁহার (জ্ঞানীর) এ সকল আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়, যখন আত্মাতিরিক্ত আর কিছু দর্শন হয় না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে?

তখন যাহা অচিৎ বলিয়া ভ্রম ছিল, তাহা তিরোহিত হয়, তখন আর রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় না। তখন এ জগৎ ব্রহ্মময় হয়, সর্ব্বরূপেই ব্রহ্ম বিদ্যমান দেখা যায়। যাহা রূপ ও নাম তাহা মিথ্যা মাত্র। কেবল খণ্ডজ্ঞানে রূপ ও নামের অস্তিত্ব। সর্ব্বরূপে ও সর্ব্বনামে এক মাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান। এ বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বা রূপান্তর মাত্র।

চিৎই যদি বস্তু হইল, তবে ন্যায় বৈশেষিক এবং সাংখ্যকার অচিৎ উপদেশ করিয়াছেন কেন? সৃষ্টি-প্রকরণ বুঝাইবার জন্য তাহারা অচিতের উপদেশ করিয়াছেন, নহিলে তাঁহারাও একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়াছেন। তাই বেদান্ত সূত্রে আছেঃ—

"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।"

"সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টা বিষয়ে বিভিন্ন মত নাই।"—১।৪।১৪।

সকল আস্তিক দর্শনই বলিয়াছেন, ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ। সেই সৃষ্টির প্রকরণ বিভিন্ন-

দর্শনে বিভিন্নরূপে বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই. সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়াছেন। কোন দর্শনে তিনি পুরুষরূপে উক্ত, কোন দর্শনে তিনি ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত, এবং অন্য দর্শনে তিনি ব্রহ্মরূপে পরিচিত। তাহার ভিন্ন ভিন্ন অভিধান হইলেও তিনি একই চিদ্‌ব্রহ্ম রূপে সর্ব্ব বিদিত। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান দিবার জন্য সৃষ্টি-বর্ণনা। সুতরাং, কারণ এক হইলেও কার্য্যকে সকলেই সমানরূপে ব্যক্ত করেন নাই। তাহার হেতু এই, সেই কার্য্য সকলের কাছে সমান রূপে অভিব্যক্ত নহে। যাহার দৃষ্টিতে সেই কার্য্য যেরূপে অভিব্যক্ত, তাহার কাছে তাহাকে তদ্রূপে বিবৃত করিয়া যখন মুক্তি-পথে আনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তখন সেই কার্য্যবাদ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। সেই কার্য্যবাদ আলোচনা দ্বারা যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তবে বিভিন্ন কার্য্যবাদে ক্ষতি কি? এজন্য ন্যায় বৈশেষিকের সৃষ্টিবাদ অসৎ-কার্য্য, সাংখ্যের সৃষ্টিবাদ সৎকার্য্যবাদ এবং বেদান্তীর সৃষ্টিবাদ সৎকারণবাদ মাত্র। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতেও" আছে:—

"আস্তিক নাস্তিক দ্বাদশ দর্শনেষু বক্ষ্যমাণেষু ত্রিবিধ প্রস্থানভেদাতিরিক্ত প্রস্থানভেদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ।"

আস্তিক নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার প্রস্থান ভেদ থাকিলেও সকল দর্শনকেই এই ত্রিবিধ প্রস্থানে আনা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ প্রস্থান অতিরিক্ত অন্য প্রস্থান অপ্রসিদ্ধ।

নাস্তিক দর্শন সমূহও যে এই ত্রিবিধ প্রস্থানে আসিতে পারে, তাহা দেখাইবার এ স্থল নহে। তবে এই মাত্র বলা উচিত, যাহা বেদবিরোধী তাহাই নাস্তিক দর্শন, আর যাহা শ্রুতির সমন্বয় সম্মত, তাহাই আস্তিক দর্শন। পূর্ব্বে আমরা অসৎকার্য্যবাদ এবং সৎ-কার্য্যবাদের কথা বলিয়াছি। যে বেদান্ত মতে কার্য্য কারণ অভেদ, সকলই এক ব্রহ্ম মাত্র, এক ব্রহ্মেরই রূপ, সেই বেদান্ত মতে সুতরাং অভেদ কার্য্যকারণ হওয়াতে আর কার্য্যবাদ থাকিতে পারে না; সকলই কারণবাদ; এজন্য অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মত সৎকারণবাদ বলিয়াই প্রথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে এই সৎ কারণে উপনীত হওয়াই আস্তিক দর্শন মাত্রের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, যদি সর্ব্বশেষে পারমার্থিক জ্ঞানে প্রতীত হয়, কার্য্যকারণ কিছুই নাই, তাহা লৌকিক জ্ঞান মাত্র, সকলই একমেবাদ্বিতীয়ং, তবে যাহা যে প্রকার, তাহাকে সেই প্রকারে প্রসিদ্ধ করাই উচিত। কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ কার্য্যাত্মক নহে,* সুতরাং কারণই সৎ; যে হেতু, যে যাহার আত্মা তাহাই সৎ। বেদান্ত এই সৎকারণবাদ স্থাপন করিয়া অদ্বৈতমতের বিকাশ করিয়াছেন।

কারণে যে কার্য্য সূক্ষ্মরূপে লুক্কায়িত থাকে, পরে তাহা কার্য্যরূপে পরিদৃশ্যমান হয়, একথা সাংখ্যকারও স্বীকার করেন। পূর্ব্বে কারণে অভেদরূপে থাকিয়া যখন কার্য্য স্বতন্ত্র রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্বতন্ত্র নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাংখ্যকারের পঞ্চ স্থূলভূত পঞ্চ সূক্ষ্মভূতোৎপন্ন। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র সমুদায় এবং উভয়বিধ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত। অহংকার বুদ্ধিতত্ত্বেই লুক্কায়িত ছিল। যে বুদ্ধিতত্ত্ব সমগ্র কার্য্যকারণের অনন্তসাগর, তাহা পুরুষ প্রকৃ-

* ২।১।৯ ব্রহ্মসূত্র। শারীরিক ভাষ্য। "কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং।"

তিরই পরিণাম। এক মূল প্রকৃতিতে সমস্ত নবিশ্ব বীজরূপে লীন ছিল।

এই স্থূল বিশ্ব যে সূক্ষ্ম কারণ-জগৎ হইতে সমুদ্ভূত, সাংখ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। এই স্থূল, বহুরূপী, বিশেষ, বিচিত্র, ব্যক্তিগত জগৎ এক মহাসূক্ষ্ম, অবিশেষ সাধারণ-গুণযুক্ত কারণ জগতের পরিণাম। সেই কারণ-জগৎই সাংখ্যকারের অষ্ট প্রকৃতি। এই অষ্টপ্রকৃতি জাতিপর এবং ষোড়শ স্থূলবিকার ব্যক্তিপর। কিন্তু কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি উভয়ই আমাদিগের সামান্য জ্ঞানগোচর পদার্থ—তাহা হার্বার্ট স্পেন্সরেরKnowable এর সীমান্তর্গত। সাংখ্যকার সেই Knowableকে বিশেষ হইতে অবিশেষ জ্ঞানে লইয়া গিয়াছেন। বিশেষ হইতে সামান্যে যাইলেও তাহাদের ধর্ম্ম যাইবে কিরূপে? আমাদের মায়িকবুদ্ধিগত সমস্ত জ্ঞানই পদার্থের গুণজ্ঞান মাত্র। পদার্থের বস্তুগত জ্ঞান নহে। গুণজ্ঞান কেবল সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র—এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহারই জ্ঞান মাত্র। আদ্যাপ্রকৃতি ত্রিগুণা। ত্রিগুণা প্রকৃতি সুতরাং হার্বার্ট স্পেন্সরের Knowableএর মধ্যে গণনীয়। শঙ্করও বলেন :—

"সাংখ্যের বিবেচনা এই যে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকাজাতি সে সকলের কারণ, তেমনি, যে কিছু বাহ্যিক ও আন্তরিকভাব (পদার্থ) সে সমস্তই সুখ দুঃখ মোহরূপে অন্বিত থাকায় সমদুঃখমোহাত্মক কোন এক সামান্য (জাতি) সে সমস্তের কারণ। সেই সুখ দুঃখ মোহাত্মক সামান্য পদার্থটী ত্রিগুণ এবং মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন।" *

সাংখ্যকার এই ত্রিগুণান্বিত চিদচিৎ জগতের বহুরূপকে সামান্য বা জাতিপর (unified) জ্ঞানে লইয়া যাওয়াতে, তাহার সেই জগতের বীজস্বরূপ ও সুতরাং ত্রিগুণান্বিত কারণরূপে দাঁড়াইয়াছে; সেই চিদচিৎ মিশ্রিত কারণবীজ অচেতন প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ। প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং পুরুষ নিমিত্ত কারণ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেনঃ—

"প্রকৃতির কার্য্যসকলের প্রকাশের নিমিত্ত অবশ্যই পুরুষ স্বীকার করিতে হয়। যদি বল, প্রকৃতির যে সকল গুণ হইতে কার্য্যোৎপন্ন হইতেছে, সে সকল গুণের কার্য্যরূপ অনেকানেক বিকারের অনেক চৈতন্য কল্পনা করি, তাহা হইলে সেই সকল চৈতন্য তাহাদিগকে প্রকাশ করিবে; তবে আর একমাত্র পুরুষ স্বীকার করি কেন? এ কথার উত্তর এই যে, অনন্ত চৈতন্য কল্পনাতে গৌরব আছে। অতএব গৌরবদোষ পরিহারার্থ লাঘবতঃ এক পুরুষকে সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই সূত্রোক্ত * অনুমান দ্বারা পুরুষকে নিমিত্ত করণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষ সকল পদার্থের নিমিত্ত কারণ, যেহেতু পুরুষার্থ অখিল বস্তুর আরম্ভক সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—সৃষ্টিকার্য্যেতে এই পুরুষই সৃজ্যমান পদার্থ সকলের নিমিত্ত এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ, সেই গুণসাম্যা প্রকৃতি পুরুষেতে অধিষ্ঠিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে তাহার সেই গুণ সকলই সৃষ্টির কারণ হয়।"

এই ব্যাখ্যাতে দৃষ্ট হইতেছে, যে প্রকৃতি অচেতন বশত তাহার সমস্ত আরম্ভক সং-

* বেদান্ত দর্শনের ২অ, ২ পাদ, ১ সূত্রের শারীরিক ভাষ্য দেখ।

* "সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য।"—সাংখ্যদর্শন—১অ, ৬৬ সূত্র।

যোগ পুরুষ হইতেই হইতেছে। প্রকৃতিতে গতি আছে সত্য, কিন্তু সেই গতির প্রথম আরম্ভ কোথায়? অচেতন প্রকৃতি কিছু প্রথম গতি দিতে পারে না; তজ্জন্য এক জন সচেতন পুরুষের আবশ্যক। যাহা অচেতন, তাহার সংকল্প ও প্রেরণা শক্তি নাই, সেই বুদ্ধি-পূর্ব্বক সংকল্প ও প্রেরণাশক্তি কে দেয়? যে দেয়,—যে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীলা করে, তাহাই পুরুষ। এজন্য বিজ্ঞানাচার্য্য বলিয়াছেন—পুরুষার্থ:অখিল বস্তুর আরম্ভক সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিজ্ঞানাচার্য্য আরও বলিতেছেন, এই পুরুষ অনন্ত জাগতিক পদার্থে প্রকাশমান আছেন বলিয়া তাহার অনন্তরূপ, কিন্তু অনন্তপুরুষের কল্পনা গৌরবদোষাশ্রিত বলিয়া এক পুরুষেরই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সাংখ্যমতেও এই পুরুষ বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন। এ কথার সঙ্গে বেদান্তের ঐক্য আছে; কারণ, বেদান্তেও কথিত হইয়াছে—

"পরমাত্মা এক প্রকার হন, বহু প্রকার হন।"

"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি।"

এই প্রকার নানা শ্রুতিবাক্য আছে, যাহাতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে।

কিন্তু সাংখ্য যে প্রকৃতিকে জড়া বলিয়াছেন, শঙ্কর বলেন, সে অংশে তাহার সহিত শ্রুতির সমন্বয় নাই। প্রকৃতি শব্দ শ্রুতিতে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত।

শ্বেতাশ্বতরে আছেঃ—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তমহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

"প্রকৃতিই মায়া, মহেশ্বর মায়াময় পুরুষ। সেই মায়াবিশিষ্ট পরম পুরুষের মায়াময় অবয়ব দ্বারা অশেষ ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"

তবেই বেদান্তমতে এ জগৎ ব্রহ্মের অবয়ব মাত্র। সেই অবয়বই প্রকৃতি ও মায়া। সুতরাং এই ভূতময় উপাদানে ব্রহ্মশরীর গঠিত। বেদান্তদর্শনের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মই জগতের কারণ।

"জন্মাদস্য যতঃ।"

জগতের কারণ বলিলে, নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে তিনি উভয়বিধ কারণ। তিনি যখন রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বিত ও ব্যাকৃত হইয়া জগৎ প্রকাশ করেন, তখন তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি আবার জগতের উপাদান কারণও বটে। তিনি যে সৃষ্টির উপাদান কারণ তৎপক্ষে শ্রুতি-বাক্যের অভাব নাই। বেদান্ত কতিপয় শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মকে "অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ" রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্ত বলিয়াছেনঃ—

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।"

১ অ, ৪ পা, ২৩।

"ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, তাহা বেদান্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধিত হয়। তাহা অস্বীকার করিলে সেই প্রতিজ্ঞার বাধ এবং দৃষ্টান্তের হানি হয়।"

এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত কি প্রকার তৎপরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) "তুমি কি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?"

"হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত (মননের সহিত সমান বা সমফল) ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা হয়।"

এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যে প্রতীত হই-

তেছে, এমন এক বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া কেবল উপাদান জ্ঞানেই হইয়া থাকে। যেমন অট্টালিকার নিমিত্ত-কারণ শিল্পী, সেই শিল্পীকে জানিলে অট্টালিকা কি তাহা জানা হয় না, কিন্তু যে যে উপাদানে অট্টালিকা নির্ম্মিত, তাহা জানিলেই অট্টালিকা কি, তাহা জানা যায়। তদ্রূপ বিশ্বের উপাদান কি, তাহা জানিলেই সর্ব্ব বিশ্ব জানা যায় এবং যখন ব্রহ্মকে জানিলেই সেই সর্ব্ববিশ্ব জানা হয়, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান কারণ।

(২) শ্রুতির দৃষ্টান্ত বাক্যেও এই উপাদান কারণ সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রুতি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

"হে সৌম্য! যেমন মৃত্তিকা জানিলে, সমস্ত মৃণ্ময় (মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্য বা ঘটাদি) জানা হয়; বিকার সকল নাম মাত্র, নাম সকল কেবল বাক্যসৃষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, নাম সকল (ঘটাদি) মিথ্যা।"

মৃত্তিকা জানিলে যেমন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদি জানা যায়, তেমনি পরমাত্মাকে জানিলেই উপাধিগত ও মিথ্যা নামাশ্রিত সকল আত্মাই জানা যায়।

অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্য জ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট, তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদান কারণ বোধক এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

এস্থলে যতঃ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। সুতরাং যাহা অপাদান বা উপাদান তাহাই প্রকৃতি। এতদনুসারে যিনি জগৎকার্য্যের উপাদান তিনিই ব্রহ্ম।

(৩) শ্রুতিতে যে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, তাহাও ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।"

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

যখন তিনি কামনা বা সংকল্প করিয়াছেন, তখন তিনি নিমিত্ত কারণ এবং যখন তিনিই বহু হইয়া জন্মিয়াছেন, তখন তিনি উপাদান-কারণ।

(৪) অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রলয়ের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন :—"এই সকল ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়।"*

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশংপ্রত্যস্তং যন্তি।"

যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অস্তগত হয়, সে তাহার উপাদান। যেমন ধান্যাদি উদ্ভিদের উপাদান পৃথিবী।

(৫) ব্রহ্ম আপনি আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য এই:—

"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।" —তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

ব্রহ্ম আপনি আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।

এইরূপ সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, ব্রহ্মই সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান কারণ। তবে উপাদান-কারণ কাহাকে বলে? চরক-সংহিতায় উপাদান কারণের এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে:—

"কার্য্যযোনিস্ত সা যা বিক্রীয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।"

* বেদান্তের মীমাংসা এই, ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সর্ব্বলোকগতি আকাশ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম।—১।১।২২।

ভগবান্ আত্রেয় বলেন,যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কার্য্যযোনি, যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ, ঘট ও কুণ্ডলের কার্য্যযোনি। অতএব, যাহা সমবেত বা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম উপাদান-কারণ।

কার্য্যরূপে যাহা পরিণত হইয়া এক নূতন দ্রব্যরূপে সমুদ্ভূত হইল, তাহা কি পূর্ব্বে ছিল না? প্রসিদ্ধ দার্শনিক হ্যামিল্টন বলিতেছেন:—

"When we are aware of something which begins to be, we are, by the necessity of our intelligence, constrained to believe that it has a cause. But what does this expression, that it has a cause, signify? If we analyse our thought, we shall find that it simply means, that as we can not conceive any new existence to commence, therefore, all that now is seen to arise under a new appearance, had previously an existence under a new form. * * * We are unable, on one hand, to conceive nothing becoming something or something becoming nothing."

Hamilton's Lectures on Metaphysics. vol. II, p 377

উপাদান-কারণের সহিত নিমিত্ত-কারণের প্রভেদ কোথায়? মিল বলিয়াছেন, উপাদান (Patient) এবং নিমিত্ত (Agent) উভয়ই যে কার্য্যের অবস্থা-বিশেষ (conditions of the phenomenon), তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কারণ শব্দের অর্থ বিচার করিলে উপাদান আর নিমিত্ত হইতে স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না।

মিল বলেন:—

"In most cases of causation, a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be universally allowed,are conditions of the phenomenon, but it would be thought absurd to call the latter the cause, the title being reserved for the former."

* * * *

The distinction between agent and patient is only verbal, patients are always agents."

Mill's Logic, Vol. I, p 348.

সাংখ্য জড় প্রকৃতিকে সৃষ্টির উপাদান বলিতে চান। কিন্তু বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এক্ষণে আর জড় প্রকৃতি স্বীকার করিতে চাহেন না। এ সম্বন্ধে "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে" এই কতিপয় উক্তি ধৃত হইয়াছে:—

"Matter consists not of solid particles but of mere mathematical centres, from which proceed forces according to certain mathematical laws, by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again."

A. Dictionary of Science by Rodwell.

"Material molecule is some kind of knot . . coagulation of Ether."

"Matters are centres of force attracting and repelling each other in all directions"

জড় বিজ্ঞানের মহাপণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরও প্রাকৃতিক জগতের বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা করিয়া কিরূপ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, দেখুন:

"Having seen that our experiences of Matter and Motion are resolvable into experiences of Force; we further saw the truths that Matter and Motion are unchangeable in quantity. This we discovered is the truth by derivation from which all other truths are to be proved."

First Principles. Part I.

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা আপাততঃ স্থূলদৃষ্টিতে জড় পদার্থ বলিয়া প্রতীত, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা শক্তিময় পদার্থ। এই স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সেই শক্তিরই কার্য্যময় বিকাশ এবং সেই কার্য্যের যাহা কারণ, তাহাই শক্তি।

সৃষ্টির উপাদন কারণ জড় কিরূপে হইবে? উপাদান যখন কারণ, তখন উপাদানে এমত শক্তি আছে যে, শক্তি-নিমিত্ত-কারণের মত ক্রিয়াশীল। সাংখ্য মতে যাহা অব্যক্ত প্রধান এবং অষ্টবিধ প্রকৃতি, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি সমুদায় ক্রিয়াশীল শক্তি বিশিষ্ট। যাহা সূক্ষ্মশক্তিময় ও ক্রিয়াশীল, তাহাকে অচেতন বলা যায়

কি? শক্তি কি জড়? ইউরোপীয় বিজ্ঞানে শক্তি কিরূপে নির্ণীত হইয়াছে, দেখুন :—

"I therefore use the term Force, in reference to them, as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to induce its various changes"
Grove's Correlation of Physical Forces

এই শক্তির দুই অবস্থা—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।* মূর্ত্তাবস্থায় তাহা কার্য্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং অমূর্ত্তাবস্থায় তাহা সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গম্য নহে। অমূর্ত্তাবস্থায় তাহা কারণরূপে ক্রিয়াশীল। তাই ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন :—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং।"
শারীরিক ভাষ্য। ২অ, ১পা, ১৮ সূত্র।

চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করিতেছি,সে সমুদায়ই শক্তির কার্য্য বা কার্য্যাবস্থা। শক্তি কার্য্যাবস্থায় মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, তাহার কারণাবস্থাই সাংখ্যের সূক্ষ্ম অষ্ট প্রকৃতি।

অষ্ট প্রকৃতিই অমূর্ত্ত কারণাত্মক শক্তিময় জগৎ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সাংখ্যের এই অষ্টবিধ প্রকৃতি-রাজ্য সমুদায় অনুমান-গম্য। তাই মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি দেব শক্তিকে অনুমানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কারণাত্মক শক্তিময় অব্যক্ত যে একেবারে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করিয়াছে তাহা নহে, সকল পরিণামই ক্রমানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। শক্তির এই ক্রমপরিণামতত্ত্ব সাংখ্য-কার অষ্টবিধ প্রকৃতিতত্ত্বে বিবৃত করিয়াছেন। এই অষ্টবিধ প্রকৃতিতত্ত্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে কারণাত্মক শক্তি এক অবিশেষ বা সামান্য পরিণাম হইতে অন্য পরিণাম প্রাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ ভগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

"ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থা আছে। স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা প্রকৃতির বিশেষ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) পর্ব্ব; পঞ্চ তন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ; বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব এবং অব্যক্ত (মূল-প্রকৃতি বা প্রধান) গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অলিঙ্গ পর্ব্ব। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সকলই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্ন ভাব। তবে সকল পরিচ্ছিন্ন ভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ অসংখ্য।"

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আছে—সেই অমৃতাত্মা চতুষ্পাদ; তিনি একপাদ দ্বারা সংসারে যাতায়াত করিতেছেন। এই চতুর্থ পাদই পরি-বর্ত্তন শীল জগৎ। জগৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, স্থূল হইতে আবার সূক্ষ্মে যাইতেছে। তাই নিরুক্তকার ভগবান যাস্ক বলিয়াছেন :—সেই অনন্ত ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ রূপে অবস্থিত। সত্ত্ব মধ্যে রজঃ ও তমঃ প্রভাবে এই জগতের আবির্ভাব। এক সৎ সত্ত্বরূপে যখন সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল, তখনই তাহাকে রজঃ গুণান্বিত বলা যায়। যখন সেই সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলত্ব ঘন স্থূলাবস্থায় অবস্থিত, তখন তাহা তমোগুণান্বিত। রজঃ প্রভাবে সত্ত্ব এই স্থূলজগতে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন, আবার স্থূল জগৎ সূক্ষ্মসত্ত্বে লীন হইতেছেন। সুতরাং রজঃই সত্ত্বের সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল অবস্থা। সেই রজঃ গুণে সত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তাবস্থা যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত, তখনই সত্ত্বের তমোগুণের বিকাশ। এই সত্ত্ব লঘু, এজন্য

* শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ, কিন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ দ্বিবিধ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। শারীরিক ভাষ্য—৩।২।২২।

সকল অবস্থায় তাহা থাকিতে পারে, রজঃই সত্ত্বের চলত্ব ধর্ম্ম বা ক্রিয়া বা গতি এবং তমঃ অতি গুরু, এজন্য তাহাই ক্রিয়াশীল সত্ত্বের ঘনাবস্থা। শক্তির অমূর্ত্ত কারণাবস্থায় সত্ত্ব রজঃ গুণান্বিত এবং মূর্ত্ত বা ব্যক্ত কার্য্যাবস্থায় তমো-গুণান্বিত। লঘু সত্ত্বই শক্তিমান, রজঃ ও তমঃ সেই শক্তিমানের চলত্ব ও ঘনাবস্থা মাত্র।

সূক্ষ্ম বা কারণ শক্তি স্থূল কার্য্যাবস্থায় আসিবার সময়ে যে অলিঙ্গ, লিঙ্গ এবং অবি-শেষ অবস্থা ত্রিতয় প্রাপ্ত হয়, সাংখ্যকার তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। জড়-বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার তৎসম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিরূপ বৈজ্ঞানিক সমন্বয়-সাধক প্রণালীক্রমে তিনি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,তাহা তাঁহার বিস্তৃত প্রমাণ পর্য্যালোচনায় পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে সেই সিদ্ধান্ত মাত্র উক্ত হইতে পারে।

"The deduction next drawn, was that forces which seem to be lost are transformed into their equivalents of other forces, or conversely, that forces which become manifest, do so by disappearance of pre-existing equivalent forces. Of these truths we found illustrations in the motions of heavenly bodies, in changes going on over earth's surface, and in all organic and super-organic actions."

তবেই প্রতীত হইতেছে, লোক যাহাকে সামান্য জ্ঞানে জড় বলেন, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহা শক্তিপুঞ্জের সাম্যাবস্থা। যে গতির কার্য্য জগতে নিয়ত চলিতেছে, সেই গতির সাম্যাবস্থাই (State of Equilibrium) স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। শক্তিই এই গতির কারণ। রজঃ (Energy or force) লঘু সত্ত্বকে চলৎ অবস্থায় আনে, এই গতির সাম্যাবস্থাই (Inertia) তমঃ। স্থূল জগৎ আর কিছুই নহে, তাহা সূক্ষ্ম গতিশীল কারণা-ত্মক শক্তিসম্পন্ন জগতের ঘন(Inert)অবস্থা।

এই সূক্ষ্ম গতিশীল কারণাত্মক শক্তিকেই যদি রজোগুণ বলা যায়, তবে বলিতে হইবে রজঃ সৃষ্টির কারণ; এই রজঃ প্রভাবে সৃষ্টি ব্যাপার তমোগুণান্বিত হইয়া সাম্যাবস্থায় আসিলেই স্থূল জগতের বিকাশ। কারণা-ত্মক শক্তিসম্পন্ন জগৎই, বিশ্বের কারণ-শরীর এবং এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির কার্য্য-শরীর। বেদান্ত মতে কারণ শরীরই কারণ-ব্রহ্ম এবং এই কার্য্য-শরীরই কার্য্য-ব্রহ্ম। অথবা কি কারণ-শরীর, কি কার্য্য-শরীর উভয়ই ব্রহ্মের রূপ।

সমস্ত দার্শনিক সৃষ্টিবাদের একমাত্র কারণ যে ব্রহ্ম, তাহার হেতু এই, সকল বেদান্তেই উক্ত হইয়াছে, এই জগৎ পরিদৃশ্য-মান হইবার পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম বা"সৎ" * Principle of Existence) মাত্র ছিলেনঃ—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।"——ছান্দোগ্য।

"হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বে এক সৎমাত্র ছিলেন।"

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ——ঐতরেয়।

"জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন।"

যাহা সৎ, তাহাই আত্মা এবং তাহাই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। বেদান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, এই সৎই—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় শাখায় সেই সৎই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, তিনিই চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। তাই

* শ্রুতিতে সৎ বলিলে কেবল সত্য বুঝায় না, সৎ শব্দের আর এক অর্থও আছে। যাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যমান, তাহাও সৎ, এই সৎ শব্দের বিপরীত অসৎ। অসৎ বলিতে, যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যমান নহে, কিন্তু যাহা সূক্ষ্মভাবে আছে। শ্রুতিতে যে উক্ত হইয়াছে—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এ জগৎ পুর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহা এই অর্থেই অসৎ। সৌগতের অভাবাত্মক অসৎ নহে।

যদি হয়, তবে অচিৎ আসিল কোথা হইতে? যে অচিৎ পূর্ব্বে ছিল না, তাহা আসিল কোথা হইতে? আমাদের সামান্য জ্ঞানে দেখিতে পাই, চেতনা ছাড়া এক জড় রহিয়াছে। এ জড়ের উৎপত্তি কোথায়? বেদান্ত দর্শন বলেন, এ জড়ের উৎপত্তি নাই; বাস্তবিক জড় কিছুই নাই; তাহা তোমার মিথ্যা দৃষ্টি মাত্র। সম্যগ্ জ্ঞানে এ জড়ের প্রতীতি নাই, সকলই ব্রহ্মময়। জগতের সকল রূপেই সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। কোথাও তিনি সৎরূপে বিদ্যমান, কোথাও তিনি সচ্চিৎরূপে বিদ্যমান; আর কোথাও বা তিনি সচ্চিদানন্দরূপে বিদ্যমান। তমোগুণবহুল মৃত্তিকা, শিলাদি জড়পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার চিদানন্দ অব্যক্ত। শঙ্কর বলেন, আমরা যে কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতিকে অচেতন বলি, চৈতন্যের অব্যক্ততাই তাহার কারণ। অভিব্যঞ্জকের অল্পাধিক্য লইয়াই চেতনাচেতন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। চেতন অচেতন ব্যবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি-ঘটিত।* পঞ্চদশী বলিতেছেন:—

"সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্ত্বৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্॥"

"সত্তা, চৈতন্য ও সুখ পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ। জগৎ ব্রহ্মকার্য্য; কার্য্য, কারণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, সুতরাং জগৎ ও সত্তাদি প্রাগুক্ত ব্রহ্ম-স্বভাববিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। জগৎ ব্রহ্মস্বভাব বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। ত্রিগুণময়ী মায়া বা অবিদ্যাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বত্র উক্ত ব্রহ্ম-স্বভাবত্রয়কে অভিব্যক্ত হইতে দেয় না। তমোগুণবহুল মৃচ্ছিলাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হয়, অন্য স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি তাহাতে হয় না।"

পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার "A Study of Religion" নামক গ্রন্থে বলেন:—

"In conformity with the primitive intuition 'everything that begins to first is put forth by a will-directed power', all nature is at first alive"—vol. 1, p. 219

পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট বলেন:—

"It has also been seen that in this endless chain of conditioned existence, we cannot be satisfied with a make-believe universe, or one consisting only of dead matter, but prefer a living intelligent universe; in other words, one fully conditioned. Finally our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the unseen."

The Unseen Universe. p 217-218

"If matter in reality be something quite different from what we have been hitherto in the habit of thinking it to be; if we include within itself from the be ginnng not merely life but mind, then the appearance of both in the course of its development need excite no surprise and puzzle * * *
For undoubtedly our primary and our highest analogue of force is not matter but what we called mind—the operation of our own Self Consciousness."

Blackwood's Edinburgh Magazine—November, MDCCCL XXIV no DCC IX.

এই ইংরাজী উক্তির সহিত সাংখ্যমতের তুলনা করুন। সাংখ্যকার বলেন, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরিণাম; এই ভূতপঞ্চক হইতে মৃচ্ছিলাদি পঞ্চস্থূলভূতের উৎপত্তি। অহঙ্কার বুদ্ধি তত্ত্বের পরিণাম। সুতরাং যাহা পরমাত্মরূপে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, তাহারই বিকাশ এই জগৎ।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, উদ্ভিদ সকল বহুবিধ দুঃখফল ও অধর্ম্মহেতু তমোগুণবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে, তজ্জন্য তাহারা বহির্ব্যাপার-শূন্য। কিন্তু বহির্ব্যাপার শূন্য হইলেও তাহাদের অন্তঃসংজ্ঞা আছে, সুখ দুঃখের অনুভব আছে।

* শারীরিক ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্র—২।১।৪।

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥"

১ অ—৪৯।

মহাভারতে আছেঃ—

"এইরূপে যখন উহাদিগকে (বৃক্ষলতাদি) সুখদুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।"

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়। ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ।

যাহাকে জীবনীশক্তি বলে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ প্রাণ বলিয়া থাকি, সেই জীবনীশক্তি কি আমাদের ইচ্ছাধীন, না তাহা স্বতঃই সচেতনভাবে কার্য্য করিতেছে। বৃক্ষলতাদির জীবনীশক্তি কোন্ ইচ্ছাধীন? আমাদের শারীরিক ক্রিয়া সমস্ত কি আমাদের ইচ্ছাধীন? এই দেখুন, ইউরোপীয় বিজ্ঞান কি বলিতেছেনঃ—

"The will has no power whatsoever over certain movements that are essential to the continuance of life. Not only do such motions as those of the heart and the intestines go on without any co-operation of the will and inspite of any intervention on its part, but movements that are only microscopically visible, such as the contractions of the small arteries, which are of so great importance in nutrition are not under its direct influence. Nature has been far too prudent to rely upon such an uncertain and comparatively late-appearing force for the movements essential to the continuance of life."
The Physiology of Mind by H Maudsley.

সমস্ত জীবনীশক্তিই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যের বিকাশ। আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি, আমার শরীরে জীবনীক্রিয়া আপনা আপনি চলিতেছে। সুতরাং তাহা মনের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। তাহা নিজেই সকর্ম্মক ও সচেতন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্যময় ব্রহ্ম এজগতে পঞ্চবিধ আকারে অবস্থান করিতেছেনঃ—অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। যাহাকে আমরা জড়জগৎ বলি, তাহাই ব্রহ্মের অন্নময় রূপ। এই অন্নময় জগতে চেতনার বিকাশ স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, কিন্তু তাহাতে যে সূক্ষ্ম শক্তির উপলব্ধি হয়, সেই সূক্ষ্ম শক্তিতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সেই শক্তিরই কার্য্য বা স্থূলরূপ এই জড়জগৎ। জড়জগৎ সূক্ষ্ম শক্তিময় কারণের স্থূল কার্য্য। দ্বিতীয় কোষ—প্রাণময় জগৎ। সেখানে চেতনার ঈষৎ বিকাশ—প্রাণক্রিয়াতে সেই বিকাশ উপলব্ধি হয়। উদ্ভিজ্জ জগৎ এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় কোষ মনোময় জগৎ। মনোময় জগতে স্পষ্টই চেতনার অভিব্যক্তি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি এই জগতের অন্তর্গত। চতুর্থ কোষ বিজ্ঞানময়। ইতর জীবজন্তুর ঊর্দ্ধে মনুষ্যগণ এই বিজ্ঞানময় কোষান্তর্গত *। মনুষ্যেই আমরা বিজ্ঞানের (consciousness) বা অহঙ্কারের উপলব্ধি করি। মনুষ্যের উপরেই দেব-রাজ্য—দেবরাজ্যে সকলই আনন্দময়। কেবল মনুষ্যেরই শক্তি আছে, এই আনন্দময় রাজ্যে উপনীত হন। এজন্য দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম হইতে আমরা দেবত্ব লাভ করিতে পারি। এক মনুষ্যেই পরিদৃষ্ট হয়, স্থূল জড়দেহান্তর্গত প্রাণ, প্রাণান্তর্গত মন, মনোময় কোষান্তর্গতই বিজ্ঞান। পঞ্চদশীতে ব্রহ্মের এই পঞ্চ কোষ বর্ণিত হইয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার সচ্চিদা-

* বিজ্ঞানই জীবাত্মা। পরমাত্মা উপাধিগত হইলেই জীবাত্মারূপে অবস্থিত, যেমন ঘটাকাশে মহাকাশ বিদ্যমান। এই বিজ্ঞানাত্মা সকল ভূতান্তর্গত এবং সকল জীবান্তর্গত হইলেও মনুষ্যে তাহা অহং জ্ঞানে বিশেষরূপে ব্যক্ত। এই অহং, সোঽহং ও তত্ত্বমসি জ্ঞানে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধন হয়।

নন্দ স্বরূপ এই পঞ্চ কোষেই পরিব্যক্ত আছে। শঙ্কর বলেন, আনন্দময়ত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, অপর চতুষ্টয় তাঁহার সগুণ রূপময় ভাব।

যাহা কিছু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা বাহ্যরূপ, তাহা বেদান্তে এক "ভূত" নামেই অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহা সকলই সেই ব্রহ্মভূত পদার্থ। তাই বেদান্ত বলিয়াছেনঃ—

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

যেখানে সাংখ্যকার বলিলেন, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীবজগৎ সমুৎপন্ন, সেখানে বেদান্ত সেই চেতনাচেতন জগৎকে এক ভূত জগৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্যের স্থূল ও অচেতন ভূতের সহিত এ ভূত সমানার্থক নহে। বেদান্তের সর্ব্বভূতান্তর্গত সমস্ত জগৎ—সে জগৎকে তুমি চেতনময় বল আর অচেতন বল। তাহার কারণ এই, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, সেই ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং এই স্থূল জগৎ সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মেরই রূপ বা বিবর্ত্ত। পূর্ব্বে যাহা অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ নামের ও জগদ্রূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছেঃ—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ,
তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত।"

যে সূক্ষ্মরূপ স্থূলাকারে আসিয়াছে, তাহা এক ভূত নামেরই যোগ্য। ব্রহ্ম সর্ব্ব ভূতের আত্মা স্বরূপ। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ভূত, তাহা সূক্ষ্ম শক্তিময় কারণ-ব্রহ্মের কার্য্য বিকার। স্থূলভূতই কার্য্য-ব্রহ্ম এবং সূক্ষ্ম শক্তিময় ব্রহ্মই কারণ-ব্রহ্ম।

তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেনঃ—

"প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য স্বয়ংই উপসংহৃত হয়েন।"

"স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥"
১অং ২অ, ৬৩।

কিরূপে সৃষ্টি হইল?

"তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টি-কর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন; যেহেতু, সূক্ষ্ম (অসৎ) বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত। সৃজন কার্য্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তু সকল নিজ নিজ শক্তি দ্বারাই স্বভাবতঃই বস্তুতা প্রাপ্ত হয়।"

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধান কারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥
নিমিত্ত মাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম॥
১ অ, ৪ অ, ৫১। ৫২।

বিষ্ণুপুরাণের এই সকল কথাতেই বেদান্তের সৃষ্টিবাদ কথঞ্চিৎ অভাসিত হইতেছে। সেই সৃষ্টিবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরে ব্যক্তব্য। এক অদ্বয় ব্রহ্মই যে এই জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ, এ প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তিনি সেই রূপ কারণ হওয়াতে কিরূপে তাঁহার সগুণত্ব নির্গুণত্বে সম্ভব হইয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের অপরাংশ। আমরা সেই অংশ পরবারে গ্রহণ করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

আলোকে।

১

মোর বাড়ী দূর এক পাশে,
শ্লথ, মৌন, অন্ধকার-বাসে ;
হেথা যে মা বসুন্ধরা,
উদার জ্যোছনা ভরা
বিমল কনক-আলো, মর ধামে হাসে !
হেথা নর নারীগণ,
উদার নিষ্পাপ মন,
অমরার জ্যোতিঃ এযে ভূতলে প্রকাশে !

২

একবার দেখি আঁখি ভরি,
বুকে বহে আনন্দ-লহরী ;
স্বার্থপর, ভ্রান্তচিত,
শত পাপ কলুষিত,
আমরা লুকায়ে থাকি জগত পাসরি !
এমন আলোক ভাই,
আমাদের দেশে নাই,
আমাদের দেশে নাই এ সোণার তরী।

৩

জনমের সৌভাগ্য বিশেষ,
দেখিনু এ জ্যোছনার দেশ !—
যদি রে দেখিনু আলো,
কেন মোরা র'ব কালো—
উপরে স্বরগ গঙ্গা, মরতে স্বদেশ,
এই দুই সাক্ষী করি,
মলিনতা পরিহরি,
আয় সবে আলোপুরে করিব প্রবেশ।

৪

এ জ্যোছনা যার গায়ে লাগে,
তার বুকে "মহাপ্রাণ" জাগে !—
মোরা ক্ষুদ্র, হীন, ভাই,
আলোকে ডুবিতে চাই,
দীন তো ধনীর দ্বারে সদা ভিক্ষা মাগে !—
আলোকে রয়েছ যারা,
ঢালিয়া করুণা ধারা,
আমাদেরো ডেকে লও, স্নেহ অনুরাগে।

৫

এ পবিত্র মধুমাখা আলো
কে ঢালিছ আরো ঢালো ঢালো ;
কোটী বোন্ কোটী ভাই,
সুধা-স্রোতে ভেসে যাই,
মুছি যাক্ মরমের অন্ধকার কালো ;
এই আলো বুকে মেখে,
বিশ্ব আলোকিত দেখে,
ভুলে যাই দুখ-স্মৃতি—আরো জ্যোতিঃ ঢালো।

৬

এ আলোক দেবের জ্যোছনা,
কোথা মিলে ইহার তুলনা,
শত শশী, শত রবি,
জোনাকীর সম সবি,
মানব মরমে জাগে অমর বাসনা !
এ আলো পড়ুক রঙ্গে
প্রতি নর নারী অঙ্গে,
দূর হো'ক পাপ, তাপ, সকল বেদনা ;
এ অমৃত মাখা আলো,
কে ঢালিছ আরো ঢালো,
ঘুচি যাক্ মরতের মরণ যাতনা ;
ডুবে থাকি সুধাস্রোতে, হারায়ে চেতনা।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য। (২)

অনেকে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি ইংরাজী বা ইউরোপীয় অন্যান্য পরিবর্দ্ধিত ও সমুজ্জ্বল সাহিত্যের সহিত তাহার তুলনা করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ইহা অন্ধ-দেশ-হিতৈষণার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য কোন কালে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের সমকক্ষ হইবে কি না, তাহা বিধাতা জানেন; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির শ্রমকাতরতা ও পল্লবগ্রাহিতা দূর না হইবে—যে পর্য্যন্ত জ্ঞানান্বেষণের প্রবল প্রবৃত্তি জাগরিত না হইবে,—অনুসন্ধিৎসা প্রবল না হইবে,—প্রকৃত স্বদেশবৎসলতা উদ্রিক্ত না হইবে, তত দিন বাঙ্গালা সাহিত্য কখনই প্রকৃতরূপে উন্নত হইবে না। আমরা যেমন আমাদের সাহিত্যও ঠিক সেইরূপ আকার ধারণ করিতেছে। উন্নতি লইয়া গৌরব করিতে হয় কর, কিন্তু অভাবের অনুসন্ধান, আলোচনা ও নিরাকরণ না করিলে কখনই প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা অপদার্থ লোকের ন্যায় নিতান্তই বড়াই-প্রিয়। আমাদের প্রকৃত অভাব কি এবং কি উপায়ে তাহা বিদূরিত হইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

বঙ্গ-সাহিত্যে আছে কি যে, আমরা তাহা লইয়া বড়াই করিব! আমরা সাঁওতালদিগের নিকট আমাদের সাহিত্যের বড়াই করিতে পারি বটে। কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক, রোমান, জর্ম্মান, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি গৌরবান্বিত সাহিত্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যের তুলনা করিতে গেলে নিশ্চয়ই অধোমুখ হইতে হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, বঙ্গভাষায় অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও নবেল বা "নবন্যাস" ও ২।৪ খানি অন্যান্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে; এবং তাহার কতকগুলি সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান পাইবার পাইবার উপযুক্ত। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন সে সকল গ্রন্থও সজীব থাকিবে; কিন্তু অপরগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেও কিছু হানি হয় না; তাহা না করিলেও কালে নিষ্পেষিত হইয়া তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে নবেল ও কবিতাস্রোতে বঙ্গভূমি প্লাবিত। পাঠক জ্ঞাত আছেন, তাহার অধিকাংশই কদর্য্য ও অপাঠ্য। যে সকল উপন্যাসে মানব-হৃদয়ের গভীর চিত্র অঙ্কিত হয়, চরিত্রের সুন্দর বিকাশ হয়, মানবীয় ক্রিয়ার স্বরূপ ও সঙ্গত এবং কার্য্য কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ চিত্র অঙ্কিত হয়, যাহাতে চতুর্দ্দিকের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই আদরণীয়। যে কবিতায় হৃদয়ের প্রবল প্রবৃত্তিগণের ক্রিয়া যথাযথরূপে ভাষার মধুরালোকে প্রদীপ্ত হয়, সত্য ও শোভার বিচিত্র সমাবেশ হয়, অঙ্কিত চিত্র মূর্ত্তিমান হইয়া মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন স্বরূপ। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দ বিন্যাসে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, প্রবল চিন্তাশক্তি, সহৃদয়তা ও শোভানুভাবকতা এবং মানবীয় জটিল ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম জ্ঞান ও মানব হৃদয় যন্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন ব্যতীত তাহা অসম্ভব।

যেমন অন্য কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য না

হইলে আমরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তর হইয়া থাকি, সেইরূপ, অন্য কোন কাব্যে পারদর্শী হইতে না পারিলে, আমরা অবশেষে উপন্যাস-লেখক ও কবি হইয়া উঠি। অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের বিষম দোষ এই যে, আমরা শিক্ষা না করিয়া, পড়া-শুনা না করিয়া, অনুসন্ধান না করিয়া, বহুদর্শিতা লাভ না করিয়া, বিনা অধ্যবসায়ে গ্রন্থকার হইতে চাই। ফলও সেইরূপ ফলিতেছে। যেমন বর্ষাসুলভ অযত্ন-সম্ভূত আগাছায় বঙ্গের চারিদিক পরিপূর্ণ হয় এবং শরতের শিশিরে তাহা অদর্শন হইয়া যায়, বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান পুস্তকাবলীও অনেক পরিমাণে সেইরূপ।

যেমন লেখক, তেমনি সমালোচক! সাহিত্যে সমালোচকের নিতান্ত প্রয়োজন। যোগ্য সমালোচকের ক্রিয়া দ্বারা সাহিত্যের অপদার্থতা বিদূরিত হয়—উচ্চ আদর্শ সাধারণের সম্মুখীন থাকে। কিন্তু সমালোচকের কার্য্য বড়ই কঠিন। সুরুচি, ভূয়োদর্শন, সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা, অপক্ষপাতিতা, পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্বোপরি বিচারশক্তি ব্যতীত কেহ উৎকৃষ্ট সমালোচক হইতে পারেন না। সমালোচকগণের গুণের উচ্চতা বা নীচতা অনুসারে, সমালোচকের ক্রিয়া শুভ বা অশুভ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে উপযুক্ত সমালোচকের নিতান্ত অভাব। যে দুই চারিজন এ গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহারা এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন।

চেষ্টা করিলে সমালোচকের ঐ সকল সদ্‌গুণ লাভ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু একটু ক্লেশ স্বীকারে প্রায় সকলেই পরাঙ্মুখ। তাহার উপর সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। সমাজ মধ্যে প্রবল সত্যনিষ্ঠা, স্বাধীনচিত্ততা, ও অপক্ষপাতিতার অভাব আছে। এ জন্য আমরা ন্যায় বিচার করিতে পারি না—স্পষ্ট কথা বলিতে পারি না। এই জন্যই সময়ে সময়ে অন্তঃসারশূন্য গ্রন্থের অযথা প্রশংসা এবং যত্ন-সম্ভূত সারবান গ্রন্থের উপেক্ষা দেখিয়া সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্যথিত হইয়া থাকেন। সাধারণের মত এক প্রকার গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ। যাঁহারা যথার্থ গুণবান ও সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারাই সাধারণের পথদর্শক স্বরূপ। সাধারণ মত পরিচালিত করা, তাহাকে স্বাস্থ্যরূপে রঞ্জিত করা, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য দেশের দুর্ভাগ্য এবং তাহা কোন মতেই বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবের বিষয় নহে।

এই গুরুতর অভাব বশতঃ—পক্ষপাতহীন ন্যায়পূর্ণ সমালোচনার অভাব বশতঃ—নীরোগ সবল ও সত্যনিষ্ঠ সাধারণ মতের অভাব বশতঃ—বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন আগাছায় পূর্ণ হইতেছে। এই কারণেই আজকাল চর্ব্বিত চর্ব্বণকারী গ্রন্থকারগণের হাস্যোদ্দীপক সমালোচক ও অনুকারীগণও গ্রন্থকার রূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বক্তৃতাকালে যেমন অজ্ঞ শ্রোতাগণ কখন কখন অসাময়িক করতালি দিয়া হাস্যাস্পদ হয়, ঐ সকল সমালোচকগণও সমালোচনা কালে সেইরূপ করিয়া থাকে। সমালোচিত গ্রন্থের যে অংশে বা বিষয়ে যথার্থ গুণপণা আছে, তাহা প্রায়ই তাহাদের বোধগম্য হয় না; যেখানে তাহা নাই, সেইখানেই তাহারা ভাবমুগ্ধ হয়! যে সমালোচকের মনে বা বংশে কখনও শোভানুভাবকতা কর্ষিত হয় নাই, সেও আজ খদ্যোতিকাকে চন্দ্রভ্রমে কি শোভা! কি শোভা! কি শোভা! বলিয়া নৃত্য করিতেছে!!!

বঙ্গ-সাহিত্যে কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ, নবেল ও ২।৪ খানি অপরাপর গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কেবল মাত্র নবেল ও কবিতা দ্বারা ইউরোপীয় উচ্চ ও গৌরবান্বিত সাহিত্যের ন্যায় কোন সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না। জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অনুশীলন করিয়া তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে না পারিলে সাহিত্য উন্নত ও পুষ্ট হইতে পারে না। মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে কয়খানি মৌলিক বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রতি আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারি? এ সকল ত দূরের কথা, বাঙ্গালা ভাষায় এখনও একখানি উৎকৃষ্ট শব্দকোষ বাহির নাই। বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কেহই বঙ্গের একখানি ভাল ইতিহাস লিখিতে পারেন নাই!

জ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কিরূপে প্রণীত হইবে? আমাদের জ্ঞান-পিপাসা কোথায়? যে জ্ঞানের অনুসরণে শত শত ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে, ভোগসুখ-বিরহিত হইয়া দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, আমাদের সেই প্রবৃত্তি কোথায়? সে অধ্যবসায় কোথায়? আমরা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিনা ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য মনে করি। যদি বিনা জ্ঞানে বিনা অনুসন্ধানে, বিনা ক্লেশে গ্রন্থকার হওয়া যায়, তবে আমরা আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহাতে সম্মত আছি, সন্দেহ নাই এবং সেইরূপ চেষ্টাও করিয়া থাকি। এরূপে মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না।

বঙ্গসাহিত্যে যে মৌলিকতার সম্পূর্ণ অভাব, বোধ হয় পাঠক এতক্ষণ তাহা বুঝিয়াছেন। এখন যাহা কিছু হইতেছে, প্রায় সকলই ইংরাজী অনুকরণে ও ইংরাজী সাহিত্যের সহায়তায়। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যকে প্রকৃত রূপে উন্নত করিতে হইলে, কেবল এ উপায়ে মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। ভূয়োদর্শন চাই, নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করা চাই, নূতন ধরণের মৌলিক চিন্তা চাই, নূতন পথে গতি চাই। এজন্য গভীর অধ্যবসায়ের বিশেষ প্রয়োজন। শ্রমকাতরতায়, অন্ধ অনুকরণে বা বৃথা বাগাড়ম্বরে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালি জাতি যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে বা মৌলিক চিন্তায় অসমর্থ, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জড়বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহা শ্লাঘনীয় ও আশাপ্রদ। ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যে যে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে শ্লাঘা-রঞ্জিত আনন্দে হৃদয় পুলকিত হয়। তাঁহারা ন্যায়দর্শন ও স্মৃতি সম্বন্ধে যে সকল অসামান্য মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের গৌরব ঘোষণা করিবে।

আমরা ত সেই জাতি। তবে ইংরাজ শাসনে যে সময়ে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাবে জ্ঞানান্বেষণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে—আমাদের অবস্থা কেন এত হীন ও শোচনীয়? বঙ্গ সাহিত্যে কেন মৌলিকতার এত অভাব? অন্যান্য কারণ যাহা কিছু থাকুক, আমরা ইহার দু একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

১। বিলাতী সভ্যতা তীব্রবেগে ভারতভা-

ভিমুখে ধাবিত হইতেছে—হিন্দু সমাজের বক্ষোপরি তরঙ্গিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শুভাবহ নহে? আমরা বলিতেছি না যে, যাহা কিছু বিলাতী সভ্যতার অন্তর্ভূত, সে সমস্তই দূষণীয়। বিলাতী সভ্যতার অঙ্গীভূত অনেক বিষয় আমাদের শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। বিলাতী সভ্যতা জনিত জ্ঞানান্বেষণ প্রবৃত্তি, অনুসন্ধিৎসা, জড় বিজ্ঞানাদি নিশ্চয়ই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু সে সভ্যতা জনিত আধ্যাত্মিকতার অভাব ও ভোগ বিলাসের প্রবলতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা অধমাংশেরই অনুকরণ করিতেছি। বিলাতী আদর্শের ভোগবিলাস আমাদের সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, সংসার যাত্রা নিতান্ত ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িতেছে—ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তি জন্য অর্থের অনুসন্ধানে সমস্ত জীবন বহিয়া যাইতেছে। জ্ঞানান্বেষণ কিরূপে হইতে পারে? মৌলিক গ্রন্থ, চিন্তাপূর্ণ নূতন নূতন গ্রন্থ কিরূপে প্রণীত হইতে পারে? নূতন তত্ত্ব কিরূপে উদ্ভাবিত হইতে পারে? বঙ্গীয় যে সকল মহামহোপাধ্যায়গণের উল্লেখ করা হইয়াছে—যাঁহারা ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ভোগবিলাস প্রপীড়িত ছিলেন না। তাঁহারা অর্থ লোলুপ না হইয়া জ্ঞান লোলুপ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

বিলাতী সভ্যতা জনিত ভোগ বিলাস যেমন বাড়িতেছে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সেইরূপ দিন দিন অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। আদর্শ পরিবর্ত্তন জন্য যেমন সাংসারিক ব্যয় বাড়িতেছে, অর্থাগম সেরূপ হইতেছে না। সুতরাং বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের মধ্যে আমরা দারিদ্র্য পীড়িত হইতেছি। জীবন সংগ্রামে হীনবল হইয়া কত ভদ্রলোকের বংশনাশ হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? জ্ঞানানুশীলন ভদ্রলোকেই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকেন। নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁহাদেরই করিবার কথা। বিলাস-তরঙ্গে আজ তাঁহারাই অধিক পরিমাণে বিপর্য্যস্ত, অভাব দশনে তাঁহারাই অধিক পরিমাণে চর্ব্বিত হইয়া অদর্শন হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমরা মৌলিকতার আশা কিরূপে করিব?

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে যেরূপ সহজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারিত, এখন সেরূপে অসম্ভব। সে কালে জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন ধারণ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতেন। রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে স্বাধীন বৃত্তি দিতেন। সাধারণ লোকেও জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে যথোচিত দান করিতেন। অনন্যোপায় হইলে তাঁহারা ভিক্ষাভোজী হইয়াও জ্ঞানানুশীলন করিতেন। এখন আর সেরূপে জ্ঞানান্বেষণ করা অসম্ভব হইয়াছে। এখন আর কঞ্চির কলমে ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে লিখিলে চলে না। এখন মূল্য দিয়া কাগজ কলম কিনিতে হয়। হাতে লেখা পুস্তকে আর চলে না, এখন পুস্তক কিনিতে হয়। কেবল মাত্র সংস্কৃত শিখিলে আর ব্রাহ্মণেরও চলে না, কারণ কিছু অর্থের প্রয়োজন। রাজভাষা ও দেশীয় ভাষা বিদ্যালয়ে শিখিতে হয়,—তাহাও ব্যয়সাধ্য। পণ্ডিতগণের স্বাধীন বৃত্তির লোপ হইয়াছে। বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেও আর পূর্ব্বের ন্যায় পণ্ডিতবর্গকে দান করিতে পারেন না। পণ্ডিতেরাও বঙ্গভাষার চর্চ্চা তত সম্মান জনক মনে করেন

না। স্বাধীন ভাবে সংসার চিন্তা বিরহিত হইয়া জ্ঞানান্বেষণ অসম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ কারণে শিক্ষাকার্য্য ব্যয়সাধ্য ছিল না। পণ্ডিতগণ কখন শিক্ষা দানের মূল্য গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে শিক্ষার আকার অন্য প্রকার হইয়াছে এবং তাহা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এখন শিক্ষালাভ এবং জ্ঞানচর্চ্চা উভয়ই অর্থ সাপেক্ষ। এখনকার কলেজে ফেলোশিপ নাই। সমস্ত দেশ মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যে, উন্নতি কামুক ব্যক্তি, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ এবং তৎপরে সংসার চিন্তা বিরহিত হইয়া বিনা ব্যয়ে আজীবন জ্ঞানানুশীলন করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা অনুভূত হইবে যে,বিলাতী সভ্যতা জনিত জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তন, ভোগ বিলাসের বৃদ্ধি, সাংসারিক ব্যয়ের আধিক্য, এবং তজ্জনিত দারিদ্র্য বঙ্গ-সাহিত্যে মৌলিকতার অভাবের প্রবল কারণ।

২। পশ্চিম ইউরোপে ভোগ বিলাসের প্রবলতা হইলেও সেখানকার পণ্ডিতগণ তাহাতে অনুরক্ত নহেন। সেখানকার অনেক মহা মহা ব্যক্তি অতি দীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আজীবন জ্ঞানানুশীলনে রত থাকেন এবং নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া সংসারের মঙ্গল সাধন করেন। তাঁহারা জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে, নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে পারেন। অন্ততঃ, তাঁহারা স্বীয় রচিত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারেন। আমাদের দেশে তাহা নাই। আমাদের দেশে নবেল ছাড়া যদি কেহ বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যদি কেহ জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানাদি বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তবে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে কে? সুতরাং লেখক লাভবান হইবেন না। মেঘনাদবধ রচয়িতা বঙ্গের উজ্জ্বল মণি, মাইকেল মধুসূদন, দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া, দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইউরোপের লোকে জ্ঞানের মহিমা বুঝিয়াছেন—আমরা সে বোধ হারাইয়াছি। সেখানকার লোকের অর্থাগম অধিক—আমরা দরিদ্র। জ্ঞান পিপাসার অভাব এবং দারিদ্র্য,এই উভয় কারণ সমবায়ে এদেশে মৌলিক গ্রন্থকার লাভবান হইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় এই দারিদ্র্যময় দেশে, কয়জন ব্যক্তি অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গভাষায় মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গগৌরব বৃদ্ধি ও দেশের উপকার করিতে পারেন? যাঁহাদের অন্নচিন্তা নাই—অর্থ ও সময় আছে, জ্ঞান আছে,—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সেরূপ লোকের সংখ্যাই এদেশে কম। শিক্ষা, অর্থ, সময় ও জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতির একত্র সংযোগ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার অভাবের অন্যতম কারণ এই।

৩। বঙ্গ সাহিত্যে মৌলিকতার অভাবের অন্য কারণ বিলাতী অনুকরণ। অনুকরণদ্বারা সময় বিশেষে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আমরা অনুকরণের উপকার অনেক পাইয়াছি। কিন্তু অনুকরণ উপকারিতার সীমা সংকীর্ণ। যে অভাব বশতঃ অনুকরণের প্রয়োজন, পূরণ হইলে আর তাহার উপযোগিতা থাকে না। অনুকরণ মৌলিকতার বিরোধী পদার্থ। এক জাতীয় লোক বিভিন্নাবস্থাপন্ন অন্য জাতীয় লোকের অনুকরণে চির দিন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গ

সাহিত্যে ইংরাজী অনুকরণ কখন চিরদিন সম্যক্‌রূপে ফলোপধায়ী হইতে পারে না। আমাদের সামাজিক গঠন ধর্ম্মপ্রণালী, ভাষা, আচারপদ্ধতি, জল-বায়ু, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি বিলাত ও ইংরাজ হইতে পৃথক। সুতরাং আমাদের সাহিত্য ঐ সকল বিষয়ের অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। মৌলিকতা ঐ সকল অবস্থার সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া সমুদিত হইবে। এখনও অনুকরণ তরঙ্গ প্রশমিত হয় নাই। উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি যাহা এখন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, বিলাতী ভাব। আমরা আপাততঃ অনুকরণান্ধতাগ্রস্ত হইয়াছি। এ অবস্থায় যথার্থ মৌলিকতা কিরূপে সমুদিত হইবে?

৪। মৌলিকতার অভাবের অপর একটী কারণ এইঃ—ভারত অতি বিস্তীর্ণ দেশ। রুসিয়া বাদ দিয়া ইউরোপের অপর সমস্ত দেশগুলি একত্র মিশাইলে যত বড় হয়, ভারতবর্ষ প্রায় তত বড়। এখানে হিন্দি, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, তামিল প্রভৃতি নানা ভাষা প্রচলিত আছে। ইউরোপে যেমন ফরাসীভাষা সকল দেশীয় লোকে অল্প বা অধিক বুঝিতে পারেন, এবং সর্ব্ব দেশীয় ভদ্রলোকে অল্পাধিক পরিমাণে ফরাসীভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, এখানে সেরূপ কোন ভাষা নাই। কিয়ৎপরিমাণে ভারতে হিন্দিভাষা ইউরোপে ফরাসী ভাষার ন্যায়। উত্তর পশ্চিম বেহার, রাজপুতনা ও পঞ্জাবের কেবল শিক্ষিত ভদ্রলোকেই অল্প পরিমাণে হিন্দি বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু যথারীতি অল্প লোকেই তাহা শিক্ষা করিয়া থাকে। হিন্দি ব্যতীত ভারতের এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোক বুঝিতে পারে না।

পূর্ব্বকালে মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে এক সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র ভারতব্যাপিনী ছিল। যদিও তাহা সাধারণের কথিত ভাষা ছিল না, তথাপি ঐ ভাষায় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও পণ্ডিত মণ্ডলী পুস্তকাদি লিখিতেন ও পরস্পর মনের ভাব বিনিময় করিতেন। প্রাকৃত, মাগধী প্রভৃতি ভাষায় সাধারণ লোকে কথোপকথন করিত। সেই সকল ভাষার স্থান এখন হিন্দি, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষা অধিকার করিয়াছে। মুসলমান শাসনকালে রাজভাষা পারস্য ছিল এবং রাজ কার্য্য ঐ ভাষায় সম্পন্ন হইত। তথাপি ঐ সময়ে হিন্দি ভাষার চর্চ্চা অধিক হইয়াছিল। অসংখ্য বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে বসতি করিয়াছিল। ক্রমে হিন্দির সহিত অসংখ্য আরবী, পারসি শব্দ মিশ্রিত হইয়া ঐ ভাষা উর্দ্দু নামে আখ্যাত এবং ক্রমে তাহা মুসলমানাধিকৃত ভারতের সর্ব্বত্রে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীতে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ ভাষার চর্চ্চা বিলক্ষণ হইয়াছিল। এখনও উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের আদালত সমূহে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত এবং ঐ সকল দেশের শিক্ষিত মুসলমানেরা ঐ ভাষাকেই মাতৃভাষা মনে করেন। কিন্তু ঐ ভাষার চর্চ্চা সহরে যেমন, মফঃস্বলে তেমন নহে। পল্লীগ্রামের লোকে হিন্দিতেই কথোপকথন করে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত না হইয়া পূর্ব্বাপর পারসি অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে। পারসি অক্ষরে লিখন পঠন দেব নাগরীর ন্যায় সহজ নহে। এজন্য পারসী অক্ষরে লিখিত উর্দ্দু ভাষা তত লোকপ্রিয় বা ভারত-সাধারণ হয় নাই। কখন এরূপ ভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয় নাই,

যদ্দ্বারা ভারতের নানা দেশীয় ভাষা সমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও বিলুপ্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে হিন্দি, বাঙ্গালা মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভারতের নানা দেশীয় ভাষা সমূহ মুসলমান শাসন কালেও ক্রমশঃ জাগরিত ও পুষ্ট হইতেছিল। ইংরাজ শাসনকালে ঐ সকল ভাষা বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে। সুতরাং লোকপ্রিয় এবং ভারত-সাধারণ কোন ভাষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ইংরাজ শাসনকালে, রেল, মুদ্রা যন্ত্রের প্রভাব, ইংরাজি শিক্ষা, শাসনের একতা প্রভৃতি কারণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্টতা ও নৈকট্য অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইতেছে। বিলাতের সহিতও একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এখন সমগ্র ভারতবাসীর নানা বিষয়ে পরস্পর ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতে এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইতে পারে। যাহার প্রয়োজন, কোন প্রকারে তাহা সিদ্ধ হওয়া চাই। সুতরাং ইংরাজী ভাষা দ্বারা আপাততঃ সেই কার্য্য সাধিত হইতেছে। ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে হইলে, রাজ জাতিকে কিছু বলিতে হইলে, ইংরাজীতে বলা বা লেখা আবশ্যক। এজন্য এ দেশের অনেক গুণবান, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার সেবায় নিযুক্ত; কারণ বঙ্গভাষা দ্বারা বা ভারতের অন্য কোন ভাষা দ্বারা ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি ঐ সকল শ্রেষ্ঠ ও গুণবান ব্যক্তির জ্ঞান ও প্রতিভা স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইত, সন্দেহ নাই।

৫। ইংরাজি অতি দুরূহ ভাষা। এই ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। জ্ঞানলাভ অর্থোপার্জ্জনাদি নানা কারণে এ দেশের অসংখ্য লোক ইংরাজি ভাষার সেবায় নিযুক্ত, কিছু দিন পরিশ্রম করিয়া ঐ ভাষা শিক্ষা করিলেই কার্য্য শেষ হইল না; লব্ধজ্ঞান রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার চর্চ্চার প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ লোকেই অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল, জীবিকা অর্জ্জনে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। ইংরাজী ভাষায় বিশিষ্ট জ্ঞানলাভে যে সময় অতিবাহিত হয়, যদি তাহা মাতৃভাষার অনুশীলনে ও স্বাধীন চিন্তায় নিয়োজিত করা সম্ভব হইত, বঙ্গসাহিত্য যদি ইংরাজির সমকক্ষ হইত এবং অর্থোপার্জ্জনাদির জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারিত। ইংরাজী শিক্ষায় ও জীবিকা অর্জ্জনে যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম হয়, তাহার পর, মাতৃভাষার অনুশীলন, তত্বান্বেষণ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে অতি অল্প লোকেরই সময় ও সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে। এরূপ অবস্থায় বঙ্গভাষায় মৌলিকতার অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেবল সময় ও অবস্থার শুভ পরিবর্ত্তনে এ অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

৬। আর এক কথা এই যে, এদেশে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা যাহা কিছু পাঠ করি, প্রায় সমস্তই ইংরাজী। বঙ্গভাষায় পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প। যাহা আছে, দুই চারি মাসের মধ্যেই তাহার পঠনা শেষ হইতে । বাঙ্গালা ভাষা দুর্ব্বল শিশু—ইংরাজী

ভাষা দৃঢ়কায় প্রবীণ। এখন ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বলের সহিত বলিষ্ঠের, শিশুর সহিত প্রবীণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গভাষায় লিখিত কোন বিষয়ক নূতন গ্রন্থ দেখিলেই আমরা সেই জাতীয় ইংরাজী গ্রন্থের সহিত তাহার তুলনা করি। আমরা বঙ্কিম বাবুর নবেল পাঠকালে স্কট, হিউগো ডিকেন্স থ্যাকার জর্জ্জ এলিয়ট প্রভৃতিকে ভুলিতে পারি না। অন্ততঃ মনে মনেও দেশীয় ও বিলাতী লেখকের গুণপনার তুলনা করিয়া থাকি। সুতরাং বিলাতী লেখকগণের তীক্ষ্ণ মানসিক কিরণের ছটায় আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া গিয়াছে। আমাদের অনেকেরই মনে হইয়াছে যে, বিলাতী লেখকগণের ন্যায় গুণপনা ও দক্ষতার সহিত লিখিতে না পারিলে আমাদের পণ্ডশ্রম হইবে; অথচ তাঁহাদের ন্যায় সময়, সামর্থ্য, শিক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যবসায় আমাদের নাই। একদিকে সময় ও শক্তির অভাব অন্যদিকে বিলাতী সুবিস্তৃত ও বর্দ্ধনশীল সাহিত্যের ঘনীভূত ছায়া বঙ্গীয় ক্ষুদ্র সাহিত্যের উপর পতিত হইয়াছে। এই কারণে তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি যথোচিতরূপে হইতেছে না। ইহা বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার অভাবের একটী প্রবল কারণ।

ইহা চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে ক্ষুব্ধ করিতেছে, সন্দেহ নাই। আপাত ক্ষোভের কারণ যতই থাকুক, বঙ্গ সাহিত্যের উপর যে গভীর ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহা চিরস্থায়ী নহে। ইহার এক উপকারিতা এই যে, একটা মহৎ আদর্শ আমাদের সম্মুখে পতিত হইয়াছে। যে সকল কারণ সমবায়ে বিলাতী সাহিত্য উন্নত হইয়াছে এবং যে সকল কারণ সমবায়ে আমাদের সাহিত্যে মৌলিকতার অভাব, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যদি আমরা জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই, যদি আমাদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ প্রবৃত্তি, সহিষ্ণুতা ও স্বজাতিবৎসলতা উদ্রিক্ত হয়, যদি আমরা প্রবল মনোবেগ ও অধ্যবসায় বলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই কিছুদিনে আমরাও উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলী লিখিতে পারিব। ক্রমে বঙ্গ-সাহিত্যের এক একটী শাখা বিলাতী সাহিত্যের ছায়া ভেদ করিয়া মস্তকোত্তোলন করিবে—ফলফুলে সুশোভিত হইয়া সভ্য জগতের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য সহজে সাধিত হইবে না। অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া জ্ঞান-পথে বিচরণ করিতে হইবে। নানা ক্লেশভার মস্তকে বহন করিয়া গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। প্রবল অর্থলালসা বর্জ্জন করিয়া ভোগ বিলাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া মহাসাধনায় নিরত হইতে হইবে। তবে আমাদের প্রতি জ্ঞানদেবীর কৃপা কটাক্ষ পতিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্য উন্নতি শিখরে সমুত্থিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৯)

আমরা পূর্ব্বে হইতেই বলিয়া আসিয়াছি যে, চিত্ত-শুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির সোপান-স্বরূপ। মলিন ও অশেষ আবরণাবৃত মনকে বিশুদ্ধ ও শান্ত করিয়া লওয়াই ব্রহ্মানন্দ লাভের প্রধান ও মুখ্য উপকরণ। চিত্ত-শুদ্ধির সাধন প্রধানতঃ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে (১) ইন্দ্রিয়-বিজয় ও

মনের উপরে আধিপত্য-স্থাপন প্রথম সাধন। সে কথা বিগত দুই সংখ্যায় আলোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে। যতদিন মনের উপরে আধিপত্য লাভ করিতে পারা না যায়, যতদিন ইন্দ্রিয় সমূহ স্ববশে স্থাপিত না হয়, ততদিন চিত্ত-বিক্ষোভ থাকিবেই। ইন্দ্রিয় সমূহ বশীভূত হইলে, মন আপনা আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার অধিকারে আসিবেই।

"সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।
শনৈঃ শনৈঃ রূপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

গীতা, ৬৷২৪-২৫।

মনের ধর্ম্মই সংকল্প। যখনই বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি হয়, তখনই মন স্বীয় সংকল্প দ্বারা সুখজনক ও ভোগ্য বিষয়-সমূহ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। ইহা পরিত্যাগ করিতে হয়। পরিত্যাগের উপায় কি? এ উপায় শিক্ষা একদিনের কার্য্য নহে। ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সহিত, অভ্যাস করিতে করিতে সেই উপায় সকল আয়ত্তীকৃত হয়। সে অভ্যাস কিরূপ? কিরূপ উপায়ের অভ্যাস করিলে, বিষয়-বাসনা দূর হইয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রামের উপরে আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়? মনোজয় বা ইন্দ্রিয়-জয়ের সেই উপায় পঞ্চবিধ। শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা ও সমাধি—এই পঞ্চবিধ উপায়ের নিয়ত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয় গুলি সহজে নিগৃহীত হয়। এইরূপ উপায়-শিক্ষা পরিপক্কতা লাভ করিলেই, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়-গুলি আত্ম-বশীভূত হইয়া পড়ে। এখন আমরা বিজয়ের উপায়ীভূত এই পঞ্চবিধ সাধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। (ক) শম।—"অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ শমঃ" (বেদান্ত পরিভাষা)। যে সকল বিষয়, ঈশ্বরবিষয়ক আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল, সেই সকল বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্ত করার নাম শম। যেরূপ অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে, ভোজন ভিন্ন অন্য বিষয়ে অভিরুচি জন্মে না এবং ভোজনে বিলম্বও সহ্য হয় না, তদ্রূপ যখন ঈশ্বর তত্ত্বের শ্রবণ মননাদি তত্ত্বজ্ঞান সাধন পদার্থের অত্যন্ত বলবতী অভিরুচি জন্মে, এবং যে বৃত্তি দ্বারা ধন বণিতাদি বিষয় সমূহে গমনশীল মনকে বলদ্বারা নিগৃহীত করিয়া রাখে, তাহার নাম শম। (খ) দম।—"বহিরিন্দ্রিয়—নিগ্রহো দমঃ" (বে, পরিভাষা)। যে বৃত্তি দ্বারা শ্রোত্র নেত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় গুলি শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তাহার নাম দম। (গ) উপরতি।—"বিক্ষেপাভাব উপরতিঃ" (বে, পরিভাষা)। যখন মন ও বহিরিন্দ্রিয় গুলি পূর্ব্বোক্তরূপে বিষয় সমূহ হইতে নিবর্ত্তিত হইলে, পুনরায় আর সেই দিকে ধাবিত হইতে না পারে, তাহার নাম উপরতি। (ঘ) তিতিক্ষা।——"শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনং তিতিক্ষা" (বে; পরিভাষা)। দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি শরীরে ধর্ম্ম এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি শরীর দ্বারা ত্যাগ করা অসম্ভব হইলেও, নির্ব্বিকার আত্মায় তাহা থাকিতে পারে না, অতএব এগুলি মিথ্যা এইরূপ জ্ঞানের নাম তিতিক্ষা।

(ঙ) সমাধি।—"চিত্তৈকাগ্র্যং সমাধানং" (বে, পরিভাষা)। যখন শব্দাদি বিষয় হইতে মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত হয়, তখন সেই গুলিকে ব্রহ্মাভিমুখে সংলগ্ন রাখিতে হয় এবং সর্ব্বদা ধারাবাহিকরূপে তচ্চিন্তায় রত থাকিতে হয়। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে

এইরূপে অভ্যাস করিতে থাকিলে, ইন্দ্রিয় নিচয় বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

চিত্ত-শুদ্ধির দ্বিতীয় সাধন—(২) আত্ম-তত্ত্বাভ্যাস। এই আত্মতত্ত্বাভ্যাসের কয়েকটী উপায় আছে। সেই উপায়ের কথাই এখন বলিব।

(ক) অভ্যাস, (খ) বৈরাগ্য এবং (গ) শ্রবণ মননাদির অনুশীলনই আত্মতত্ত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। "সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম"—এইরূপ অভ্যাস রাখিতে হয়। "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ—অভ্যাসঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, ১।১৩)। ইন্দ্রিয় বিলয়ের যত্নের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা করা আবশ্যক। অভ্যাস দ্বারা সংস্কার জন্মে। যে বিষয়ে অনুদিন ভাবনার অভ্যাস রাখা যায়, পরিশেষে সেই অভ্যাস পরিপক্ব হইলে, তদ্রূপ চিন্তা প্রবাহের একটা সংস্কার জন্মে। একই বিষয়ে প্রত্যহ নিয়মিত চিন্তা করিতে করিতে, শেষে ঐ চিন্তা বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি হইতে থাকে। ব্রহ্মচিন্তাকে সংস্কারগত করিয়া লওয়াই অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা। চিন্তা স্নায়বিক ক্রিয়া মাত্র। সেই চিন্তা যদি নানাবিষয়িনী না হইয়া, একমাত্র বস্তুতে নিত্যনিয়োজিত হয়, তাহা হইলে, সেই স্নায়বিক ক্রিয়ারও একই দিকে গতি জন্মে। সুতরাং এই অভ্যাস পরিপক্ব হইলে ঐ স্নায়বিক গতি সংস্কার প্রাপ্ত হওয়াতে, বিনা আয়াসে, ঐরূপ এক বস্তু চিন্তনে স্বতঃই নিযুক্ত থাকে। তখন সে চিন্তায় আর বাহ্যিক বাধা পায় না। অতএব, যাহাতে নিত্য এক বিষয়ে একরূপ চিন্তা নিয়োজিত করা যায়, তজ্জন্য অভ্যাসের আবশ্যকতা। এইজন্য অভ্যাস, ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনের একটী প্রধান উপায়।

ঐই জন্যই গীতা বলিয়াছেন—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।"॥

অতএব সেই একত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ত ভাবনা করিতে হয়। প্রত্যেক ভূতে আত্মা আছেন, সে আত্মা একই, জড় ও চেতন সমস্তই সেই আত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত,—এই তত্ত্ব অভ্যাস করিতে হয়। সমুদয় পার্থিব বিষয়ের প্রতি বিরাগবান্ বা বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাহাতে "শয়নে, স্বপনে, জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, সেই একমাত্র তত্ত্ব-চিন্তা তোমায় সর্ব্বদা পরিচালিত করিতে পারে, তদ্রূপ যত্ন করিবে।

"He who knows himself in everything and everything in himself will not injure himself by himself. He feels himself as everything. So he will not desire anything, for he has whatever can be had. He lives in the world, is surrounded by illusions, but not deceived by them. You are your neighbour, and mere illusion makes you beleive that your neighbour is something different from yourself."

শ্রুতি বলেন—

"যস্মিন সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবা ভূৎ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্ব মনুপশ্চতঃ"।

এইরূপে আত্ম-সম্প্রসারণ শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপ অভ্যাসেই, পর আপন হয়। এইরূপ একবিষয়ে চিন্তা দ্বারা সংস্কার জন্মিয়া গেলে, সেই সংস্কার দ্বারা আমাদের স্বভাব সংগঠিত হয়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এই গুলি ঐ তত্ত্বাভ্যাসের প্রকৃষ্ট উপায়। "আত্মা বা আর দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতস্থ আত্মার অবধারণরূপ মানসিক ব্যাপারকে শ্রবণ বলে। সেই এক মাত্র ব্রহ্মই চরাচর ব্যাপ্ত এবং সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম ও জড়াদি নিখিল পদার্থ একই—এইরূপ বোধই মনন। ব্রহ্ম ও জীব একই, কেবল মায়া বা প্রবৃত্তি বশতঃ জীব সুখদুঃখাদি ভোগ করে মাত্র।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১)।

নিদিধ্যাসন—ধ্যানের স্থৈর্য্যের জন্য পুনঃ পুনঃ চিন্তা। মন যখন বিষয় সমুদ্রে অবগাহন করিতে যায়, তখন তাহাকে তাহা হইতে বল দ্বারা টানিয়া লইয়া, আত্মায় স্থিরতর রাখার নাম নিদিধ্যাসন। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বাভ্যাস করিতে হয়।

আগামীবারে আমরা চিত্তশুদ্ধির তৃতীয় সাধনের কথা বলিব। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বল ও ব্যায়াম।

জগতে বাঙ্গালী জাতি ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া পরিচিত। এই বিশেষণদ্বয় যেন "বাঙ্গালী" এই শব্দটীর অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। যেন আর পৃথকরূপে উহার উল্লেখের প্রয়োজনও হয় না; "বাঙ্গালী" এই শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার প্রতীতি জন্মে। আবার আমরাও সর্ব্বসমক্ষে পদে পদে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছি; এজন্য প্রায় সকল জাতিই আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, বিশেষতঃ যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ, সেই ইংরেজ জাতি আমাদিগকে এই দুর্ব্বলতার জন্য অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আমাদের ভীরুতার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একদা কোন সাহেবের একটী বানর গঙ্গার ধারে কোন একটী বাটীতে প্রবেশ করে। সেই সাহেব ঐ বাটীতে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক বাটীর অধিস্বামীকে প্রহার করিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য বা অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ (?) সেই বাটির বহির্ভাগে বহুতর লোক সমবেত হয়। সাহেব এই জনতা দেখিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া, সিংহ বিক্রমে গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইল; আর সেই সমবেত লোক সমূহ তখন ভীরু ফেরুপালের ন্যায় চতুর্দ্দিক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—কে কাহার গায়ে পড়ে। একটী মাত্র সাহেবের ভয়ে শত শত বাঙ্গালী চতুর্দ্দিকে প্রাণ ভয়ে পলায়নপর, ইহা অপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণা এবং কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়; এই ব্যাপারে কেবল দুর্ব্বলতাই যে বাঙ্গালীর ভীরুতার একমাত্র কারণ, তাহা নহে; ইহার অভ্যন্তরে আর একটী গূঢ় কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই কারণটী ভীরু, দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে অধিকতর ভীরু করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রান্ত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালীগণ মনে করে, একটী মাত্র ইংরেজ শরীরে যে কেবল তাহার শারীরিক বল রহিয়াছে, তাহা নহে, ঐ একের ভিতরে প্রবল রাজশক্তি বিদ্যমান, তজ্জন্যই তাহারা একটী ইংরেজকে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী দেখে, আর তাহাতেই এত ভীত হয়। যাহা হউক বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক দুরপনেয় হইলেও অনপনেয় নহে। তাহারা যত্ন চেষ্টায় শারীরিক বলের উন্নতি বিধান করিতে পারে, এবং বল ক্ষীণতা জন্য যে ভীরুতা, তাহারও কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে পারে।

দুর্ব্বলতার দোষ।

কোন একটী বিষয়ে আসক্ত থাকিলে, তাহাতে এমনই মমতা জন্মে যে, বিশেষ দোষ

দৃষ্ট না হইলে, তাহা পরিহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, তজ্জন্যই আমরা দুর্ব্বলতার শত শত দোষের মধ্যে কয়েকটী গুরুতর দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে দশ জনের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া জীবন ধারণ করা বড়ই বিড়ম্বনা। যখনই শারীরিক বলের পরীক্ষা হইতে থাকে, তখনই দুর্ব্বল ব্যক্তি—পাছে তাহার গাত্রে আঘাত লাগে—পাছে সে বেদনা পায়, এই-জন্য সশঙ্কভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে এক পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। বস্তুতঃও দুর্ব্বল ব্যক্তি একটু সামান্য আঘাতেই কাতর হইয়া পড়ে; তাহার শরীর আঘাত সহিতে অপটু; তাহার এ ভীত ও সঙ্কুচিতভাব অকারণ নহে। আর বলবান ব্যক্তি—তাহার শরীর দৃঢ়, সে দু চারি আঘাতে ক্লিষ্ট হয় না—সে জানে তাহার শরীর ঐ আঘাত সহ্য করিতে পটু। কাজেই সে ব্যক্তি বল পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হইবার নহে। ভীরুতা তাহার নিকট অশ্রদ্ধেয়, সে সাহসিক কার্য্যে সর্ব্বদাই অগ্রগামী।

দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের নিকট পদে পদে অবমাননা ভোগ করিতে হয়। এ ত ব্যক্তিগত কথা, জাতি সম্বন্ধেও এইরূপই দৃষ্ট হয়। দুর্ব্বল জাতি প্রবল জাতির নিকট নিয়ত লাঞ্ছিত ও পদ-দলিত; ইহার চাক্ষুষ প্রমাণের আর আবশ্যকতা নাই। ব্যক্তিগত বলের সমষ্টিতেই জাতিয় বলের সৃষ্টি। যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি দুর্ব্বল, সে জাতির জাতীয় বল কোথা হইতে আসিবে?

দুর্ব্বল ব্যক্তি কোন প্রকার ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। সে সামান্য রোগ-যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে। ব্যাধি তাহাকে অকালে লোকান্তরে প্রেরণ করে, তাহার জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে মধ্য পথে যেন হঠাৎ থামিয়া যায়।

দুর্ব্বল ব্যক্তি সংসারে এক প্রকার অকর্ম্মণ্য। কোন কার্য্যেই তাহার উৎসাহ ও উদ্যম থাকে না, ইহকাল এবং পরকালের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সে চেষ্টা বিরহিত। আত্মোন্নতি, পরিবারবর্গের মঙ্গল সাধন এবং লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি তাবৎ মনুষ্যোচিত ব্যাপারেই সে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট। অলসতা, নিদ্রা বা স্ত্রীজনোচিত বৃথা আমোদে তাহার অমূল্য সময় অতিবাহিত হয়। প্রফুল্লতা এবং শান্তি তাহার চিত্তে স্থান পায় না; তাহার জীবন মরুভূমির ন্যায় অনুৎপাদক, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত।

দুর্ব্বল ব্যক্তি কোন প্রকার বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিবিধানে অসমর্থ। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে দেশে অত্যন্ত দস্যুর উপদ্রব ছিল—প্রায়ই ডাকাইতি হইত। এই দস্যুপদ্রব নিবারণের জন্য গ্রামবাসীদিগকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। প্রায়ই তদ্রূপ বলবানের সহিত বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতে হইত বলিয়া গ্রামবাসিগণকে বলোৎকর্ষের নিমিত্ত সর্ব্বদাই চেষ্টাবান্ থাকিতে হইত, সুতরাং তখনকার লোক আমাদের ন্যায় হীন বীর্য্য ছিলেন না—হীনবীর্য্য ছিলেন না বলিয়াই তাঁহারা আপনাদের জাতি, মান এবং ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহারা দস্যুকে মানুষ বই আর কিছুই ভাবিতেন না; সুতরাং আত্মরক্ষার্থ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া লড়িতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্ত্তমান সময়ে কোন বাড়ীতে দস্যু আপতিত হইলে, তাহাদের প্রতিরোধ করিতে কেহই অগ্রসর হয় না। গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইলেও অন্যান্য গ্রামবাসিগণ যেন ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকে। দস্যুগণ অনায়াসে অকুতোভয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা ভয়ে টু শব্দটী করে না। দেশের শারীরিক

বলবীর্য্যের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। লোকে কথায় বলে "স্বকে গেহে কুক্কুরোপি সিংহায়তে" নিজের ঘরে কুকুরও সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করে; এখন দেখিতেছি "স্বকে গেহে মনুষ্যোপি শৃগালায়তে" নিজের ঘরে মনুষ্যও ভীরু শৃগালের ন্যায় আচরণ করে।

দুর্ব্বলতারূপ মহাব্যাধি কর্ত্তৃক বাঙ্গালী জাতিবিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়াছে, বিচক্ষণ চিকিৎসক কোন রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে "সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং পরিবর্জ্জনং" বলিয়া রোগের নিদান অর্থাৎ কারণ পরিবর্জ্জনের উপদেশ করিয়া থাকেন। আমরাও এই স্থলে দুর্ব্বলতার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, আশা করি, বাঙ্গালী জাতি এই সকল কারণ পরিহারে সচেষ্ট হইবেন।

১ম। পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্যাভাব।—পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই সকল পদার্থ কিরূপ শারীরিক বলবর্দ্ধক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই খাদ্য আপামর, সাধারণ সকলেই ব্যবহার করিত। তাহাতে সকলে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী ছিল। এখন কেবল উহা ধনীরই সেব্য হইয়াছে, সাধারণ লোকের ভাগ্যে উহা কদাচিৎ ঘটে, অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যও দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহাও যুটিয়া উঠে না; সুতরাং উপযুক্ত আহারাভাবই দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

২য়। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সময় পরিবর্ত্তন—আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়া প্রাহ্ণ ও অপরাহ্ণ শারীরিক ও মানসিক শ্রমের উপযুক্ত কাল এবং মধ্যাহ্নই বিশ্রামের প্রকৃত সময়। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে তদনুসারেই আফিস এবং আদালতের কার্য্য চলিত, পাঠশালের অধ্যাপনা হইত এবং শ্রমজীবিগণও তত্তৎকালে পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। এখন তদ্বিপরীত হইয়াছে; লোকে সকালে বিকালে বিশ্রাম করে এবং যখন সূর্য্যোত্তাপে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এইরূপ বিরুদ্ধাচরণে সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

৩য়। আধুনিক শিক্ষা প্রণালী।—বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বাঙ্গালীদিগকে দিন দিন ক্ষীণতেজা ও ক্ষীণবীর্য্য করিয়া তুলিতেছে। সুকোমলমতি শিশুদিগের মস্তিষ্ক যে সকল বিষয় ধারণা করিতে অক্ষম, সেই সকল বিষয়ের গুরুভার তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। উহাতে তাহাদের পরিণাম বিষময় হইয়া উঠিতেছে। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অল্পে অল্পে দাহ্য পদার্থ প্রদান করিলে, সেই অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, কিন্তু তদুপরি একদা রাশি রাশি পদার্থ নিক্ষেপ করিলে, তাহাতে আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বরং সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ শিশুদিগের কোমল মস্তিষ্কের বিকাশ প্রাপ্তির আশায় তাহাদের উপযোগী সামান্য সামান্য জ্ঞানবৃদ্ধিকর বিষয় সকল না দিয়া, এবং জ্ঞানের ক্রম বিকাশের অপেক্ষা না করিয়া যদি গুরুতর জ্ঞানগর্ভ বিষয় সকলের শিক্ষায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়া দূরে থাকু, জ্ঞানের আধার ভূমি মস্তিষ্কটী চিরকালের জন্য বিকৃত হইয়া যায়।

মনও শরীরের নিত্য সম্বন্ধ, মন বিকৃত হইলে শারীর দৌর্ব্বল্য অনিবার্য্য, এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের শারীরিক ও মানসিক বলের কিরূপ প্রতিকুল, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

৪র্থ। শ্রম জনক কার্য্য এবং ব্যায়াম পরিহার—আজ কাল ভদ্র সম্প্রদায় শারীরিক পরিশ্রম জনক কার্য্যকে ইতরের কার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিতেও আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। দরিদ্র বাঙ্গালীর এ একটা বিষম রোগ জন্মিয়াছে। এ রোগের প্রতীকার হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কখনও শারীরিক বল বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে কেন? পান ভোজন দ্বারা যেমন প্রত্যহ দেহ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, তদ্রূপ দেহ দৃঢ়িষ্ট এবং বলিষ্ঠ করিবার নিমিত্ত নিত্য নিয়মিত ব্যায়াম করা আবশ্যক। যে গৃহে বাস করা যায়, তাহা জীর্ণ হইলে কত ক্লেশ ও কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ঝড় বৃষ্টিতে তাহার নিত্য পতন শঙ্কায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। আর যে দেহে অনুক্ষণ বাস করিতেছি। যাহা লইয়া আমার আমিত্ব, সেই দেহ জীর্ণ ও ভগ্ন হইলে, তাহাতে বসতি করা যে কিরূপ নিত্য অসুখকর, তাহা বাঙ্গালী বিশেষ রূপে অবগত থাকিয়াও কেন যে তাহার দেহরূপ গৃহ-সংস্কারে উদাসীন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। এই শ্রম বিমুখতা আমাদের মনুষ্যত্ব নাশের প্রধানতম কারণ হইয়াছে।

৫। স্বাস্থ্যরক্ষায় নিশ্চেষ্টতা—আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান হইলে, যথাসম্ভব আহারে শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ থাকু আর নাই থাক্, তাহাতে উদরপূর্ত্তি হইলেই বাঙ্গালী সন্তুষ্ট। গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইয়া বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে; শ্যামের পুত্রটি জল বায়ুর দোষে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, রামের তাহাতে কি? কিন্তু তাহার পুত্রও যে সেই অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর মধ্যে নিয়ত বাস করিতেছে, সে বিষয়ে তাহার চৈতন্য নাই, পীড়িত হইলে, তখন ছুটাছুটী করিবে—চিকিৎসার জন্য অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিবে—আর মরিয়া গেলে শোকে পাগল হইয়া অশ্রু-প্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করিবে, তথাপি পূর্ব্ব সাবধানতা গ্রহণ করিবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই এক বিষম ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। দশজনে ঐক্য হইয়া যে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যত্ন করিবে, তাহা তাহাদের কোষ্ঠীতে লেখে না। বাঙ্গালী ভাবে তাহার নিজের অনিষ্ট না হইলেই হইল। তাহার দৃষ্টি নিজটুকু লইয়া, সে এতই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি। এইরূপ স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন বলিয়াই, বাঙ্গালী একটী দুর্ব্বল জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এবং অকাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।

"একোত্তর মৃত্যুশতং অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে
একস্ত কালকৃত স্বপরে আগন্তবঃ স্মৃতাঃ।"

অথর্ব্ববেদে একশত এক প্রকার মৃত্যু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একশত প্রকারই আগন্তু মৃত্যু বা অপঘাত মৃত্যু অথবা অকাল মৃত্যু, আর একটী মাত্র কালমৃত্যু। এই একশত প্রকার অকাল মৃত্যু নিশ্চেষ্ট বাঙ্গালীদিগকে প্রতিনিয়ত বল পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অপসারিত করিতেছে, বঙ্গের প্রতিগৃহ এই একশত অকাল মৃত্যুর ক্রীড়া-

ভূমি। সদ্যোজাত শিশু হইতে বালক, যুবক এবং প্রৌঢ় পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের হস্ত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। উহাদের অব্যর্থ আক্রমণে—তাহারা নিরন্তর পিতামাতা এবং স্বজনবর্গের বক্ষে দারুণ বেগে আঘাত করিয়া স্বীয় পার্থিব কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ঘোরতর অনিচ্ছায় ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। যদি বুঝিতাম, সংসারে আসা যাওয়া ব্যতীত মানবের অন্য কার্য্য নাই—যদি বুঝিতাম, পশু বৃত্তির পরিচালনাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের ইহ পরকালের আর কোন কর্ত্তব্যই নাই; তাহা হইলে কোন ক্ষোভেরই কারণ ছিল না। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান মানব ইহ পরকালের বহুতর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে, যদি সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা কষ্টকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এই সকল অকাল মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম না করিতে পারিলে, মানব স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সকল পালন করিয়া যাইতে কখনই সমর্থ হয় না। এই অকাল মৃত্যু কর্ত্তৃক মহামারী ব্যাপার স্মরণ করিলে, দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, হৃদপিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে; যাঁহারা অযত্নে অকালে কালের করাল কবলে আত্মসমর্পণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। যে নিদ্রিত ব্যক্তি দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল কর্ত্তৃক এখনই আক্রান্ত হইয়া হত হইবে, যদি তাহাকে জাগ্রত করিয়া তাহার ভীষণ পরিণাম স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে সে যেমন আত্ম রক্ষার জন্য পলায়নপর হয়; তদ্রূপ যে ব্যক্তি অসাবধানতা বশতঃ অকাল মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, ঐ অকালমৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিতে কখনই ত্রুটী করিবে না। কিন্তু পূর্ব্ব সাবধানতা গ্রহণ করিলে এ মৃত্যু কখনও তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। মৃত্যুকে আক্রমণের সুযোগ দান করিয়া, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা অপেক্ষা আক্রমণের সুযোগ দান না করাই শ্রেষ্ঠতর কার্য্য। বাঙ্গালী জাতি এক দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই সকল প্রকার চেষ্টা এবং উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, দৈব দুরতিক্রমণীয়। এই বিশ্বাসই তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় এবং সর্ব্বনাশের একমাত্র হেতু। বাঙ্গালী স্রোতোবাহী জড়কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় দৈব বা অদৃষ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, সে আত্ম-স্বাধীনতা এবং আত্ম-ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে দৈবায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের উপদেষ্টা পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুরুষকার অবলম্বন দ্বারা দৈবের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিতে বলিয়াছেন।

"দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥"—চরক।

দুর্ব্বল দৈব পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং প্রবল দৈব সাধারণ কর্ম্ম বিনষ্ট করে। অতএব সবল দৈব নাশের জন্য অতি প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এত শাস্ত্রীয় উপদেশ, এই উপদেশানুসারে দৈব নাশের জন্য দৃঢ় উদ্যোগ করিলে, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনের অকালমৃত্যু বহু পরিমাণে রোধ করা যাইতে পারে।

তজ্জন্যই বলিতেছি; নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া জড় পদার্থের ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন না হইয়া, সজীব সচেষ্ট মনুষ্যের ন্যায় আত্ম-রক্ষায় আত্মীয় রক্ষায়, তৎপর হইলে, অবশ্যই তাহাতে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যে হওয়া যায় এবং ঐ শত মৃত্যুর ভীষণ অত্যাচার হইতে সংসারকে রক্ষা করা যায়, আর এই নিদারুণ শোকাবহ দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া শোকে তাপে নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে হয় না। এই অকালমৃত্যু আমাদের সমক্ষে নিয়ত উপস্থিত হইতেছে বলিয়া আমরা উহার ভীষণতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। এই অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর শোচনীয় ব্যাপার আমরা স্বাভাবিক বোধে অনায়াসেই সহ্য করিতেছি। শুনিয়াছি রামরাজ্যে একটী ব্রাহ্মণকুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণ সেই অসাময়িক মৃত্যুর প্রতি-বিধানার্থ মহারাজা রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তৎপ্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু দৈব অনিবার্য্য বোধে তৎ-প্রতিবিধানে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি।

পাশ্চাত্য সভ্যজাতি কেমন সবল, সুস্থ শরীর এবং দীর্ঘজীবী। আমরা কোন অপ-রাধে রুগ্ন দেহে, ভগ্ন শরীরে,অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমাদের নিশ্চে-ষ্টতাই কি ইহার অন্যতম কারণ নহে? এই নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্ন করিলে আমারাও ঐ সকল জাতির ন্যায় নির্ব্যাধি হইয়া, ইহকাল পরকালের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সুখে কাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গুপ্ত-ব্যাধি।

৬ষ্ঠ। একটী ভয়ঙ্কর গুপ্ত ব্যাধি বঙ্গীয় বালক-দের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মহদনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই ব্যাধি বালক দিগকে যে ভাবে আক্রমণ করিতেছে, তাহাতে বঙ্গের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিলেও হৃৎ-কম্প উপস্থিত হয়। কিরূপে এই ব্যাধির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়, তাহাই এক্ষণে বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে, কিন্তু দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ বিষয়টী একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। অপরিণামদর্শী, কোমল প্রাণ বালক-গণ অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া আপনাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। অপরিণত শরীরে এ ভীষণ অত্যাচার এক প্রকার আত্মহত্যার চেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদা আমাদের দেশের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি অক্‌সফোর্ড মিশনের সুবিজ্ঞ মিঃ হোয়াইট্‌হেড্ সাহে-বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দুচারি কথায় পরেই বালকদিগের এই সর্ব্বনাশের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের রক্ষার উপায়াবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা দেখিতেছি, বৈদে-শিক মহোদয়গণও বঙ্গের বালকদিগের এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। পূর্ব্ব-কালে আমাদের দেশে বিদ্যার্থীদিগকে পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া গুরু-গৃহে অবস্থান করিতে হইত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়নকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্যাবলম্বন করিয়া কেবল জ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিলে মানবজীবন ও মানবদেহ গঠিত ও দৃঢ় হয়। পাপের পূতিগন্ধ তাহাতে প্রবেশ

করিয়া বিকৃত ও কলুষিত করিতে পারে না। অধুনা ছাত্রদিগকে সেই কঠোর শাসনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করা হইয়াছে। তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের ক্রটী করিতেছে না। চতুর্দ্দিকে প্রবল প্রলোভন, কুসংসর্গের আপাত মধুর আকর্ষণ এবং অসাময়িক স্বাধীনতায় আত্ম-সংযমে অক্ষম হইয়া কুপথে পদার্পণ করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে বালক সমপাঠীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় উৎকৃষ্ট ছিল, সেই বালকের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছে, ও স্মরণ শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার উৎসাহ ও উদ্যম সকলই যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে, আমরা অনেক বালককে পরিণামে এজন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে দেখিয়াছি। এমন কি অনেক বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া তাহার দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছে।

ভবিষ্যৎ বংশকে মানুষ করিতে হইলে, তাহাদিগকে বলবীর্য্যশালী করিতে হইলে, প্রত্যেক অভিভাবকের নিজ নিজ সন্তানের আচার ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রভাবশালী অভিভাবকের শাসনে থাকিলে বালকগণের চরিত্র স্খলিত হইতে পারে না এবং তাহাদের সুপ্রবৃত্তি সকলও স্ফূরিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্তই প্রাচীনকালে পাঠার্থীদিগকে গুরুগৃহেও গুরুশাসনে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত। তাহাতে তাহারা বাল্যকালের যেরূপ পবিত্র চরিত্র লইয়া গুরুগৃহে প্রবেশ করিত, পাঠ সমাপনান্তেও সেই পবিত্র ও অক্ষত চরিত্র লইয়া, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ হইত। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করিতে হয়; তন্মধ্যে শুক্র ধারণই প্রধান। কেহ কেহ কেবল এই শুক্র ধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অত্যন্ত কঠোর ব্রত হইলেও শিশুকাল হইতে এ ব্রতে অভ্যস্ত হইলে, ইহার তাদৃশ কঠোরতা অনুভূত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত বা স্খলিত না হয়, অটল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়; চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়; রাগ দ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়, কামক্রোধাদিও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থ শুক্র ধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য বিকৃত চিত্তে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করা বিধেয়। তাহাদের সহিত ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাহাদের রূপ লাবণ্য মনেও আনা বিধেয় নহে। এইরূপে শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সিদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"স্ত্রী দর্শনাদিভিঃ শুক্রং কদাচিৎ চলিতং স্রবেৎ।
গ্রাম্যধর্ম্মকৃতান্ দোষান্ সোঽ সংসর্গেঽথবাপ্নুয়াৎ।"

কেবল স্ত্রী সংযোগেই শুক্র ক্ষয় হয় না, তাহার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও মননাদিদ্বারাও শুক্র বিচলিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ছাত্রাবস্থায় যাহাতে এই সকল দোষের সংঘটন না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক।

আমরা সেই সুপ্রাচীন কালের পক্ষপাতী ব্রহ্মচর্য্যের এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ছাত্রগণ এই ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। এই প্রথার প্রবর্ত্তন ব্যক্তি-

য়েকে ছাত্রদিগের দেহ, বল ও চরিত্র রক্ষার উপায়ান্তর দৃষ্ট হইতেছে না। যদিও কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অধীনে ছাত্রাবাসে (বোর্ডিঙ্গে) বালকগণ রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাহাতে সমস্ত ছাত্র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতে পারে, এ জন্য গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রচুর আয়োজন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়া ভাবী মঙ্গলের পথ পরিমুক্ত হইবে এবং ভবিষ্যৎ বংশ শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে।

আমরা বলক্ষয়ের কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণ বলের লক্ষণ ও তাহার কার্য্য নিরূপণ করা যাইতেছে।

"রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতুনাং যৎপরং তেজস্তৎ-খল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে"।

রসাদি শুক্রান্ত সপ্তধাতুর যে তেজ, তাহাকে ওজঃ বলে। উহাই বল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"তত্র বলেন স্থিরোপচিত মাংসতা সর্ব্বচেষ্টাস্বপ্রতিঘাতঃ স্বরবর্ণপ্রসাদো বাহ্যানামাভ্যন্তরানাঞ্চ করণানামাত্মকার্য্য প্রতিপত্তির্ভবতি"।

বলের দ্বারা মাংসের দৃঢ়তা ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সকল কার্য্যে দৃঢ় উদ্যোগ, স্বর এবং বর্ণের প্রসন্নতা, বাহ্য এবং আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় সকলের স্বীয় কার্য্যে পটুতা জন্মে।

"তদভাবাচ্চশীর্য্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাং। অভিঘাতাৎ ক্ষয়াৎ কোপাচ্ছোকাদ্ধ্যানাৎ শ্রমাৎ ক্ষুধঃ।

বলের অভাবে মনুষ্যদিগের শরীর শীর্ণ হয়। অভিঘাত (দন্তাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি) শুক্রাদি ধাতুর ক্ষয়, ক্রোধ, শোক, দুশ্চিন্তা, শ্রম ও ক্ষুধা বলক্ষয়ের কারণ। এই সকল কারণ পরিহার করিতে পারিলে শারীরিক বল স্থির থাকিতে পারে।

"বলবৃদ্ধিকর ভাব"।—মহাত্মা অগ্নিবেশ ঋষি বলিয়াছেন—"বলবৃদ্ধি করাস্তিমে ভাবা ভবান্তদ্ যথা বলবৎ পুরুষেদেশে জন্মকালাৎ বলবৎ পুরুষেচ-কালে সুখ শ্চকাল যোগোবীজক্ষেত্রগুণ সম্পচ্চাহার সম্পচ্চ শরীর সম্পচ্চ সাত্ম্যসম্পচ্চ সত্ত্ব সম্পচ্চ স্বভাবসংসিদ্ধিশ্চ যৌবনঞ্চ কর্ম্মচেষ্টং হর্ষশ্চেতি"।

(১) "বলবৎ পুরুষে দেশে জন্ম"।—দেশের প্রকৃতি তদ্দেশবাসীদিগকে দুর্ব্বল বা সবল করিয়া গঠিত করে। পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশবাসীগণ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশবাসীগণের তুলনায় অত্যন্ত বলশালী। ঐ সকল দেশের প্রকৃতি তদ্দেশবাসীদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছে, তাই তাহারা বলবীর্য্যশালী। আর বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যা দেশের প্রকৃতি এতদ্দেশবাসীদিগকে নিগ্রহ করিয়াছে, তাই তাহারা বলবীর্য্যহীন। আমরা দেখিতে পাই, যে সকল বাঙ্গালী ঐ সকল দেশে গিয়া পুরুষানুক্রমে বসতি করিতেছেন, তাহারাও বলবীর্য্যে তদ্দেশবাসীদিগের সমকক্ষ হইতেছেন। আমাদের দেশের প্রকৃতি বলবৃদ্ধির অন্তরায় হইলেও যত্ন ও চেষ্টায় মানুষ নিজ বলের অনেকটা উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। যে ক্ষেত্রে সতেজ বৃক্ষ জন্মায় না, চাষীগণ উপযুক্ত সার প্রদান করিয়া সেই ক্ষেত্র হইতে সতেজ বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে।

"বলবৎ পুরুষেচকালে জন্ম"।—যে কালে বলবান পুরুষ সকল জন্মে, সেই কালে জন্ম গ্রহণই বলশালিত্বের একটী প্রধান কারণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাহারা সত্যাদি যুগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, পৃথিবী যতই পুরাতন হইতেছে, তাহার অধিবাসীগণ ততই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষীণবল হইতেছে। কোন স্থানে মানবগণ নূতন বসতি করিতে থাকিলে,

তাহারা সেই নূতন স্থানের স্বাভাবিক গুণ বশতঃ বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠে। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অচিরে সেই স্থানকে জনাকীর্ণ করিয়া ফেলে। যতই সেই গ্রামটীর প্রাচীন অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকে, ততই তাহাদের ভাবী বংশ বলবীর্য্য-হীন হইয়া উঠে ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কত কত প্রাচীন জনপদ এইরূপে বলবীর্য্য-হীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এখনও যে সকল অতি পুরাতন গ্রাম রহিয়াছে, তাহার অধিবাসীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাদের বলবীর্য্য-হীনতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থার ফলে তাহার অধিবাসীগণ যে ক্ষীণবল ও ক্ষীণায়ু হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু মনুষ্য যত্ন চেষ্টায় স্বীয় বাসভূমির সংস্কার করিয়া তাহা স্বাস্থ্য-জনক করিয়া লইতে পারে, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

"সুখশ্চ কাল যোগঃ।"—সুখানুবন্ধ কালের যোগ, বলের অন্যতম কারণ, অর্থাৎ সুখকর কালে শরীরে বলাগম হয়। শীত ঋতুতে তরুলতাদির পত্র সকল ভূপতিত হয়, আর তাহাদের সতেজ ভাব থাকে না, তদ্রূপ ঐ ঋতুতে মানবগণ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। যাহারা দুর্ব্বল দেহ, তাহারা বলহীনতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, অধিকাংশ বৃদ্ধই এই ঋতুতে পরলোকগত হয়। শীতাবসানে তাহাদের আর কোন ভয় থাকে না, তৎকালে বলহীনতাই তাহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। বসন্তাগমে তরুলতাগণ যেমন নব পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হইয়া সতেজভাব ধারণ করে, তদ্রূপ জীর্ণ রোগীগণও বসন্তাগমে বলসঞ্চার হওয়ায়, নূতন স্বাস্থ্য লাভ করিতে থাকে। "রাম এবার শীত কাটাইয়াছে, তাহার আর কোন ভয় নাই" এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, জীর্ণশরীর রোগীগণও শীত প্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং ব্যাধির প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। যে রোগী সৌভাগ্যক্রমে শীতকাল অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, শীতান্তে সুখানুবন্ধ কালের যোগ হওয়ায়, তাহার নব বলের সঞ্চার হয় ও সে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে।

"বীজক্ষেত্র গুণ সম্পৎ।"—অর্থাৎ শুক্র-শোণিতের সদ্‌গুণ। যদি শুক্র ও শোণিত নির্দ্দোষ হয়, কোন প্রকার ব্যাধির দ্বারা দুষ্ট না হয় এবং পরিপক্কাবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই শুক্র-শোণিত হইতে যে সন্তানের উৎপত্তি হইবে, সে সন্তান অবশ্য বলশালী হইবে।

"আহার সমচ্চ"।—আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করি, তৎসমুদায় বলবৃদ্ধিকর হওয়া আবশ্যক। আহারের উদ্দেশ্য শরীর ও বল রক্ষা। যে সকল আহার দ্বারা শরীরের অনিষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বথা পরিহার করা বিধেয়। আমরা বাঙ্গালীজাতি আহার সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ও উদাসীন। মুখপ্রিয় অসার বস্তু দ্বারা আকণ্ঠ উদর পূর্ত্তি করিতে আমাদের ক্রটী হয় না। আহারকালে দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া আমরা দেখি না; সুতরাং আহারীয় দ্রব্যের সদ্‌গুণ প্রাপ্তি বিষয়ে বঞ্চিত থাকি।

"শরীর সম্পচ্চ"।—শরীর গুণের সাদ্‌গুণ্য বলশালীত্বের একটী প্রধান কারণ। পিতামাতার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট হইলে পুত্রের শরীরও হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট হয়। বলবৎ পুরুষ হইতে বলবান সন্তান জন্মিয়া

থাকে। কদাচিৎ ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। সুক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে তাহাতে সুবৃক্ষেরই আশা করা যাইতে পারে, দুর্ভাগ্য বশতঃ বঙ্গবাসীগণ বলবীর্য্যহীন, সুতরাং তাহাদের সন্তানগণও বলবীর্য্যহীন।

"সাত্ম্য সম্পচ্চ"।—যাহা আপাতত কষ্টদায়ক হইলেও পরিণামে সুখ আনয়ন করে, তাহাকে সাত্ম্যবলে। অনেকেই এই আপাত সুখকর ব্যাপারে মুহ্যমান হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পরিণাম চিন্তা করিতে অবসর প্রাপ্ত হয় না। এরূপ ব্যবহার শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। আশু সুখের জন্য মুহ্যমান না হইয়া, পরিণাম সুখের জন্য চেষ্টা করিলে শরীর ও মনের স্বাস্থ্যোৎপত্তি হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন্ বিষয় সাত্ম্য, এবং কোন বিষয় অসাত্ম্য, ইহা বিবেচনা করিয়া বলা উচিত। তাহা হইলে বলক্ষীণতার কারণ উপস্থিত হয় না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি আপাতত সুখের জন্য লালায়িত হইয়া পরিণামে অশেষ যাতনাগ্রস্ত হয়, আর যাঁহারা পরিণাম চিন্তা করিয়া ইন্দ্রিয়ের শাসন অতিক্রম করিতে সক্ষম, তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুস্থদেহে ও সুস্থ মনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হন।

"সত্ত্ব সম্পচ্চ"।—যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী অর্থাৎ ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মানসিক পবিত্রতার সহিত দৈহিক পবিত্রতা জন্মে, তজ্জন্য তাঁহাদেব শরীরে তেজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার বলের সঞ্চার হয়। অধর্ম্মবশে লোকের মন মলিন হইয়া থাকে, সেই জন্য মানসিক তেজ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎসঙ্গে শারীরিক বলেরও অভাব হয়।

"যৌবনঞ্চ"।—বাল্য এবং বার্দ্ধক্য অপেক্ষা যৌবনে বলাধিক্য হয়, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার।

"সংহর্ষশ্চ"।—চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে বলের সঞ্চার হয়। যাহার মন অর্থচিন্তায় এবং অন্নচিন্তায় নিয়ত ক্লিষ্ট, তাহার চিত্তেরও অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। সুতরাং তদ্রূপ দুশ্চিন্তা বললাভের প্রধান অন্তরায়। বলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

"কর্ম্মচ"।—"শরীরায়াস জনন কর্ম্ম ব্যায়াম সংজ্ঞিতং।"—বাগ্‌ভট।

কর্ম্মশব্দে শরীরায়াস জনন কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। তাহাই ব্যায়াম। যথোপযুক্ত ব্যায়াম সবল শরীরে বলবৃদ্ধি করে। এবং দুর্ব্বল শরীরেও বল আনয়ন করে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত ভাবগুলিকে বলবৃদ্ধিকর ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবের অধীন হইয়া চলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। আত্মহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই তদনুসারে চলা উচিত। এই শাস্ত্রে ব্যায়াম বিষয়ক উপদেশ বিশেষরূপে প্রদান করা হইয়াছে। এখন তাহাই লিখিত হইতেছে।

ব্যায়াম।

শরীরায়াস জনন কর্ম্ম ব্যায়াম সংজ্ঞিতং।—সুশ্রুত।
শরীর চেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থাবলবর্দ্ধিনী।
দেহ ব্যায়াম সংখ্যাতা মাত্রয়াতাং সমাচরেৎ॥—চরক।

যে কর্ম্মে শরীরের শ্রান্তি জন্মে, তাহাকে ব্যায়াম বলে। ইহা শারীর চেষ্টা বিশেষ; নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে, শরীর দৃঢ় হয় ও বল বৃদ্ধি পায়।

শরীরোপচয়ঃ কান্তির্গাত্রাণাং সুবিভক্ততা।
দী প্তাগ্নিত্বমনালস্যং স্থিরত্বং লাঘবং মৃজা।
শ্রমক্লম পিপাসোষ্ণ শীতাদীনাং সহিষ্ণুতা।
আরোগ্যং চাপি পরমং ব্যায়ামাদুপজায়তে।

নিয়মিত ব্যায়ামকারী ব্যক্তির শরীর লঘু হয়। যে কখনও ব্যায়াম করে না, তাহার

শরীর সর্ব্বদাই ভার ভার থাকে, জড়ভাব তাহার দেহকে পরিত্যাগ করে না। ব্যায়ামে শরীরের পুষ্টি হয়, এ পুষ্টি মেদ জন্য নহে, মাংসের দৃঢ়তার সহিত পুষ্টি হয়। ব্যায়ামে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুবিভক্ত হওয়ায় সুদৃশ্য হয়। ব্যায়ামকারী ব্যক্তির জঠরাগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাহার অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগ জন্মে না। তাহার শরীর স্থিরত্ব ধর্ম্মযুক্ত হয় অর্থাৎ যৌবনকালের বল, উৎসাহ এবং উদ্যম দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থির থাকে। তাহার যথাকালে মল মূত্রাদির বেগ প্রবর্ত্তন দ্বারা দেহশুদ্ধি জন্মে। দৈহিক শ্রান্তিঃ মনের অবসাদ, পিপাসা এবং গ্রীষ্ম শীতাদির সহিষ্ণুতা জন্মে এবং পরম স্বাস্থ্যলাভ হয়।

"ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎস্থৌল্যাপকর্ষণং।
নচব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যা মর্দ্দয়ন্ত্যরয়ো ভয়াৎ।
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি"।

ব্যায়ামের ন্যায় শরীরের স্থূলতানাশক আর কিছুই নাই। যাহাদের শরীর দিন দিন স্থূল হইতেছে, তাহাদের স্থৌল্যনাশের জন্য ব্যায়ামই মহৌষধ। ব্যায়ামকারী ব্যক্তিকে শত্রুগণও পীড়ন করিতে সাহসী হয় না। জরাও তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

ব্যায়ামক্ষুণ্ণ গাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্য চ।
ব্যাধয়োনোপসর্পন্তি সিংহং ক্ষুদ্র মৃগা ইব॥

ব্যায়ামকারী ব্যক্তির ব্যায়ামের পর, ক্লিষ্ট দেহ যদি পদদ্বয় দ্বারা মর্দ্দন করা যায়, তবে ক্ষুদ্র মৃগ যেমন সিংহের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ ব্যাধি সকলও তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।

বয়োরূপ গুণৈর্হীনমপি কুর্য্যাৎ সুদর্শনং।

যাহাকে দীর্ঘজীবী বলিয়া মনে হয় না, এবং যে রূপগুণ বিহীন, ব্যায়াম তাহাকে দীর্ঘজীবী গুণশালী এবং সুশ্রী করিয়া তুলে।

ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপিভোজনং।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষংবা পরিপচ্যতে।

যে ব্যক্তি নিত্য ব্যায়াম করে, তাহার জঠরাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার বিরুদ্ধ আহার জীর্ণ হয় এবং অপক্ক বা অর্দ্ধপক্ক দ্রব্যও নির্দ্দোষ ভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

শস্যতে প্রিষপি সদা ব্যায়ামো দোষনাশনঃ।
ভুক্ত্বা বিরুদ্ধমপ্যন্নং ব্যায়ামান্ন প্রকুপ্যতি॥
ব্যায়ামোহি সদাপথ্যং বলিনাং স্নিগ্ধ ভোজিনাং।
সচ শীতে বসন্তেচ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

বলবান এবং ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য ভোজনকারী ব্যক্তিদের প্রত্যহ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। বিশেষত শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

বয়োবল শরীরাণি দেশকালাশনানিচ।
সমীক্ষ্যকুর্য্যাৎ ব্যায়ামমন্যথা রোগমাপ্নুয়াৎ॥

বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল এবং আহারীয় দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করিবে, নচেৎ রোগগ্রস্ত হইতে হইবে।

শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থায় ব্যায়াম করা বিধেয় নহে, কারণ শিশু ও বৃদ্ধের শরীর ব্যায়াম সহ্য করিতে অক্ষম। ক্ষীণ দেহে অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়াদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অনুপযুক্ত স্থানে ব্যায়াম করিলে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, অনুপযুক্ত কালেও ব্যায়াম করা বিধেয় নহে। ব্যায়াম করিতে হইলে পুষ্টিকর আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ক্ষয়তৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দ্দি রক্তপিত্ত ভয়ক্লমাঃ।
কাসশোষ জ্বর শ্বাসা অতি ব্যায়াম সম্ভবাঃ॥

অতিরিক্ত ব্যায়ামে ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভয়, ক্লান্তি, কাস, যক্ষ্মা, জ্বর শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে।

রক্তপিত্তী কৃশঃ শোষী শ্বাসকাস ক্ষতাতুরাঃ।
ভুক্তবান স্ত্রীষু চক্ষীণো ভ্রমার্ত্তশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

রক্তপিত্ত রোগগ্রস্ত, অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষত রোগ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি, ভুক্তবান্ এবং স্ত্রীতে ক্ষীণব্যক্তি ও ভ্রমরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যায়াম ত্যাগ করিবে।

শীতকালে বসন্তেচ মন্দমেব ততোঽন্যদা।
তং কৃত্বানুসুখং দেহং মর্দ্দয়েচ্চসমন্ততঃ॥

শীত এবং বসন্ত কালই ব্যায়ামের উপযুক্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়ামানন্তর যাহাতে সুখোৎপত্তি হয়, এরূপ ভাবে দেহের চতুর্দ্দিক মর্দ্দন করিবে।

সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বৈর্হি মর্ত্ত্যৈরাত্মহিতার্থিভিঃ।
শক্ত্যর্দ্ধে নৈব কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতোঽন্যথা॥

আত্মহিতার্থী মনুষ্য সকল ঋতুতে অর্দ্ধ শক্তিতে ব্যায়াম করিবে, অন্যথা উল্লিখিত ব্যাধি সকল দ্বারা আক্রান্ত হইবে।

কুক্ষৌললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রজায়তে
শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াদায়তোচ্ছ্বাস এবচ।

যখন কুক্ষি, ললাট এবং গ্রীবাদেশে ঘর্ম্মোৎপত্তি হয় এবং দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে, তখন শক্তির অর্দ্ধ পরিমাণ ব্যায়াম হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রাকশ্রমাৎ ব্যায়ামবর্জ্জীচ।

ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার শরীরিক পরিশ্রম বিধেয় নহে।

ব্যায়াম হাস্যভাষ্যাধ্ব গ্রাম্যধর্ম্ম প্রজাগরান্
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতি মাত্রয়া।
এতানেবং বিধাংশ্চান্যান্ যোতি মাত্রং নিষেবতে
গজঃ সিংহমিবাকর্ষণ্ সহসা স বিনশ্যতি।

ব্যায়াম, হাস্য, বক্তৃতা (অতিরিক্ত কথন), স্ত্রী-সঙ্গ, রাত্রি জাগরণ এ সকল প্রয়োজনীয় হইলেও অতি মাত্রায় সেবন করা বিহিত নহে। যে ব্যক্তি এই সকল বা এতদ্রূপ অন্য বিষয় অতিমাত্র সেবন করে। গজ যেমন সিংহকে আক্রমণ করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভ্রমণ।

যত্তু চংক্রমণং নাতি দেহ পীড়া করং ভবেৎ।
তদায়ুর্বলমেধাগ্নি প্রদামিন্দ্রিয়বোধনং॥

যে ভ্রমণে দেহ ক্লিষ্ট হয় না, তাহা আয়ু,বল, মেধা ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অধ্বা বর্ণ কফস্থৌল্য সৌকুমার্য্য বিনাশনম্।
অত্যধ্বা বিপরীতোঽস্মাজ্জরা দৌর্ব্বল্য কৃচ্ছসঃ।

নিয়মিত ভ্রমণে কফ, শরীরের স্থূলতা এবং কোমলতা বিনষ্ট হয়। অতিরিক্ত ভ্রমণে ইহার বিপরীত গুণ জন্মে, তাহাতে জরা এবং দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়।

অনারোগ্যমনায়ুষ্যং চক্ষুষোরূপ ঘাতকৃৎ।
পাদাভ্যামনুপানস্ক্যাম্ সদা চংক্রমণং নৃণাং॥

পাদুকা বিহীন পদে সর্ব্বদা ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে, আয়ু ক্ষয় হয়, এবং নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। গ্রামের এক এক স্থানে ব্যায়াম-ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রামের অধিকাংশ যুবক তথায় নিয়মিত সময়ে ব্যায়াম-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইত, কেহ বা কুস্তি শিক্ষা করিত, কেহ বা লাঠী বা তরবারি চালনা অভ্যাস করিত। কোথাও বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া ডুডু বা কাপাটী খেলা করিত। এই সকল খেলা শরীরের বলবৃদ্ধিকর। এই সকল ক্রীড়াদ্বারাই যুবকগণ বলশালী হইত।

এখন এদেশে 'ব্যাটবল,' 'ফুটবল,' নৌকা-চালনা ও অশ্ব-চালনা ইত্যাদি নানা বিদেশীয় ক্রীড়া প্রচলিত হইয়াছে, এই সকল ক্রীড়াও বিশেষ উপকারী। কিন্তু ডন্ কুস্তির ন্যায় কোন ক্রীড়াই শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে। এই দুই খেলায় সমস্ত শরীরের মাংসপেশী বিশেষরূপে পুষ্ট ও দৃঢ় এবং শরীর অত্যন্ত বলশালী হয়।

কিছু দিন হইল, 'টমক্যানন' নামক একটী

বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী ইংরেজ পালোয়ান ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী পালোয়ানদিগকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বীরদর্পে ভারতে আসিয়া এখানকার পালোয়ানদিগকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান করেন। কলিকাতায় গড়ের মাঠে যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, অনেকানেক বীরের সমাগম হইয়াছিল। পাতিয়ালার মহারাজা বিংশতি জন পালোয়ান পাঠাইয়া দেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, দর্শকগণ ঝুকিয়া পড়িল। মল্ল যুদ্ধের নিয়ম এই যে, এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। সে ব্যক্তি পরাস্ত হইলে, অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পাতিয়ালা হইতে যে সকল মল্ল আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষমতায় ন্যূন, তাহার সহিতই প্রথমে কুস্তি আরম্ভ হয়। দিগ্বিজয়ী ইহারই নিকট পরাস্ত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। আমরাও গৃহে বসিয়া জানিতে পারিলাম, ভারতীয় পালোয়ান কেবল টমক্যাননবিজয়ী নহেন, বস্তুতঃ পৃথিবী বিজয়ী। কোন বৈদেশিক পালোয়ান মল্ল যুদ্ধে ভারত হইতে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায় নাই। রীতিমত কুস্তি ও ডন অভ্যাসই ভারতের এই গৌরবের কারণ।

বাঙ্গালার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ডন ও কুস্তি শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, এই ক্ষীণ বাঙ্গালীকে কেহ সহসা অবজ্ঞা করিয়া যাইতে পারে না। আমাদের দেশ যদিও বলবৃদ্ধির অনুকূল নহে, তথাপি রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা শারীরিক বলের উৎকর্ষ বিধান করা যাইতে পারে।

ঢাকার জলগীর সকল অতীব বলবান বলিয়া বিখ্যাত। ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের লাঠীয়ালগণ অত্যন্ত বলশালী ও তেজীয়ান। রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষাই তাহাদের বলশালীত্বের প্রধান কারণ। বঙ্গদেশে শ্রমজীবীগণ ভদ্রসন্তানগণ অপেক্ষা বলবান, পরিশ্রমই তাহাদের বলের হেতু। এদেশীয় ভদ্রসন্তানগণও যদি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করেন, অথবা শ্রমজনক কার্য্য করেন, এবং অপর সাধারণে যদি ব্যায়াম চর্চ্চা করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য জন্য দারুণ কলঙ্ক অপনীত হইতে পারে।

দুর্ব্বল বাঙ্গালী! ব্যায়াম চর্চ্চাই তোমার দৌর্ব্বল্য নাশের একমাত্র মহৌষধ। যদি তোমার মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহে জীবন লাভের ইচ্ছা থাকে, যদি আত্মসম্মান এবং আত্মগৌরব রক্ষার বাসনা কর, যদি সুস্থ দেহীর বিমল সুখ অনুভব করিতে প্রবৃত্তি থাকে, এবং যদি তুমি জাতীয় বললাভের আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তুমি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস কর। ব্যায়ামই তোমার ভীরুতারূপ জাতীয় কলঙ্ক নাশের এক মাত্র উপায়।

বাঙ্গালী! আজ কাল তুমি রেল ও ষ্টীমার যোগে সর্ব্বত্র সস্ত্রীক গমনাগমন করিতেছ, আর পদে পদে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছ, তোমার স্ত্রীকে তোমার চক্ষুর উপরে বে ইজ্জৎ করিয়া যাইতেছে, আর তুমি ছিন্নমুণ্ড অজের ন্যায় ভয়ে চট্‌ফট্‌ করিতেছ, তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পার, এমন সাহস তোমার নাই, তাই বলি, ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা বল সংগ্রহ কর—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য দৃঢ় যত্নবান্ হও। এ বিষয়ে আর কখন ঔদাস্য করিও না।

শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত।

একশৃঙ্গ।

সোমেন্দ্র কাশ্মিরী পণ্ডিত—তাঁহার পিতা ক্ষেমেন্দ্র, একশত সাতটী বৌদ্ধজাতক কবিতার রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধজাতক গুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। আরবী, সিরিয়াক, গ্রীক সকল ভাষাতেই ইহাদের দেখা পাওয়া যায়। বৃহৎ কথা, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের অনেকগুলি আখ্যায়িকা বৌদ্ধ জাতক। ক্ষেমেন্দ্র অতি মিষ্টভাষায় ললিত ছন্দে ১০৭টী রচনা করেন। সোমেন্দ্র তাহাতে আর একটী যোগ করিয়া দিয়া অবদান কল্পলতা নামে সে গুলি প্রচারিত করেন। এ গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে এক প্রকার লোপ হইয়াছিল। শ্রীমান শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বত হইতে একখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন এবং হজসন সাহেব কয়েকটী পল্লবহীন একখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ নেপালে পাইয়াছিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র ও পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে অবদান কল্পলতা মুদ্রিত করিতেছেন। এই অবদান কল্পলতার তিনটী আখ্যায়িকা বাবু শরচ্চন্দ্রের ভ্রাতা বাবু নবীনচন্দ্র ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ইংরাজী পদ্য লিখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। মাইকেল "ক্যাপ্টিব লেডী" লিখিয়া সুখ্যাতি পান নাই। তরুদত্তের শিক্ষা দীক্ষা বিদেশী। নবীন বাবুর বাঙ্গালা পদ্য লিখিবার ক্ষমতা আছে। বাঙ্গালা পদ্যে জাতক তিনটী অনুবাদ করিলে তাঁহার নিজেরও গৌরব বৃদ্ধি হইত, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি সম্পাদিত হইত।

জীন জাতকমালা বুদ্ধদেবের প্রণীত নহে। বুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল আখ্যায়িকা প্রচারিত ছিল। বুদ্ধদেব সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাহায্যে আপনার উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থেও পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আখ্যায়িকাগুলি আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন সম্পত্তি। জীনজাতক রামায়ণে আছে বলিয়া রামায়ণকে বুদ্ধের পরস্তন বা বুদ্ধকে রামায়ণের পরস্তন এরূপ নির্দ্ধারণ করা সমীচীন নহে।

তবে বুদ্ধদেব যেরূপ স্বাভাবিকভাবে আখ্যায়িকাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতে সেরূপ স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জন্য মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়।

রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন। অবদান কল্পলতার একশৃঙ্গ রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ। এই দুইটী আখ্যায়িকার তুলনা করিলে হিন্দুভাব ও বৌদ্ধভাবের পার্থক্য এবং উপাখ্যানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যাইবে।

রামায়ণের আখ্যায়িকা এই কশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ।

> কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ
> ঋষ্যশৃঙ্গ ইতিখ্যাত স্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
> স বনে নিত্য সংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা।
> নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্ত্তনাৎ
> দ্বৈবিধং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ।

ব্রাহ্মণ সন্তানের হরিণের মত শৃঙ্গ কেন হইল, রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই। রাত্রদিন পিতার নিকটে থাকিতেন, ব্রহ্মচর্য্য

অগ্নিসেবা ও পিতৃসেবা ভিন্ন তিনি অন্য কাহারও মুখ কখন দেখেন নাই। অন্য কোন কার্য্য কখন করেন নাই। এই সময়ে অঙ্গ দেশে লোমপাদ নামে এক প্রতাপবান রাজা ছিলেন। অঙ্গদেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য রাজার ইচ্ছা হইল। বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা লোমপাদকে উপদেশ দিলেন যে, বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া তাঁহাকে আপন কন্যা শান্তাকে প্রদান করুন অনাবৃষ্টি নিবারণ হইবে। অনাবৃষ্টি নিবারণের এ অদ্ভুত উপায় রহস্যের বিষয়। আমরা ভাবিয়াছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের মত ব্রহ্মচারীকে দিয়া কোন যজ্ঞ করান হইবে।

ঋষিগণ তপোবন হইতে যজ্ঞ করিবার জন্য রাজধানীতে আসিয়া থাকেন, বেদের সময় হইতে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। লোমপাদ যজ্ঞ করিবেন না, সুতরাং প্রকাশ্যভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিতে তাঁহার সাহস হইল না। বনবাসী ব্রহ্মচারীকে নগরবাসী সংসারী করিতে হইবে। প্রবঞ্চনা প্রতারণার আবশ্যক। তিনি আপন পুরোহিতদিগকে অনুরোধ করিলেন। এমন গর্হিত কার্য্যের অনুরোধে পুরোহিতদের অপমান বোধ হইল না। হইতে পারেও না, তাঁহারাই রাজাকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিভাণ্ডকের ক্রোধকে ভয় আছে। তাঁহারা মস্তক অবনত করিয়া আপনাদের ভয় জ্ঞাপন করিলেন এবং গর্হিত কার্য্যের গর্হিত উপায়—আসামের কুলী ধরিবার উপায় বলিয়া দিলেন।

তেতু রাজ্ঞো বচো শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ
ন গচ্ছেম ঋষির্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপং।
বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি।

এবমঙ্গাধীপেনৈব গণিকাভি ঋষেঃ সুতঃ
আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে।

ঋষিকুমার ব্রহ্মচারী। কখন নারীমুখ দেখেন নাই। রাজা কয়েকটী গণিকা পাঠাইলেন। তাহারা কিছু মিঠাই খাওয়াইয়া ও হাবভাব দেখাইয়া ব্রহ্মচারীকে নগরে লইয়া আসিল। এত সহজে এমন মহাজনের পতন কি করিয়া হইল, ব্যাখ্যা করা হয় নাই। যে এত সহজে পতিত হইতে পারে, তাহার চরিত্রের বল কি? তাহাকে রাজা কি করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিলেন, তাহারও কোন কারণ দেখান হয় নাই। এমন দুর্ব্বল চরিত্র কলুষকলঙ্কিত ব্রহ্মচারী নগরে আসিবা মাত্র সুবৃষ্টি হইল, পর্জ্জন্যদেব কি বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন?

যে কখন অন্য মুখ দেখে নাই, তাহাকে ভুলাইতে অপর জাতীয় কয়েকটী লোক উপস্থিত। এখানে মানসিক পরিবর্ত্তন চিত্র করিবার মহা সুযোগ। একদিন মিরান্দা এমনি অবস্থায় ফার্দিনান্দকে দেখিয়াছিল। সেক্‌সপিয়ারের অমৃততুলিকা সে চিত্র চিত্রিত করিয়াছে। লোক চরিত্র চিত্রনে বাল্মিকীর অসাধারণ ক্ষমতা। অথচ এ সুযোগ বাল্মিকী পরিত্যাগ করিয়াছেন। লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। একজন ব্রহ্মচারী আনাইয়া যজ্ঞ করিলে সে অনাবৃষ্টি নিবারণ হয়, এইরূপ একটী সহজ আখ্যায়িকা লিখিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। যজ্ঞের আবশ্যকতা এবং ঋষির পবিত্রতা প্রমাণিত হইত। এবং এইরূপ পবিত্র চরিত্র বলিয়া দশরথ পুত্রেষ্টী যজ্ঞে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন বুঝা যাইত। মাথায় শিং দিয়া আকৃতি বিভৎস, গণিকায় স্খলিতপদ দেখাইয়া প্রকৃতি বিকৃত, এ ঋষি চরিত্রের চিত্রাঙ্ক-

পের আবশ্যকতা বুঝা যায় না। বাল্মিকী যাহা লিখিয়াছেন,এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃ স্বাধ্যায় সংযুতঃ
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং (উপায়ো ?) বিষয়ানাং সুখস্য চ।
ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নর চিত্তপ্রমাথিভিঃ
পুরমানাযয়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রঞ্চাধ্যবসীয়তাম্।
গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈ রানেষ্যন্তীহ সৎকৃতাঃ।
বারমুখাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ
আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন যত্নং কুর্ব্বন্তি দর্শনে॥
ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রম বাসিনঃ
পিতুঃ স নিত্য সন্তুষ্টো নাতি চক্রাম চাশ্রমাৎ॥
ন তেন জন্ম প্রভৃতি দৃষ্টপূর্ব্ব তপস্বিনা
স্ত্রী বা পুমান বা যচ্চান্যৎসত্বং নগর রাষ্ট্রজম্।
ততঃ কদা চিত্তং দেশমাজগাম যদচ্ছয়া
বিভাণ্ডক সুতস্তত্র তাশ্চাপশ্য দ্বারাঙ্গনাঃ।
তাশ্চিত্র বেশাঃ প্রমদা গায়ন্তী মধুর স্বরং
ঋষিপুত্র মুপাগম্য সর্ব্বা বচনমব্রুবন্॥
কস্ত্বং কিং বর্ত্তসে ব্রহ্মন জ্ঞাতু মিচ্ছামহে বয়ম
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংসনঃ॥
অদৃষ্ট রূপাস্তা স্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ
হার্দ্দাত্তস্য মতির্জাতা আখ্যাতু, পিতরং স্বকম্।

এখনও ঋষ্যশৃঙ্গের মনে কুভাব উদয় হয় নাই। হয়ত তিনি তাহাদিগকে দেবতা ভাবিয়াছিলেন। পিতৃস্নেহ এখনও ভুলেন নাই। পিতার ও আপনার পরিচয় দিলেন। এবং আশ্রমাগত অতিথিকে মুনি জনোচিত সৎকার করিবার জন্য আপন আশ্রমে আহ্বান করিলেন। রূপজ কি গুণজ মোহ এখনও জন্মে নাই, চিত্ত বিভ্রম হয় নাই। কেবল নববস্তুসন্দর্শনজনিত একটু আনন্দ জন্মিয়াছিল।

পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুতঃ ঔরসঃ
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম্ম চ মে ভুবি।
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্ব্বেষাং বিধি পূর্ব্বকম্॥
ঋষিপুত্র বচঃশ্রুত্বা সর্ব্বাসাং মতিরাস বৈ
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মু সর্ব্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ।
গতানান্তু ততঃ পূজামৃষি পুত্রশ্চকারহ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চনঃ।
প্রতিগৃহ্যতু তাং পূজা সর্ব্বাএব সমুৎসুকাঃ
ঋষেভীতাশ্চ শীঘ্রন্তু গমনায় মতিং দধুঃ॥

গো ব্রাহ্মণে ভক্তি হিন্দুর মজ্জাগত। পতিতা বারবনিতাও ব্রহ্মণ্যদেবকে ভয় করে। ঋষিকুমার না হয় তাহাদিগকে বিদেশী ব্রহ্মচারী বা দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু বারবনিতারা ঋষ্যশৃঙ্গকে বিলক্ষণ চিনিত। সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণকুমারের পাদ্য অর্ঘ্য তাহারা গ্রহণ করিবে, একি সম্ভব? কোন ছলে তাহারা কি তাহা অস্বীকার করিতে পারিত না?

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রন্তে ভক্ষয়স্ব চ মাচিরম্।
ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্ব্বাহর্ষ সমন্বিতাঃ
মোদকান প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান শুভান্।
তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতিস্ম মন্যতে
অনাস্বাদিত পূর্ব্বাণি বনে নিত্য নিবাসিনাম্।
আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রহ্মচর্য্যাং নিবেদ্য চ
গচ্ছন্তিস্ম্য পদেশাত্বা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ।

মুনিকুমার তাহাদের প্রদত্ত সেই মোদক ভক্ষণ করিলেন। তিনি মোদককে কোন প্রকারের ফল বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলাহারী ব্রহ্মচর্য্যার প্রত্যবায় সে মোদক। আহার দোষে ব্রহ্মচারীর স্নায়ু উষ্ণ হইল। একটু পূর্ব্বরাগের লক্ষণ দেখা গেল, একটু চাঞ্চল্য জন্মিল। আর একদিন দেশ-কাল পাত্র দোষে যোগীশ্বর মহাদেবের এইরূপ একটু চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল।

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ
চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশেঃ
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

মহাদেব সে চাঞ্চল্যের কারণ অবধারণ করিয়াছিলেন, করিয়া বলপূর্ব্বক সে চাঞ্চল্য নিবারণ করেন। অবোধ ঋষিকুমার কি হইতে কি হইতেছে বুঝিতে পারেন নাই। ব্যাধের বংশীরব শুনিয়া মৃগশিশু দৌড়াইয়া গিয়া জালবদ্ধ হইল।

গতাসু তাসু সর্ব্বাসু কশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ
অস্বস্থহৃদয় শ্চাসীৎ দুঃখাচ্চ পরিবর্ত্ততে।

"কশ্যপস্য আত্মজ।" তিনি ত বিভাণ্ডক। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গকে কাশ্যপের পুত্র বলা হইল। আমরা ছাপাখানার ভুল সংশোধন করিয়া লইলাম, কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। ছাপার ঘাড়ে দোষটা চাপাইলাম, কিন্তু এতবার ঋষ্যশৃঙ্গকে কশ্যপ পুত্র বলা হইয়াছে যে, মনের খটকা মিটিল না। বোধ হয় যেন যে দেশে ঋষ্য শৃঙ্গের ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই প্রদেশ হইতে অনেক দূরে অথবা অনেক পরে ঘটনাটী রামায়ণে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশং মাজগাম স বীর্য্যবান
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান মনসা চিন্তয়ন্মুহুঃ।

পূর্ব্বরাগ আরম্ভ হইয়াছে। তাদের সেই অঙ্গভঙ্গী বিলাস চাতুরী স্মরণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের সেইখানে, যদি পুনরায় দেখা পান এই আশায়, আর যদৃচ্ছাক্রমে নয় — মুনিকুমার চলিলেন।

হৃষ্টিরা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শরাদিক
তয়োকস্মিলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।

চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ এই রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

মনোজ্ঞা যত্রতাদৃষ্টাঃ বারমুখ্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
দৃষ্টৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ
উপসৃত্য ততঃ সর্ব্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ
এহ্যাশ্রম পদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন
চিত্রাণ্যত্র বহুনি স্যুর্মূলানিচ ফলানি চ
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণ বিধির্হিভবিতা ধ্রুব,
শ্রুত্বা তু বচন তাসাং সর্ব্বাসাং হৃদয়ঙ্গমং
গমনায় মতিং চক্রে তঞ্চ নিন্যুস্তথা স্ত্রিয়ঃ

"হে শুভদর্শন। আপনি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করুন। যদিচ এখানে সুখাদ্য বিচিত্র অনেক ফল মূল আছে, তথাপি সে স্থানে ভোজন বিধি এখান হইতে অনেক উৎকৃষ্ট।" শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ যাইতে অভিলাষ করিলেন, তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

কথটা ঠিক বুঝা গেল না। মোহনভোগের লোভে, না সেই ঋষিকুমারদের সৎসঙ্গের লোভে ঋষ্যশৃঙ্গ ঘর ছাড়িয়া পলাইলেন? না দুটারই লোভ ছিল। পূর্ব্বরাগের লক্ষণ দুটী কথায় বুঝিয়াছিলাম, "অস্বস্থহৃদয়" আর "চিন্তয়ন্ মুহুঃ" এত বড় ঋষির এতটা পতন কি দুকথায় ব্যাখ্যা করা যায়? টীকাকার বলেন, তাঁহার পতন হয় নাই। "স্ত্রীত্বাগ্যজ্ঞানাৎ ন তথা তপোহানিঃ' তিনি যখন স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাদের চিনিতে পারেন নাই, তখন তপোহানি হয় নাই। আর যৎকিঞ্চিৎ হইয়া থাকিলেও "ঈষদ্দোষস্তু তপসৈব দগ্ধঃ" তাহা তপস্যার বলে দগ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য বাল্মিকী তাঁহাকে সে অবস্থায়ও "তেজস্বী" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিভাণ্ডক প্রাসঙ্গ বলিয়া পুত্রের হরণে ক্রুদ্ধ হন নাই। এ ব্যাখ্যাও আমাদের মনঃপূত হইল না। তাঁহার চিত্তবিকার না হইয়া থাকিলে সে চাঞ্চল্য সে লালসা কেন হইল? যে পিতাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া আশ্রম হইতে এক পদ যাইতেন না, ঋষ্যশৃঙ্গ না বলিয়া জন্মের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন। আমরা ত দেখিতেছি ঋষ্য-

শৃঙ্গের পশুর মত লালসা জন্মিয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যার যজ্ঞহোমপিতৃভক্তি আকাশে উড়িয়া যায়, সে দেবতা না পশু ?

মহাভারত বন পর্ব্বে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে আমাদের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হয়। কশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক। কাশ্যপ জলে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন।

মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপসরসী মুর্ব্বসাম্
অপ্সু পস্পতেব রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবত্তদা।
সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিনী চাভবত্ততঃ।

এ হরিণী পূর্ব্ব জন্মে দেব কন্যা ছিল।

তস্যাম্মৃগ্যাং সমভবত্তস্য পুত্রো মহানৃষিঃ
ঋষ্যশৃঙ্গ স্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্ত্তত।

হরিণীর পুত্র বলিয়া তাহার মাথায় একটী শৃঙ্গ ছিল; তাঁহার পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষ পূর্ব্বে তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই, এজন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়তই ব্রহ্মচর্য্যে রত ছিল। ওদিকে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ যদৃচ্ছা-বশতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় পুরোহিতের প্রতিও অহিতাচরণ করাতে ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বারি বর্ষণ করিলেন না। একজন মুনি রাজাকে বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়াছেন।

কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা নিষ্কৃতিং কুরু
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিসুতমানয়স্ব চ পার্থিব।
বানেয় মনভিজ্ঞঞ্চ নারীনামার্জ্জবে রতম
সচেদবতরেদ্রাজন বিষয়ংস্তে মহাতপাঃ
সদ্য প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ

অনন্তর লোমপাদ কতকগুলি বারাঙ্গনা ডাকাইয়া বলিলেন। "ঋষ্যশৃঙ্গকে কোন উপায়ক্রমে প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্য মধ্যে আনয়ন কর।" তাহারা ঋষির শাপের ভয়ে অস্বীকার করিল। তখন এক বৃদ্ধা বারযোষিতা বলিল, আপনি যদি আমার অভিলষিত বিষয় সকল পূর্ণ করিতে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ঋষি পুত্রকে আনিতে পারিব। রাজার আদেশে নৌকা মধ্যে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া বারাঙ্গনা আপন কন্যা ও অপর কয়েকটী নারী লইয়া বিভাণ্ডকাশ্রমের অদূরে নৌকা বন্ধন করিল। অনুচরদিগের দ্বারা সে সন্ধান লইল, বিভাণ্ডক কোন্ সময়ে আশ্রমে অনুপস্থিত থাকেন এবং তেমনি সময়ে আপন দুহিতাকে আশ্রমে প্রেরণ করিল। কন্যা আশ্রমে যাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের যথারীতি কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ঋষ্যশৃঙ্গও তাহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অতিথি সৎকার করিতে চাহিলেন। কন্যা বলিল, আমার ধর্ম্ম এই যে, আমি কাহারও অভিবাদন স্বীকার করি না, কাহারও প্রদত্ত পাদোদক স্পর্শ করি না। অপিচ আমি আপনাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিব। অতঃপর সে ঋষিতনয়কে উপাদেয় উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য সকল প্রদান করিল। সুরসান্বিত ও সুদৃশ্য সেই ভক্ষ্যদ্রব্য সকল ঋষি কুমারের সাতিশয় রুচিকর হইল।

পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মুমোদ চিক্রীড়চৈব প্রজহাস চৈব
সা কন্দুকেনারমতস্য মূলে বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব
গাত্রৈশ্চগাত্রাণি নিষেবমানা সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃষ্যশৃঙ্গম্
সর্জানশোকাং স্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্ সুপুষিপতান বনাম্যাবভজ্য।
বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ।
অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্য
অবেক্ষমানা শনকৈর্জগাম কৃতাগ্নি হোত্রস্য তদাপদেশম্
তস্যোংগতায়াং মদনেন মত্তো বিচেতনশ্চাভব দৃষ্য শৃঙ্গঃ
তামেব ভাবেন গতেন শূন্যে বিনিশ্বসন্নার্ত্তরূপো বভূব।

মহাভারতকার ঋষ্যশৃঙ্গের চিত্ত বিকার গোপন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই।

বিভাণ্ডক গৃহে আসিয়া পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সমিৎসঞ্চয় করা হয় নাই, অগ্নিহোত্র হোম করা হয় নাই, হোমধেনু দোহন করা হয় নাই। বস্তুতঃ চিত্ত বিকারে ঋষ্যশৃঙ্গ এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। তন্ময় হইয়া সময়পাত করিয়াছেন, নিত্যক্রিয়া হয় নাই।

এ অদ্ভুত লালসা। সরল স্বভাব ঋষিকুমার পিতার নিকট কোন কথাই গোপন করিলেন না, অথচ দেখা গেল, তিনি বারযোষাকে তখনও ঋষিকুমার বলিয়া জানেন। সরলতার এমন চিত্র জগতে দুর্লভ। এদিকে রিপুর দুর্জ্জয় তাড়না। মোহে আচ্ছন্ন, ভেদ করিবার শক্তি নাই। বিভাণ্ডক বুঝিলেন, কোন রাক্ষসী নারীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের যোগভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছে। তিন দিন পর্য্যন্ত রাক্ষসীর অনুসন্ধান করিলেন, সন্ধান পাইলেন না। পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, রাক্ষসী মায়ার প্রকৃতি কীর্ত্তন করিলেন, ভাবিয়াছিলেন কোন ফল হইবে। চতুর্থ দিবসে বিভাণ্ডক গৃহ হইতে বহির্গত হইলে বারযোষা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মুনিকুমার পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং কহিলেন যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আসেন, এই অবসরে চলুন আমরা আপনার আশ্রমে গমন করি। তাহারাও ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া পলায়ন করিল।

মহাভারতকার ঋষ্যশৃঙ্গের পতন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এরূপ পতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই।

একশৃঙ্গ জাতকে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাশ্যপের লালসা উদ্দীপিত হইলে সন্তান হয়। সন্তান হরিণীর গর্ভে। হরিণী লালসার আদর্শ। এমন সংযোগে যে সন্তান জন্মে, সে লালসাময় হইবেই হইবে। যতদিন ইন্ধনের অভাব ছিল, একশৃঙ্গ ব্রহ্মচারী। উপলক্ষ সংযোগ মাত্র পশু প্রকৃতি পূর্ণ মাত্রায় জাগিল, ব্রহ্মচর্য্যের বন্ধন ছিন্ন করিল। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করিতে এক শৃঙ্গ জাতকের কল্পনা।

প্রাগ্জন্মাভ্যাস লীলাদতি সরসলসদ্বাসনা মূলশেষাৎ
নিঃশঙ্কস্যাপি জন্তোঃ কমল কলনয়া জায়সে মানসেঽস্মিন্।
রাগঃ সম্ভোগ লীলা পরিমল পটলাকৃষ্ট সর্ব্বেন্দ্রিয়াণা
মেকত্রৈবাতিমাত্রং সরস মধুলিহাঃ বন্ধনং যঃ করোতি

শাক্যপুরে ন্যগ্রোধবনে উপবিষ্ট তথাগতের নিকট ভিক্ষুগণ যশোধরার বিরহ দশা বর্ণন করিলেন।

ত্বদ্দশনে তিষ্ঠতি সর্ব্বথৈব
বিভূষিতা কম্পতরঙ্গিতাঙ্গী।
ভোজ্যাধিবাসে ভবতঃ করোতি
বিলোভনং মোদক পাত্রহস্তা।
নাদ্যাপি শান্তিং সমুপৈতি তস্যাঃ
মনোবিকারঃ স বহু প্রকারঃ
ত্বদাননেন্দুদ্যুতি বিপ্রযুক্তং
সীদত্যলং সা হি কুমুদ্বতীব।

তখন ভগবান উত্তর করিলেন।

যশোধরা দ্যেব বিকার যুক্তাং
বিভর্ত্তি নৈতামভিলাষ লীলাম
জন্মান্তরেঽপি স্মরবিভ্রমৈর্মে
সা মোদকৈঃ লোভনমেব চক্রে॥

পণ্ডিত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন একশৃঙ্গ উপাখ্যান লইয়া এক খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইত এক শৃঙ্গ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য কি সহজে বুঝা যাইবে।

গভীর সলিলে পঙ্কমূল হতে উঠি
কমল যেমতি, গন্ধে আকর্ষণ করে,
মধুপ নিকরে, তথা পূরব জনম
বাসনার মূল হতে জনমিয়া হায়
দুর্দ্দম ভোগের লিপ্সা মানবের মনে
বিষম সৌরভে টানে ইন্দ্রিয় নিচয়।

লভে যেই একবার বিষয়ের স্বাদ
ভুলিতে কি পারে তাহা জন্মজন্মান্তরে ?

* * *

বিষসম জানি মনে বিষম বিষয়ে
সংসার ত্যজিয়া এবে হয়েছি সন্ন্যাসী,
এখনও প্রণয়িনী যশোধরা হায়,
বাসনার বশে এক লক্ষ্য করি মোরে
মোহিতে যতনশীলা সংসার মায়ায়।
যেই প্রলোভনী চেষ্টা বশে যশোধরা,
আইসে হেথায়, তাহা নহেত নূতন,
এইরূপে বাগুরায় বেঁধেছিল মোরে,
নলিনী রূপেতে জন্মে কাশীরাজ ঘরে
যশোধরা পূর্ব্বজন্মে, এক শৃঙ্গরূপ
ছিনু যবে মহাতপা কাশ্যপ-নন্দন।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও একশৃঙ্গের উপাখ্যান ভাগে অতি সামান্য প্রভেদ আছে। কাশীরাজের একমাত্র কন্যা নলিনী, পুত্র হয় নাই। সুপাত্রে বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিবেন, রাজার একান্ত বাসনা। জাহ্নবী তীরে সাহাঞ্জনী বনে ব্রহ্মচারী একশৃঙ্গের বাস। রাজা মুনি-কুমারকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কন্যাকে একাকিনী সেই বনে প্রেরণ করেন। নলিনী একশৃঙ্গকে ভুলাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্থান করিবার জন্য যে রথ প্রস্তুত ছিল, তাহার অশ্ব দেখিয়া একশৃঙ্গ রথে আরোহণ করিতে অস্বীকার করেন, অশ্ব কিনা তাঁহার স্বজাতীয়, তখন নলিনী নৌকার উপর এক কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উঠাইয়া একশৃঙ্গকে লইয়া পলাইয়া আসেন। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত ও অবদান কল্পলতার উপাখ্যানে সাদৃশ্য অধিকতর।

যুবতী কন্যাকে একাকিনী স্বামী সঞ্চয়ে দূরে তপোবনে প্রেরণ করা হিন্দুভাব বলিয়া বোধ হয় না। নগরাজ একদিন উমাকেও একাকিনী এইরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বারাঙ্গনা দ্বারা চরিত্র কলুষিত করিয়া পরে জামাতৃত্বে বরণ করা অপেক্ষা এ উপায় শ্রেষ্ঠতর সন্দেহ নাই। ক্ষেমেন্দ্রের লিখন ভঙ্গী ও উপমার চাতুরীতে অনেক সময় কালিদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ হয় কালিদাসের দৃষ্টান্তে ক্ষেমেন্দ্র নলিনীকে একাকিনী তপোবনে পাঠাইয়াছিলেন। কালিদাস ও ক্ষেমেন্দ্রের মত মনিষীগণ এমন দৃষ্টান্ত দিলেও আমাদের বোধ হয় না, এরূপ ব্যবহার ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজে কোন দিন প্রচলিত ছিল। ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মিরী কবি। বোধ হয়, গ্রীকদিগের ব্যবহার দেখিয়া কালিদাস ও ক্ষেমেন্দ্র এইরূপ ব্যবহার হিন্দুদের প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

ক্ষেমেন্দ্রের লেখনী অমৃত বর্ষণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দু তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে আর দু একটী উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রায়ঃ প্রজাপালন সাবলেপাঃ
স্বল্পাশয়া এব ভবন্তি ভূপাঃ।

* * * *

বিস্তীর্ণশাখং স্থির বদ্ধমূল
মভ্যুন্নতং সর্ব্ব জনোপজীব্যম্
আবন্ধি তুল্য প্রসবার হীনং
ঘুণক্ষতং বৃক্ষ মিবাধিপত্যম্।

* * * *

পাণৌ প্রদীপ্তামিব দীপবর্ত্তি
ধর্ত্তুং ন শক্নোতি জনঃ স্বকন্যাম্।
ন্যাসার্থ তুল্যাহি পরার্পণীয়া
শ্চিন্তা কলা এব কুলস্য কন্যাঃ॥

* * * *

কান্তাবনান্তং শনকৈরবাপ্য
লীলাভিরামা বিজহার তন্বী
বালানিলেনাকলিতা লতেব
সঞ্চারিণী চারু বিলোচনা সা॥

* * * *

ন বাসনাভ্যাস বিলীনমন্ত

র্জহাতি জন্তু বিষয়াভিলাষম্ ॥

*   *   *   *

কষ্টং তপস্বী মৃগশাবকোহয়ং

তীব্রেণ মুগ্ধঃ স্মর লুব্ধকেন।

বরাঙ্গনাবাগুরয়া কটাক্ষ

কূটাবপাতী সহসা নিবদ্ধঃ ॥

*   *   *   *

জনা প্রসক্তাঃ স্ব কালকূটৈ

বিদ্ধাঃ স্বতীক্ষৈস্তরুণী কটাক্ষৈঃ

শোচন্তি যোষিদ ভুজঙ্গ পাশবদ্ধাঃ

সংসার কারা সদনে সদোষাঃ

*   *   *   *

ধনস্য সংমোহ মলীমসস্য

ভবস্য মধ্যে কুটিলাঃ স্ফুরন্তঃ

কুর্ব্বন্তি কান্তাতড়িতঃ ক্ষণান্তাং

পুংসাং বিয়োগে ভৃশমন্ধকারম্ ॥

একশৃঙ্গ-কথা লিখিবার পূর্ব্বে ক্ষেমেন্দ্র কালিদাসের গ্রন্থাবলি ও ভট্টীকাব্য প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

প্রত্যুপ্ত মুক্তাফল বিদ্রুমাভাং। একশৃঙ্গ।

মুক্তাফলং বা স্ফুট বিদ্রুমাভং। কুমারসম্ভব।

নাসার্থ তুল্যাহি পরার্পণীয়া

শিচন্তফলা এব কুলস্য কন্যাঃ। একশৃঙ্গ।

অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব

তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামম্

প্রত্যর্পিত ন্যাস ইবান্তরাত্মা। শকুন্তলা।

হৃতঃ কৃশানু প্রতিমান্মহর্ষেঃ। একশৃঙ্গ।

গুরোঃ কৃশানু প্রতিমাৎ বিভেষি। রঘু।

শ্রুতা ময়া চূত বনে কদাচিৎ

ন কোকিলানাং ন চ ষট্‌পদানাম্। একশৃঙ্গ।

স্বরেণ তস্যামমৃত স্রুতেব

প্রজল্পিতায়াং অভিজাত বাচি

অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূল বাচি

শ্রোতুর্বিতন্ত্রী রিব তাড্যমানাঃ। কুমার।

ব্রূহি প্রসন্নং ক তপোবনং তে

ত্বৎপাদ বিন্যাস বিকাশিনীভিঃ

যত্র প্রভাভিঃ সততং বিভাতি

সঞ্চারিণী পঙ্কজিনী স্থলেষু। একশৃঙ্গ।

আভরতু মুচ্চরণৌ পৃথিব্যাং

স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্। কুমার।

বাসা নিলেনা কলিতা লতেব

সঞ্চারিণী চারু বিলোচনা সা। একশৃঙ্গ।

হিরণ্ময়ী শাল লতেব জঙ্গমা। ভট্টী।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাহ আকবর ও শ্রীমচ্চৈতন্য সম্প্রদায়। (৩)

প্রভু সনাতন পাতসার এই উক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, ভক্তগণ কর্ত্তৃক যেখানে ঈশ্বরের নাম গান হয়, সেই খানেই ভগবানের স্থিতি। অতএব নগরে ভক্তগণ কর্ত্তৃক নাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, তথায় গমন কর। ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ নাম স্মরণ করিলে অবশ্যই প্রভু কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, সন্দেহ নাই।

সম্রাটের প্রতি এই আজ্ঞা করিয়া এবং কিছু ভক্তি যোগ শিক্ষা দিয়া বিদায় দিলেন।

(১) শ্রীকৃষ্ণদাসাত্মজ শ্রীল গঙ্গাবিষ্ণু ক্ষেমরাজ প্রণীত হিন্দি পদ্য ভক্তিমালা গ্রন্থে; (২) শ্রীযুক্ত বিটল দাস সাধু কর্ত্তৃক হরিভক্তি-প্রচারিকা হিন্দি গ্রন্থে, এবং (৩) শ্রীমন্নাভাজী কর্ত্তৃক দোহাচ্ছন্দ ভক্ত মালা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ

* ১। ভক্তিমালা গ্রন্থ বোম্বে বেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানায়, ২। হরিভক্তি প্রচারিকা গ্রন্থ পুনা নগরে জগদীশ্বর ছাপাখানায়, এবং ৩। শ্রীমন্নাভাজী কৃত ভক্তমাল কাশীধামের সকল ছাপাখানায় পাওয়া যায়।

বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। (১) শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ভ্রমর বর এই প্রসঙ্গ একখানি শ্রীমচ্চৈতন্য সঙ্গীতা নামে উৎকল ভাষা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। (২) শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী বঙ্গ ভক্তমালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই,—

"শ্রীল সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকবর পাতশা, আইলা দর্শন লাগিয়া॥
যোড় হস্তে রাজা, দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে, প্রশ্ন করে অনুরাগে॥"
"সনাতন রাজার, দর্শন নিন্দামানি।
হেট মাথে রহিলা, না কহে কিছু বাণী॥
পরে আকবর সাহা, শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া।
আলাপ করিলা তবে, সম্মান করিয়া॥"
"রাজা বহু স্তুতি নতি, করিয়া বলিলা।
যাওন সময়ে কিছু, দিতে ইচ্ছা কৈলা॥
গোঁসাই তোমার কিছু, আকাঙ্ক্ষা যে থাকে॥
ব্যক্ত করিয়া তাহা, কহিবে আমাকে॥"
"যে আজ্ঞা করিবে তাহা, হাজির করিব।
যাহা চাবে তাহা দিব, ব্যর্থ না হইব॥
সনাতন কহেন, আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুনঃ রাজা কহে, পুনঃ কহে নাহি নাহি॥
"একান্ত যদ্যপি রাজা, পুনঃপুনঃ কহে।
তবে সনাতন কিছু, ভঙ্গী করে কহে॥
অর্থ যে তোমার কাছে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা তবে, শুন যদি কহি॥'
"এই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িলা জলে, অল্প স্থান হয়॥
এই স্থান টুকু মোরে বাঁধাইয়া দেহ।
তব স্থানে মুক্তি আর, কিছু নাহি চাহ॥"
"এতেক শুনিয়া রাজা, স্বপ্ন আদি সনে।
দাণ্ডাইয়া আপনে, দেখয় সেই স্থানে॥
দেখে নানা মণি মুক্তা, পরম রতন।
যাহা দেখি মোহ পায়, ব্রহ্মাদিগণ।"
"শোভা দেখি রাজা, তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তিহ, আর না দেখিল॥
বিচার করিল মনে, এই বৃন্দাবন।
স্বরূপে যে হয় এই, পরম মোহন॥"
'আমি কিছু গোঁসাইরে, দিতে যে চাহিলা।
তাহার উত্তর মোরে, ছল করি দিলা॥
তুমি কিবা দিবে মুক্তি, পাইনু যে ধন।
অধিক তোমার তার, না হবে কখন॥"
"এতেক চিন্তিয়া রাজা, মুচকি হাসিয়া।
গোঁসাইর আগে কহে, শ্রবণ করিয়া॥
এতে বুঝিলাম মুক্তি, এই ত্রিজগতে।
মহা আঢ্য ধনি কেহ, নাহি তোমা হৈতে॥"
"ত্রিজগতে নাম সেই, পরম দুর্লভ।
দুরারাধ্য যেহ তিহোঁ, তোমার সুলভ॥
অতএব তোমারে আর, আমি দিব কি?
গৌরাঙ্গ দর্শন পাইল, তবে আমি জী॥"
"তথাস্তু বলিয়া গোঁসাই, আশীর্বাদ কৈল।
বিদাই লইয়া রাজা, পুরী প্রবেশিল॥"

(প্রাচীন ভক্তমাল)

অনন্তর, অতি উচ্চরোলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হইতেছে, রাজা তৎশ্রবণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পদব্রজে নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক দূর হইতে সন্দর্শন করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ী বঙ্গবাসী, ব্রজবাসী, উৎকলবাসী এবং গৌড় প্রভৃতি বিদেশী বৈষ্ণবগণ তুরী, ভেরী, কাংস্য করতাল বাদ্য লইয়া উচ্চৈঃস্বরে :—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায়, কেশবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম, শ্রীমধুসূদনঃ।"

এই পদ গাইতেছেন। ঝিকি ঝিকি ঝিকি তাং, বলিয়া মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছে। লাখ লাখ ভক্ত বেড়া সংকীর্ত্তনে উপস্থিত। দর্শকের সীমা পরিসীমা নাই। সম্রাট তদ্দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া প্রেম-পুলকিত চিত্তে 'হা কৃষ্ণ,' 'হা গৌরাঙ্গ' স্মরণ ও উচ্চারণ

১। শ্রীমচ্চৈতন্য সঙ্গীতা উৎকল গ্রন্থ, এখন অপ্রাপ্ত।

২। বঙ্গ ভক্তমাল গ্রন্থ কলিকাতা বটতলায় পাওয়া যায়।

করিবা মাত্রই (জাগ্রত স্বপ্নবৎ) সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থলে এক অপরূপ আশ্চর্য্য দেখিলেন। দেখিলেন গৌরকান্তি আজানুবাহু এক মহা পুরুষ কীর্ত্তনের মধ্যভাগে নৃত্য করিতেছেন। এই অপরূপ মাধুরী দর্শনে রাজা ব্যস্তভাবে সংকীর্ত্তন সমীপে উপস্থিত কালে ঐ রূপ মাধুরী আর দেখিতে পাইলেন না। হায় কি কি হ'ল, হায় কি হ'ল বলিয়া ধরায় পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অঙ্গ পরিচ্ছদ ব্রজধূলায় লটপট হইতে লাগিল। রাজার ঐ অবস্থা দেখিয়া পশ্চাদ্গামী অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ রাজকে ধরাধরি করিয়া মনোহর শিবিকা মধ্যে স্থাপন করতঃ আগ্রা রাজধানী অভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিল।

রাজা রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়া চেতন প্রাপ্তে আবার দেখিলেন—

"অন্তরে গৌর, বাহিরে গৌর,
সকলি গৌরময়।
আঁখির ভিতর, জড়িত হইয়া,
পলকে আঁধার হয়॥
ইত্যাদি।

আর স্থির হইতে পারিলেন না। শয়নাগারে গমন করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন, পরন্তু তাহাতেও নিদ্রাসুখ বা মন স্থির হইল না। যে অঙ্গ ব্রজধূলায় লুঠপট হইয়াছে, সে অঙ্গে মনোহর শয্যা কি ভাল লাগে? অমনি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে— নয়নে নয়নে রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। তখন আদ্ররসে আপ্লুত হইয়া অনুরাগ ও বাৎসল্য ভাবে বলিলেন—

"জীউ জীউ মেরে, মনচোর গোরা।
আপহি নাচত, আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে, ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে, লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই পরি চলু, নট নট নটিয়া।
স্থির নাহি হোয়তে, আনন্দে মা তোলিয়া॥
ঐছন প্রভু কে, যাউ বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে, প্রেম ভিখারী॥

অপর অনুরাগে বলিলেন,—

"নিশিদিন রহী, সোচ মেরে উর।
কোন কাজ, ব্রজরাজ কুমরবর।
ধর্যা এসো গৌর কলেবর।
সুখ কো পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন,
নিকট সামহ।
সো সুখ ছাড়ি, বসত নদীয়া পুর,
সমরু পরত নাহি এহ॥
সংকীর্ত্তন রস, সঙ্গত বিলসত,
কোন মাধুরি ভাসে।
গোপীরস শৃঙ্গার সার তাই,
লোভী হুই রহে ছিয়ামে॥
জাকো ভাব করি এ্যারসি গতি,
দো সব তে অধিকারী।
ইহ অনুমান আকবর তনু মন,
চরণ কমল বলিহারি॥
(ভক্তিমালা)।

রাজার বদনে এই পদ স্ফূর্ত্তি হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। সেই দিন হইতে রাজার মন ফিরিয়া যায়, এবং রাজা স্বতন্ত্র হন। রাজ বৈষয়িক ব্যাপারে বড় একটা মনোযোগ দিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে মন সমর্পণ করতঃ নির্জ্জন ভজনালয়ে পণ্ডিতবর্গকে লইয়া সর্ব্বদা গ্রন্থানুশীলন আর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতেন। বলিতে হইবে, এ কেবল সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ;—

তুলয়াম লবেনাপি, ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য, মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ভগবদ্ভজন নিষ্ঠ সাধুগণের ক্ষণকাল সঙ্গের সহিত অনির্ব্বচনীয় স্বর্গ ও মোক্ষ সুখেরও তুলনা করা যায় না। সাধু সঙ্গ হইতে জীবের হৃদয়াকাশে যে অপার আনন্দের উদয়

হয়, উহা পরমার্থিক। ক্ষণস্থায়ী, ঐহিক পারত্রিক, আনন্দ উহার নিকট কখন কি স্থান পায়? পূর্ণচন্দ্র উদয় হইলে, খদ্যোতের জ্যোতি যেরূপ তিরোহিত হইয়া যায়, উহাও সেইরূপ বিলীন হয়। এই জন্য সর্ব্ব শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ প্রমাণ দিয়া মহাজনে নিম্নোক্ত কয়েকটি সার কথা বলিয়া ছেন :—

"যে ধর্ম্মে সংসার, পুনঃপুনঃ উপজয়।
সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বলিয়া শ্রুতি কয়॥
বিষয় অনিত্য রস, তাহাতে লুব্ধিয়া।
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে, বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু জীব, নিত্যদাস তাহা ভুলি।
নানা কর্ম্ম তপ করে, অন্যে স্বামী বলি॥
গুণের অধীন জীব, যার যে প্রকৃতি।
তেমতি স্বভাবে, ফিরে রজঃ তম মতি॥
বহু ভাগ্যে যদি হয়, সাধুর সঙ্গতি।
বুঝয়ে যথার্থ তবে, ঘুচয়ে দুর্ম্মতি॥
কৃষ্ণে রতি মতি হয়, ভব হয় ক্ষয়।
ধন্য! ধন্য! করে লোক, দেবপিতৃচয়॥'
(ভক্তমাল)

যে সময়ে সম্রাট স্বামী হরিদাসের গীত শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আর স্বামীজীউ রাজার কর্ণ-কুহরে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ করিয়া রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাই দীক্ষা স্বরূপ। আর যে সময়ে সম্রাট শ্রীমৎ সনাতন প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামের উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাই শিক্ষার সোপান বলিতে হয়। সাধুর কৃপায় কি না হইতে পারে?

শ্রীহরিদাস স্বামীর দীক্ষা এবং শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা দানে সম্রাট যে সময়ে কীর্ত্তন স্থলে উপনীত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন, পতিতোদ্ধার কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কালেই নিজরূপ দর্শন দিয়া রাজাকে আপনার লোকে লইয়াছিলেন। যথা, মহাজন বাক্য :—

'ভক্তকৃপা হইলে, প্রভুর কৃপা হয়।
নীচ জাতি হইলে, আপন করে লয়॥"

পশ্চাৎ রাজা কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন হইয়া, যে সকল গ্রন্থে ব্রজরসের আধিক্য আছে, সেই সকল গ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ও উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু এবং শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত (১) ভক্তি সন্দর্ভ (২) ভাগবৎ সন্দর্ভ (৩) তত্ত্ব-সন্দর্ভ (৪) পরমার্থ-সন্দর্ভ (৫) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ (৬) প্রীতি-সন্দর্ভ এবং মহাসুর গোপাল চম্পূ প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনাইয়া শ্রীবল্লভ আচার্য্য বৈদান্তিক পণ্ডিতের দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতেন।

শ্রীবৈষ্ণবের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য পণ্ডিতের ব্যাখ্যায় কখনও কি বিশুদ্ধ ভক্তির মীমাংসা হয়? পণ্ডিতের ব্যাখ্যা রাজার বড় একটা মনঃপুত হইত না। পশ্চাৎ রাজা জন পরম্পরায় অবগত হইলেন, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীহরিরাম ব্যাস এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ ঐ সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সুনিপুণ এবং সুপণ্ডিত। তাঁহাদিগকে প্রহরাতিশয়ে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্রা রাজধানীতে আনয়নের নিমিত্ত উপযুক্ত মন্ত্রী ও যান পাঠাইয়া এবং তাঁহাদিগকে আনাইয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। হস্তলিখিত বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থে তৎপ্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে,—

"হরি রাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দ ঘন।
আর হরিদাস স্বামী, এই তিন জন॥
মহানুভব সিদ্ধি, শুনিয়া পাতসা।
দেখিবারে বড় মনে হইল ভরসা॥
লইয়া যাইতে পাতসা, এই তিন জনে।
যান পাঠাইয়া দিলা, শ্রীবৃন্দাবনে॥

ইহাঁরা যাইতে কেহ, সম্মতি না হইল।
তথাপিও একান্ত করিয়া লয়ে গেল॥
তিন যে ভকত, অবধূত বেশ হয়।
অর্দ্ধ উন্মিলিত, দৃষ্টি উন্মত্ত অতিশয়॥
পাতসা লইয়া যত্ন, সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে, সবারে রাখিল॥
কৃষ্ণ কথা পুছে, ষট্ সন্দর্ভের মতে।
সাধুগণ, পরিতুষ্ট, হইল ব্যাখাতে॥

(ভক্তমাল)

এই সমস্ত নিদর্শন দ্বারা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়, দিল্লীর সম্রাট আকবর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইতিহাসে বা আকবর-চরিতে ঐ প্রসঙ্গ না থাকিবার কারণ এই ;—মোবারক নামে একজন মৌলবী আগ-রায় একটী মোক্তবখানা অর্থাৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া মুসলমান বালক ও যুবকদিগকে আরবা ও পারস্য বিদ্যা এবং মুসলমান ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্র ফৈজু এবং দ্বিতীয় পুত্র আবুলফজল, পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষা দানে উভয়ে পারস্য ও আরব্য বিদ্যায় অতিশয় পণ্ডিত হইয়া ফৈজু গুপ্তভাবে বারাণসী ধামে জনৈক সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও অসামান্য মেধাবশতঃ স্বল্পকাল মধ্যেই সংস্কৃতে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। আবুল ফজল যদিও সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ পণ্ডিত ছিলেন না, পরন্তু হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এবং সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের মর্ম্ম বেশ বুঝিতেন। সেই প্রতিষ্ঠায় দুই ভাই সম্রাট কর্ত্তৃক মন্ত্রী পদে আদিষ্ট হইয়া আবুলফজল, সাহ আকবরের জীবন চরিত ও রাজ্যের যাবতীয় বিবরণ লিখিয়াছিলেন। উহাই আইন আকবরী নামে প্রসিদ্ধ। ফলতঃ উহার ভিতর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই।

ইংরাজ রাজত্বকালে ইতিহাসবেত্তাগণ উহাই অবলম্বন করিয়া যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা এক প্রকার অনুবাদের অনুবাদ। পরন্তু, আকবরের সময়ে মহা মহা পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য ও গৌড় বঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশীয় শ্রীমচ্চৈতন্য সম্প্রদায়ী ভক্তগণ ব্রজভূমে বাস করিতেন। শ্রীপরমানন্দ ভ্রমরবর নামে মহাপ্রভুর জনৈক উৎকল-ভক্ত উৎকল ভাষায় শ্রীমচ্চৈতন্য সঙ্গীতা নাম দিয়া ঐ প্রসঙ্গ ও লীলা সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার গোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তাহার আদর্শ আমাদের বাড়ীতে ছিল। আজি ২৭৷২৮ বৎসরের কথা, কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী বঙ্গের খ্যাতনামা (উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ) এডুকেশন গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বৈকুণ্ঠবাসী প্যারীচরণ সরকার মহাশয় উক্ত উৎকলভাষ্য গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশার্থে ১২৭৫ সালে আমার মাতুল পরম বৈষ্ণব ৺ হরেকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ঐ সনের ১০ম সংখ্যক "হিতসাধক' নামক মাসিক পত্রিকায় কথকাংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মাতুল মহাশয়ের পরম বন্ধু যোড়াশাঁকো নিবাসী বৈষ্ণব-চূড়ামণি ৺ রাধাবিনোদ দাস বাবাজী সংস্কৃত গ্রন্থ খানি ১২৭৬ সালে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশার্থে মাতুল মহাশয়ের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থগুলির প্রকাশ না হইতে হইতেই কালের প্রবাহে একে একে কাল কবলে পতিত হইয়া যোগ্যধামে গমন করায় গ্রন্থগুলি অখোজে গিয়াছে। কে কোথায় যে

রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, এবং পাইবারও আশা ভরসা নাই।

ফলতঃ বৈষ্ণবগ্রন্থ অক্ষয় অব্যয় স্বরূপ। একেবারে পৃথিবী ছাড়া হয় নাই। বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি, ঐ গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি জেলা মেদিনীপুরস্থ শ্রীপাঠ গোপীবল্লভপুরে শ্রীযুক্ত মোহন্ত মহারাজের গ্রন্থ-ভাণ্ডারে আছে।

আমার কোন আত্মীয় ঐ গ্রন্থ আনাইয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। যদি পাওয়া যায়, পশ্চাৎ অন্যান্য বিষয় লিখিব, আজি এই পর্য্যন্ত। শ্রীহারাধন দত্ত।

রমণী-জননী।

* * *

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ।" চণ্ডী।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"
চণ্ডী।

(১)

বিমল আশ্বিন মাসে—দক্ষিণ অয়ন,
কি সৌন্দর্য্য প্রকৃতির নয়ন শোভন।
বহে নদী বক্ষভরা,
বক্ষভরা শ্যামা ধরা
সুজলা শ্যামলা শোভা মুগ্ধ করে মন ;—
কি অপূর্ব্ব মাতৃভাবে পূর্ণ এ ভুবন।

(২)

কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশা—নবমী উষায়—
দূরাগত দিনকর-প্রভায় মিশায় ;
অর্দ্ধচন্দ্র মনোলোভা,
ক্রমে ক্ষীণ—ক্ষীণপ্রভা,
'মাতৃশক্তি' কৃষ্ণপক্ষে বাড়ায়ে ধরায়,
প্রকৃতির মাতৃভাবে আপনি মিলায়।

(৩)

মিলায় তারকামালা উষার আভায় ;
শ্যামল পল্লব মাঝে কচিৎ কোথায়—
স্বপন-জড়িত স্বরে,—
কি যেন সুধা-লহরে,
বিহগী প্রভাতী-রাগে আকাশ জাগায়,—
জাগায় জগত্ যেন জীবনী সুধায়।

(৪)

আবেশে অবশ প্রাণ নৈশ সমীরণ—
প্রভাত-প্রসূন-বাসে ভাঙ্গিয়া স্বপন,
হ'ল যেন সঞ্জীবিত,
উষা রাগে উদ্দীপিত,
প্রফুল্ল হিল্লোলে ছাড়ি মধুর স্বনন,—
প্রকৃতির নির্জ্জীবতা করিছে হরণ।

(৫)

প্লাবি তট স্বচ্ছ-স্রোতে বহিছে তটিনী,
বক্ষভরা—তটে তটে কুল্ কুল্ ধ্বনি!
কি আনন্দ—কি অমিয়া—
কিবা শান্তি বহাইয়া
ভাবময় এ সঙ্গীত গায় কল্লোলিনী,—
মহাগীতে করি এক ত্রিদিব-অবনি!

(৬)

উষার মোহিনী মধু আলোক-ছায়ায়,
অস্ফুট সৌন্দর্য্য কিবা গাম্ভীর্য্যে মিশায়!
মাতার মাতৃত্ব সম,
—বাহ্য-দৃশ্যে ছায়া'পম—
অন্তর সুদীপ্ত সদা সুস্নিগ্ধ বিভায় ;
সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে কিবা মাধুর্য্য ফুটায়!

(৭)

'মাতৃত্ব'-সঙ্গীত মহা গায় ফুলদল—
সৌন্দর্য্যের মহাস্বর্গ—পূর্ণ পরিমল!
শ্যামল বিটপী-চয়,
দেখাতে গুপ্ত-হৃদয়,
ফুটায়েছে ফুল্ল ফুল—শান্তি-শোভা-স্থল;—
ভেদি কাষ্ঠ স্নেহ-উৎস ফুটেছে বিমল!

(৮)

দেখাইছে ঊষা হাসি'—উদ্ভিজ্জ-জগতে,
ধরে কিবা 'সৃষ্টি-শক্তি' পুষ্প-হৃদয়েতে!
ক্ষুদ্র পুষ্প-গর্ভে যত,
যে 'মাতৃ-শক্তি' নিহিত,
তাহে মহা মহীরুহ শোভে ভবিষ্যতে;—
মাতৃত্বের মহা-সিন্ধু নিহিত ফুলেতে!

(৯)

মহিমা-মণ্ডিত পূত প্রভাত-মাধুরী—
অন্তরে 'মাতৃত্ব-সিন্ধু' বিহীন-লহরী;
কিবা স্নিগ্ধ সুকোমল
পূত স্নেহ-পরিমল,
মৃদুল হিল্লোলে আছে প্রকৃতি আবরি;—
দাঁড়ায়ে জাহ্নবী-কূলে কেবা এ সুন্দরী!!

(১০)

ফুটেছে সৈকতে যেন প্রফুল্ল নলিনী!
সৌন্দর্য্য-সমষ্টি কিবা প্রস্ফুট আপনি!
কিবা মূর্ত্তি অচঞ্চল,
কিবা রূপ ঢল ঢল,
লাবণ্যের পূর্ণশোভা মানস-মোহিনী,—
রূপের ত্রিদিব ধরি মর্ত্ত্য-মানবিনী!

(১১)

প্রফুল্ল যৌবনা কিবা সুশ্যামা ললনা,—
নীলাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ী যেন দিগাঙ্গনা!
ফুল্ল নীল-শতদলে—
অরুণ-কিরণ-জালে,
বিকশিত যেন এই বরণ সুশ্যামা;—
কিম্বা ফুটি অগ্নি-গর্ভে সুবর্ণ-নীলিমা।

(১২)

সুধীর মন্থর গতি আবেগ-বিহীনা,
আপন ভাবেতে ভরা—নাহিক ভাবনা;
করুণা-প্রবাহ বক্ষে,
পূর্ণকুম্ভ শোভে কক্ষে—
উচ্ছ্বাসে উথলে শান্তি—আনন্দ ধরে না;
প্রকৃতির প্রতিকৃতি প্রেমেতে মগনা।

(১৩)

রূপের ছটায় দীপ্ত আকাশ-অবনি,
সুধাংশু-বিকাশ-সম সহাস্য-বদনী;
বায়ুভরে দল্ মল্,
চুমে ভাবে পদতল—
বিমুক্ত-কুন্তল-রাশি কৃষ্ণ-কাদম্বিনী;
কল্পনার চারু সৃষ্টি বুঝিবা কামিনী!

(১৪)

দেখিনু দাঁড়ায়ে দূরে অপূর্ব্ব মূরতি,
দূরে গেল মর্ত্ত্যভাব—কামনার ভীতি;
কি যেন কি আলোড়ন,
ভাঙ্গিল হৃদয়-মন,
সহসা মস্তিষ্ক-মাঝে ভাতিল কি জ্যোতি!
হ'ল দূর পাপ-আঁখি—ফুটিল কি প্রীতি!

(১৫)

অজানিত আকর্ষণে ছুটিয়া তখনি
দাঁড়ানু অদূরে ধীরে,—হেরিনু অমনি—
সরলতা অচঞ্চল,
পবিত্রতা নিরমল,—
পদপ্রান্তে কুল্ কুল্ গাহিছে গাঙ্গিনী
'মাতৃত্ব'-সঙ্গীত মহা—কি মধুর ধ্বনি!

(১৬)

হেরিনু বিশাল কিবা রমণী-হৃদয়—
স্নেহ প্রেম করুণার নিভৃত নিলয়;

কিবা ধৈর্য্য—নীরবতা,
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা,
কোমলতা-মমতায় বিশ্ব-পরাজয়,—
কঠোরতা-নির্ম্মমতা চরণে বিলয়।

(১৭)

হেরিতে হেরিতে বুঝি হেরিনু স্বপন,—
নাহি জ্ঞান—একি ধ্যান!—হারানু চেতন;
গেল ভাসি এ সংসার,
হ'ল দূর অন্ধকার,
স্নিগ্ধালোকে বিকাশিত হইল ভুবন;—
রমণীতে এ জগত্ হেরিনু তখন!

(১৮)

হেরিনু—নারীতে 'সৃষ্টি-রহস্য' নিহিত,—
মহতী 'ভাবনা-শক্তি' অন্তরে স্ফুটিত;
এ জীব-জগৎ' ভাবী—
গর্ভে অই আছে শোভি,
বক্ষ-সুধা-ধারে নিত্য জগত্ পালিত;—
কি নীরব আত্মত্যাগে ত্রিলোক বিস্মিত!

(১৯)

হেরিনু—মাধুর্য্যময়ী মোহিনী রমণী,
নিত্য স্বতঃ ঝরে হৃদে স্নেহ-নির্ঝরিণী;
মৃদুহাস্যে মধুরিমা,
নাহি রাগ-গরিমা,
উথলে নেত্রে করুণা—আনন্দ-রূপিণী;—
অমৃতে পূরিত কিবা প্রীতি-মন্দাকিনী!

(২০)

হেরিনু—খেলিছে ঘিরি বালক-বালিকা,
চঞ্চল-কোমল কান্তি-কুসুম-কলিকা;
টানিয়া কভু অঞ্চল,
কভু বা ছিঁড়ি কুন্তল,—
কভু ছিঁড়ি কণ্ঠভূষা কুসুম-মালিকা;—
রমণীআনন্দে হারা—বিহ্বলা লতিকা।

(২১)

হেরিনু আবার—কিবা ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত,
জগৎ-জননী-মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্যপূরিত!
অন্তরে বহে করুণা,
বাহে জ্যোতি অনুপমা,
হৃদি-তেজে ত্রিভুবন বিস্মিত—স্তম্ভিত!
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি হেরি জগৎ নমিত!—

(২২)

দাঁড়ায়ে সম্ভ্রমে দূরে মানব গর্ব্বিত—
দম্ভে দর্পে হৃদি ক্ষত—শোণিত-আপ্লুত;
কত রণ করি জয়,
নাহি পায় কভু ভয়,—
ক্ষুদ্র ফুলে রবি-জ্যোতি দেখিয়া ত্রাসিত!
মহিমায় নত স্বতঃ মস্তক দর্পীত!

(২৩)

হেরিনু—প্রকৃতি-রূপে উচ্চে অধিষ্ঠিত,
না উঠে ইন্দ্রিয়-শিখা—হোথা নির্ব্বাপিত;
পাপচক্ষু ভস্ম হয়,
হয় কামনার লয়;
প্রীতির প্রতিমা নারী যেথা প্রতিষ্ঠিত,
সেথা স্বর্গ—মহাতীর্থ ত্রিলোক-পূজিত।

(২৪)

হৃদয়ের অন্তস্তল সহসা ভেদিয়া,
'মাতৃ-শক্তি'-উৎস প্রাণে উঠিল জাগিয়া,
জাগিল জগৎ-সুপ্ত,
নীরবতা হ'ল লুপ্ত;
জলধি-কল্লোলে বিশ্ব উঠিল গাহিয়া,
'মাতৃত্ব'-মহিমা-গাথা,—হৃদয় মথিয়া!

(২৫)

উদিল কোটি চন্দ্রমা স্নেহ-সুধাময়
অনন্ত এ 'মাতৃ-শক্তি' বহিল ধরায়;
চাঁদে চাঁদে করে গান,
করে বিশ্ব নারী ধ্যান,

জড় ও অজড় গায় রমণীর জয়!
অণু হ'তে বিশ্ব-হৃদি হ'ল নারীময়!

(২৬)

"মাতৃরূপে ব্যাপ্ত একা" হেরিনু রমণী,
অণু-পরমাণু-মুখে উঠে 'মা মা' ধ্বনি।
নারী—দেবী জগদ্ধাত্রী,—
সৃজন-পালন-কর্ত্রী;
গাহিলা বিরাট-মূর্ত্তি পুরুষ অমনি—
রমণী—প্রকৃতি মহা, রমণী—জননী!!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম। (২)

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অসাধারণ উন্নতি ও বিস্তৃতির মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, অনেকগুলি ঐতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রথমে আসিয়া মহাদেশের ইতিহাস খুলিয়া দেখ। এই মহা প্রাচীন দেশ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের মাতৃভূমি; সকল ধর্ম্মের ইহা জন্মস্থান। রাম এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং জিনদেব, অহরুৎ মজুদ এবং অরুন্তীয়া, মুসা ও মহম্মদ, খ্রীষ্ট এবং অপরাপর সমুদয় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আসিয়া মহাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, বা সিংহলে কোনও ধর্ম্মই উৎপন্ন হয় নাই; আসিয়া হইতেই ধর্ম্মস্রোত পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহিয়াছে। আসিয়া ভিন্ন আর কোনও দেশে ভবিষ্যদ্বক্তার বা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। খ্রীষ্টেরও আসিয়ায় জন্ম হইয়াছিল, এবং তিনিও আমাদের ন্যায় আসিয়াবাসী ছিলেন। অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তা, অবতার এবং ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের জন্মের, সহিত খ্রীষ্টের জন্মের প্রভেদ এই যে, যিশু-খ্রীষ্ট দরিদ্র পিতামাতার দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অন্যান্য অবতারেরা ধনবান-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজকুল উজ্জ্বল করেন। রঘুবংশের রামচন্দ্র জগদ্বিখ্যাত রাজা দশরথের পুত্র; মথুরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকুলে জন্ম। বুদ্ধ নিজে মহারাজকুমার; জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাধনশালী বণিক; ইসলাম ধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদ অতি সম্ভ্রান্ত কোরীশকুলের উত্তরাধিকারী; অগ্নি-উপাসকদিগের আদিপুরুষ মহা তেজস্বী-বীর এবং ধনধান্যে কুবেরের ন্যায় সম্পত্তিশালী; কিন্তু দরিদ্র খ্রীষ্টের কুলমর্য্যাদার অভিমান করিবার কিছুই ছিল না। যখন দরিদ্রকুলোৎপন্ন মহাদরিদ্র যিশুর ধর্ম্মের উন্নতি, বিস্তৃতি এবং জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, যখন তাঁহার অনাথ ও নিরাশ্রয় অবস্থার দিকে তাকাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবধর্ম্মের অনন্যসাধারণ দ্রুতগতির বিষয় ভাবিয়া দেখি, তখন মনে মনে একটা মহা-প্রশ্নের সহসা উদয় হইতে দেখা যায়;—

এই দরিদ্র ধর্ম্ম সংস্থাপকের নবধর্ম্মের এত উন্নতি কেন? এই

মহা প্রশ্নের এখনও উত্তর পাই নাই; ইতিহাসে ইহার উত্তর নাই, পাদ্রী প্রভুর প্রচার সভায় ইহার উত্তর পাওয়া অসম্ভব। হিন্দু বা মুসলমানে এই মহা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ; সমর্থ হইলে, হিন্দুর দশা ফিরিত, মুসলমান ধর্ম্মের শতগুণ উন্নতি হইত। অনেকে বলেন, এই প্রশ্নের অনেক উত্তর

আছে; আমি বলি, ইহার এক ভিন্ন দুই উত্তর নাই।

অনেকে হয়তঃ পুরাতন অসার কথা তুলিয়া বলিবেন, "টাকার লোভে বা চাকরীর লোভে অথবা অন্যান্য লোভে পড়িয়া অনেকে খ্রীষ্টান হয়, এইজন্য খ্রীষ্টানের সংখ্যা খুব বাড়ে।" যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণটা প্রথমে শুনিয়া রাখা উচিত। ইহাঁরা বলেন, দুর্ভিক্ষ হইলেই খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে মেষের সংখ্যা শতগুণ বাড়ে, বিবাহের টাকা না থাকিলে অনেকে বিবাহ জন্য খ্রীষ্টান হয়. উপযুক্তা বয়স্থা বা শিক্ষিতা পাত্রী না পাইলে অনেকে খ্রীষ্টান হইয়া আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করে; জাতিচ্যুত হইলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ করা অসম্ভব নয়; অথবা হৃত-সর্ব্বস্ব, অলস, কপর্দ্দক-শূন্য বেকার লোকেরা খ্রীষ্টান হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। কথাগুলি কতদূর সত্য, একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। স্বীকার করি, পেটের দায়ে অনেকে খ্রীষ্টান হইয়াছে; স্বীকার করি, অনেক পতিত হিন্দু বা পতিত মুসলমানে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; স্বীকার করি অনেক কপট ও অসরল লোকে পাদ্রীকে প্রবঞ্চনা করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে যুক্তি বা প্রমাণ কোথায়? সংখ্যায় অধিক হইলে কি গুণে অধিক হয়? তিন শত মজুর বিদ্বান, কি একেলা বিদ্যাসাগর তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান? জেলের এক সহস্র প্রকৃত মনুষ্য কয়েদী অধিক ধার্ম্মিক, কি একেলা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিকতর ধার্ম্মিক উপাধির যোগ্য? "Quantity does not make quality" এই ইংরাজী প্রবাদ সতত স্মরণ রাখা আবশ্যক। মনে কর, এক গ্রামে তিন শত মেথরের বসতি, ইহারা মেথরের কর্ম্ম করে না, মাটী কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; গ্রামের মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান কি বলিতে পারেন যে, গ্রামটা বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, কারণ ইহাতে তিন শত মেথর ভৃত্য আছে? মনে কর, এক গ্রামে দুই শত তাঁতীর বাস, ইহারা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া দিনপাত করে। তুমি কি বলিতে পার, এই গ্রামে খুব ভাল কাপড় পাওয়া যায় এবং বয়ন কর্ম্ম এই গ্রামে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে? স্বীকার করিলাম, তর্কের জন্য মানিয়া লইলাম, পেটের দায়ে গ্রাম শুদ্ধ লোক খ্রীষ্টান হইয়াছে এবং খ্রীষ্টানের খুব দল বাড়িয়াছে; ইহাতে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িল বটে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মৌলিক উন্নতি হইল কি? আমি দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে এবং দেশান্তরে এমন শত শত খ্রীষ্টীয় গ্রাম এবং নগর আছে, যথায় খ্রীষ্টানের মধ্যে খ্রীষ্টের বাস নাই!! সংখ্যায় তাহারা খুব প্রবল, কিন্তু খ্রীষ্টানত্বে তাহারা রত্তি-প্রমাণ শক্তিশূন্য। সুতরাং খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িলে যে খ্রীষ্টানত্বের পরিমাণ বাড়ে, তোমার এ যুক্তি এখানে খাটিতেছে না। আর এক দিকে দেখিতে হইবে, সমগ্র ইউরোপ—সমগ্র আমেরিকা—সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ কি কেবল পেটের দায়ে খ্রীষ্টোপাসক হইয়াছে? একথা হৃদয়শূন্য, মস্তিষ্কশূন্য পাগল ও মিথ্যাবাদী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারে না। দরিদ্র খ্রীষ্ট বিনয়ের অবতার ছিলেন, শান্তি ও প্রেমের তিনি পূর্ণ প্রতিমা ছিলেন; লোভ বা লালসা তিনি জানিতেন না। তিনি নিজে বলিলেন "ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে, ভাত কাপড় আপনা হইতেই হয়।" *First seek*

ye the kingdom of Heaven—and not meals or raiment) খ্রীষ্টের নিকট য়িহুদীরা একবার রুটি চাহিয়াছিল, উত্তরে তিনি বলেন,—I am the bread of Life Eternal"—and not wheat bread. কয়েকজন দর্শককে তিনি বলিয়াছিলেন "ভাত কাপড়ের জন্য আমার কাছে আসিও না।" একজন ধনবান ব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি থাকেন কোথায়? আপনার ঘর কোথায়? খ্রীষ্ট বলিলেন—"The foxes have holes to live in but I have no place to lay my head." (অর্থাৎ—শৃগালেরও বাসের জন্য একটা গর্ত্ত আছে, আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।) যিশুর ধর্ম্মে" কৃষ্ণাক্ষি হোরী অথবা অনন্তসুধাময়ী মদিরা নাই।" খ্রীষ্টের ধর্ম্মে যে স্বর্গ আছে, সে স্বর্গে কামিনী বা তীব্র সুরা থাকে না। খৃষ্ট বলিয়াছেন, আমার ধর্ম্মে যিনি আসিবেন, তাঁহাকে অপমান, নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, কঠোর যন্ত্রণা, দরিদ্রতা অধিক কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে। এ ধর্ম্মের কোনও উপদেশ লেখা নাই যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আসিলে ইহলোকে সুখ মিলিবে। তবে তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টান করা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের একটা অঙ্গ?

অনেকে হয়তঃ বলিবেন, খ্রীষ্ট নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পুরুষ ছিলেন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং সেই বিশ্বাসের বলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মটা খুব ছাইয়া পড়িয়াছে। আমি এ যুক্তিটাকেও অসার বলিয়া বিবেচনা করি। খ্রীষ্টের চরিত্রের উপরে তাঁহার ধর্ম্মের শক্তি নির্ভর করে না। ইতিহাস পড়িয়া কি দেখ নাই যে, চরিত্রবিহীন পুরুষেরা যাহা করিতে পারিয়াছে, অনেক নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মহাপুরুষেরা অনেক সময়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই? প্রতিদিন কি দেখিতেছ না যে, মহানুচেতা যে কার্য্যটা এক বৎসরে করিতে সমর্থ হইতেছে না, একটা মহাদস্যু তাহা একমাসে সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেছে? চরিত্রের সঙ্গে অনেক সময়ে কৃতকারীতার সম্বন্ধ দেখা যায় না। খ্রীষ্টকে একটা অবতার বলিয়া প্রমাণ করতঃ যে সকল লোক বাহাদুরী লইতে চাহেন, তাহারা ভ্রান্ত; আসিয়া দেশে "অবতার" কথাটা এত পুরাতন—এত প্রকাশ্য—যে অবতার কথাটায় আর লোকের ঘুম ভাঙ্গে না। এখানে শত সহস্র অবতারের জন্ম হইয়াছে, এখানে মুসলমানদিগের ১ লক্ষ ৮০ হাজার পয়গম্বর মরিয়াছেন, এখানে য়িহুদিদের মুশা হইতে মালাকী (Malachi) পর্য্যন্ত কেহই অবতারত্বের বাকী রাখেন নাই, এখানে হিন্দুর কোটি কোটি ঋষি মুনির জন্ম, সুতরাং যিশুর অবতার হইবার কথায় নূতনত্ব নাই, এ কথা গাহিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না এবং হইতে পারে না। যে দেশের একটা বৈরাগীও অবতার বলিয়া গণ্য হয়, সে দেশে "অবতার" কথাটা আর তুলিও না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টের চরিত্র বা অবতারত্ব খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে সহায় হয় নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন, "খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার (Miracles) গুণে খ্রীষ্টের খুব যশঃ ও বিস্তৃতি হইয়াছে।" আমরা ও কথায় আস্থা বা গুরুত্ব রাখি না। সত্য বটে লাজেরস (Lazarus) নামে জনৈক য়িহুদিকে যিশু পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকের বোধ হয় এ কথা জানা নাই যে, হিন্দুর গ্রন্থে রাম ও কৃষ্ণের ক্ষমতা

বর্ণনা স্থলে শত সহস্র মৃতের পুনরুত্থানের কথা আছে; শত শত মুনি ঋষি কর্তৃক মৃতের প্রাণদানের কথা বর্ণিত আছে। যিশুর অলৌকিক ক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া আসিয়ার অন্যান্য ধর্ম্মে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি বল এ সকল অসত্য, তাহা হইলে খ্রীষ্টের অলৌকিক-ক্রিয়া প্রমাণ করা সহজ হইবে না। আসিয়ার লোক ইউরোপ ও আমেরিকার লোকাপেক্ষা তর্কে কম নহে, কূট বুদ্ধিতে পূর্ব্বদেশবাসী পশ্চিমদেশবাসীকে সদাই হারাইয়া আসিয়াছে। যে দেশে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের জন্ম, যে দেশে জগতের সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি, যে দেশে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শন, সাংখ্য, কোরাণ, জেন্দাবস্তা প্রভৃতির জন্ম, সে দেশের লোককে তর্কে সহজে পরাস্ত করা সহজ মনে করিও না। অলৌকিক ক্রিয়ার চমৎকারিত্ব পূর্ব্বদেশবাসীর কল্পনায় যেমন আসে, পশ্চিম দেশবাসীর কল্পনায় তাহার অর্দ্ধেকও আসে না, সুতরাং খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার উপরে তাঁহার ধর্ম্মের বিস্তৃতি বা উন্নতির প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় নাই।

অনেকে একথাও বলেন যে, বল প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা হইয়াছে। ইহাপেক্ষা অধিকতর অসত্য কল্পনা আমি আর কখনও দেখি নাই। জগতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্ম বিনা শারীরিক বল প্রয়োগে বিস্তৃত হয় নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইহা মহা গৌরব। ইহা এই ধর্ম্মের মহা ভূষণ ও মহানীতি। একথা বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে, হিন্দুধর্ম্মও একদা বল প্রয়োগে প্রচারিত হইয়াছিল। এ কথায় অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন, এই নবীন আবিষ্কারে অনেক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের "চমক" হইতে পারে, কিন্তু জানা উচিত কথাটা সত্য। ইংরাজী পড়িয়া বা মুসলমানের বক্তৃতা শুনিয়া কথাটা শিখি নাই, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই কথাটা আবিষ্কার করিয়াছি। ঋগ্বেদের অনেক অংশ ভারতে এবং অনেক অংশ আর্য্যের ভারতাগমনের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। সিন্ধুনদ পার হইয়া আর্য্য পিতামহ যখন পঞ্চনদপ্রদেশে (পঞ্জাবে) প্রবেশ করেন, তখন ভারতে অনার্য্য অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের বসতি ছিল। গারো, খসিয়া, গোন্দ, ভীল, সাঁওতাল, লুসাই, লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতি এই অনার্য্য আদিমবাসীদিগের নমুনা। পঞ্জাবে আসিয়া আর্য্যেরা সামবেদ রচনা করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা সর্ব্ব প্রথম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনার্য্যদের যাহারা এই নবাগত মনুষ্যদিগের নবধর্ম্মে বিশ্বাস করিল বা যোগ দিল, তাহাদের ভয় রহিল না, যাহারা যোগ না দিল, তাহারা অরণ্যে বা পর্ব্বতে তাড়িত, দেশান্তরিত, নিহত অথবা প্রহারিত এবং অপমানিত হইতে লাগিল। আর্য্যেরা যুদ্ধ করিয়া অনার্য্যের ভারত কাড়িয়া লইল; আর্য্যেরা যুদ্ধ করিয়া অনার্য্যের অপধর্ম্ম উড়াইয়া দিয়া আপনাদের নবধর্ম্মবীজ বপন করিল। কেবল তাহাই নহে, নিজের ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম রক্ষা জন্য হিন্দু কখনও শাণিত তরবারি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করে নাই। বৌদ্ধেরা বাড়িয়া উঠিল, প্রমরবংশের রাজারা অমনি বৌদ্ধদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিল। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম হইল, কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই করিতে পারিল না, হিন্দুর দৌরাত্ম্যে ভারত ছাড়িয়া বৌদ্ধেরা চীন,

স্যাম, জাপান, প্রভৃতি দেশে ধ্বজা গাড়িল। জৈনদের সঙ্গে হিন্দু লড়িয়াছে, আবু পাহাড়ের মন্দিরে তাহার প্রমাণ দেখ। রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, জৈনের সহিত হিন্দুর সর্পে নকুলে সম্বন্ধ! হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে "জৈনের মন্দিরে প্রবেশ করিও না।" মহারাষ্ট্র হিন্দুরা ধর্ম্মের জন্য মুসলমানের সঙ্গে শতবার লড়িয়াছে। তবে তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, হিন্দু ধর্ম্ম পাশবিক বলে প্রচারিত বা রক্ষিত হয় নাই? বৌদ্ধধর্ম্ম পরিপোষণ করিতে অশোক প্রভৃতি রাজা ছিল, মহম্মদের ধর্ম্মের পোষকতা জন্য ধন, ধনবান লোক, সেনা, অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়ই ছিল; খ্রীষ্টের ধর্ম্মের কে পোষক ছিল? এখন ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টান সম্রাট আছে বটে, কিন্তু তখন কে ছিল? তখন কে খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে পোষণ করিয়াছিল? খ্রীষ্টধর্ম্ম যত বিঘ্ন পাইয়াছিল, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যত বৈরী জন্মিয়াছিল, যন্ত্রণা, দরিদ্রতা, হত্যা, নির্য্যাতন প্রভৃতির মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যেরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল, পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্মের সেরূপ হয় নাই। "বল প্রয়োগে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে," এ কথা পাগল ভিন্ন আর কেহ বলিতে সাহস করে না।

কেহ কেহ বলেন, বাইবেলের বলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাইবেল কি আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক অশ্ব? ইহা কি পরশপাথর? ইহা কি আলা উদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ? আমার বিবেচনায়, বাইবেলের প্রচারে বা বাইবেল-বর্ণিত কথার প্রচারে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম শক্তিশালী হয় নাই। সত্য বটে, বাইবেল জগতে এক মহামূল্য গ্রন্থ; ইহাতে ব্রহ্মবাক্য আছে, তাহাও স্বীকার করি; স্বীকার করি, বাইবেল পড়িয়া অনেকের ভ্রম ঘুচিয়াছে ও মন ফিরিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আসিয়া দেশবাসীর নিকটে বাইবেল একটা নূতন পুস্তক নহে। বাইবেল হইতে যে সকল আশ্চর্য্য কথা তুমি শুনাইতে চাও, তাহাতে লোকের চমৎকৃত হইবার কারণ নাই, যেহেতু সে সকল কথা আমাদের নিকটে প্রাচীন ও সাধারণ। পশুরাজ সিংহ গহ্বরে দানিয়েলের প্রাণ রক্ষা, সাদ্রেক প্রভৃতির জলন্ত অগ্নিতে জীবন রক্ষা, আব্রাহাম কর্ত্তৃক আইজাকের প্রাণোৎসর্গের চেষ্টা, খ্রীষ্টের বিশ্বরূপ দর্শন (Transfiguration of Christ) লেজারসের পুনরুত্থান, যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষের নাশ, কাণা খোঁড়ার জন্ম রোগের আরোগ্যদান, বিবাহোৎসবে জলকে মদিরারূপে পরিণত করা, দশাজ্ঞা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা আসিয়ার অখ্রীষ্টান প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে কোনও না কোনও ভাবে সন্নিবেশিত আছে। বাইবেলের উচ্চ অঙ্গের সুনীতির কথা হিন্দু শাস্ত্রে আছে। ক্রুশে (Cross) খ্রীষ্টের মৃত্যু নূতন কথা নহে; হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের হস্তে ত্রিশূলাঘাতে মরিয়াছিলেন! তাহাই ক্রুশের আকৃতি!

এখন দেখা গেল, তোমরা যে সকল কারণকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি, জয় ও বিস্তৃতির কারণ বলিতেছ, তাহা বাস্তবিক কারণ নহে। মৌলিক কারণটী তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আইস, আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের এই উন্নতি মহীরুহের মূল অনুসন্ধান করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

লালা রামগতি রায়।

রামগতি কৃত "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থের বিবরণ—"আনন্দময়ী" শীর্ষক প্রবন্ধে* পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন গ্রন্থখানা কিরূপ ভাবে বিরচিত হইয়াছিল, তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কবি গ্রন্থাবতারণায় বেদ-প্রতিপাদ্য,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিনকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া আবার এক ঐশীশক্তিই যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামের অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা লিখিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

"এক নিরঞ্জন প্রভু শিব শক্তিময়।
বিভিন্ন নাহিক তাথে পরম নিশ্চয়॥
*   *   *   *
সর্ব্বময় সর্ব্বাতীত পর নিরঞ্জন।
ধ্যান করি প্রণাম করহ সদা মন॥"

তৎপরে সংসার যে কিরূপ ভয়ানক স্থান,—কি করিতে আসিয়া কি করিলাম, ভাবিয়া কবি ব্যাকুলচিত্তে তাহার এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে দেখাইতেছেন ;—

"সংসার সমুদ্র ঘোর অলক্ষ্য অপার।
মায়া নির হীন তীর পরম দুস্তর॥
শোকের তরঙ্গ তাহে,—দুঃখের লহরী।
মকর কুম্ভির তা'হে রোগ আদি করি॥
রত্ন লোভে যত্ন করি তাহাতে মজিলে।
রত্ন না পাইলে, আর তরঙ্গে ডুবিলে॥
*   *   *   *
"আশা শল কাতে বদ্ধ জীব নানা মত।
বিষচ তাহাতে সর্পি সিক্ত অবিরত॥
রাগদ্বেষ-অনলেতে সুপক্ব আহার।
অন্তে কাল গ্রাস করে তক্ষণ তাহার॥"

তৎপর জীব কিরূপ অন্যায় করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছে, তাহার চিত্র। তৎপর নিজ বিষয় ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন ;—

"ভ্রমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ।
মায়ামৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ॥
*   *   *   *
অহিকে মজিয়া লোক পারত্রিকে ভোলে।
মৃগ যেন কাল নিদ্রা শার্দ্দূলের কোলে॥
*   *   *   *
পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয় কাল।
কাটিতে না পারিলাম মহামায়া জাল॥"

তৎপর সম্পদ ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা ভাবিয়া বলিতেছেন ;—

"স্বপ্নবৎ সম্পদ না রহে চির দিন।
যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন॥"

এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনের প্রতি যাহার অত্যধিক ঘৃণা জন্মিল, তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

"ওরে মন কুগমন কুপথের পথি।
কুপথে যাইতে বল কে তোমার সাথী॥
বুদ্ধি পাশে হস্ত পদ বান্ধিয়া তোমার।
ধৈর্য্যতার গিরি বুকে চাপাইব তায়॥
ক্ষমার মন্দিরে বন্দি করিয়া রাখিব।
চেতন প্রহরী তথা সতর্ক করিব॥
যখন নয়ন জলে অধর তিতিবে।
আপনার কর্ম্মফল তখন পাইবে॥
নহে ত অবোধ মন আপনা ভাবিয়া।
ছাড়হ কুপথ চল সুপথ ধরিয়া॥"

এই সকল কটুবাক্যে মন নিতান্ত অধীর হইয়া,—জীবকেই সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়া কোপভরে তাহার নিকট উপনীত হইল। মন জীবের রাজসভাটী যেরূপ দেখিল, কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ;—

* "ভারতী" ১৩০৪,—জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

"কোপে অতি শীঘ্র গতি মন চলে যায়।
যথা বসে নানা রসে সদা জীব রায় ॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তারি রম্য পুরী তথায় আপনি ॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী।
দম্ভ পাটে বেসে টাটে করি পরিপাটি ॥
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার ॥
শান্তি ধৃতী ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী।
ঘৃণা করি রাজপুরী নাহি যায় চারি।
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতাশী।
নারীসঙ্গে রতিরঙ্গে রসের প্রসঙ্গে।
এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে ॥"

তৎপর জীবের সহিত মনের এক পশলা বাদানুবাদ চলিল;—একে অন্যকে দোষী স্থির করিতে—অনেক আইন নজীর দেখাইল। কিন্তু মনই পরাস্ত হইল। কারণ স্থির হইল, সমুদয় কার্য্যের মূল মন;—যদি তাহা ঠিক থাকে, তবে জীবকে কোন প্রবৃত্তিই আয়ত্ত করিতে পারে না,—দুর্ভেদ্য অচলের ন্যায় সে সর্ব্বদা অটল থাকিতে পারে। কিন্তু মনস্থির করা বড়ই কষ্টসাধ্য;—

"অচল লঙ্ঘন কিম্বা অনল ভক্ষণ।
তাহা হতে শতগুণ মন নিবারণ ॥"

দীপ শিখা যেমন প্রমুক্তাবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারে না,—তদ্রূপ মনও চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম। অথচ মন স্থির না হইলে সাধনা সিদ্ধ হইবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং জীব ঘোরতর সমস্যায় পড়িয়া দিশাহারা হইল,—অনেক চিন্তার পর স্থির হইল,—যোগাভ্যাসই মনস্থির করিবার একমাত্র উপায়। তাই জীব সাদরে অচিরে সেই পথের পথিক হইয়া, সংগুরু কৃপায় প্রমত্ত মনকে আয়ত্ত করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করত চিদানন্দে মগ্ন হইয়া গেল। "ঘেরণ্ড সংহিতা," "গোরক্ষ সংহিতা," "বশিষ্ঠ সংহিতা," "যামল" প্রভৃতি হইতে যোগের প্রচুর উপকরণ ভক্ত ও কর্ম্মী কবি দ্বারা অতি দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা উহাতে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং "খ'গে তাঁতির তসরে হস্তার্পণ" করা অবিধেয় বোধে তাহার কোন আলোচনা করিলাম না।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত গ্রন্থখানা "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের পদ্মানুসরণে লিখিত। অনেক সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ণানুবাদ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু কবি যেরূপ সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে সুকৌশলে তাঁহার কবিতা-পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া গিয়াছেন, এবং আধ্যাত্মিক ভাবের কঠিন কঠিন সমস্যা সুশৃঙ্খলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া যথার্থই তাঁহাকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা জন্মে।

এখন গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটী ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। রামগতি স্বীয় পিতা ও বাসস্থানের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন;—

"ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদজ্ঞানী বিস্তর ॥
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতীর স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালাখ্যাতি পেল নিজামতে ॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয় ॥
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয় ॥"

বিদ্যা, বিভব, কুলকার্য্য, দান, কীর্ত্তি, প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে লালারাম প্রসাদ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরাও পিতার অনুরূপ পুত্রই ছিলেন। কিন্তু জনকের মৃত্যুর

পর রামগতি সংসারের আপাত-সুখকর কার্য্যে অধিক দিন লিপ্ত থাকেন নাই। সংসারের অসার কার্য্য সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মন দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মিথ্যা অষ্টপাশে * বদ্ধ হইয়া আর এই সংসারে ঘুরিতে ভাল লাগিল না। ক্রমে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রামগতির মাতা সুমতী দেবী খররিয়া-নিবাসী বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুবংশীয় গঙ্গারাম রায়ের কন্যা। সকলে ঐ রায় মহাশয়কে "গীরঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। "গীরি, পুরী, ভারতী" প্রভৃতি উপাধী সন্ন্যাসাশ্রমে প্রসক্ত হইয়া থাকে। গঙ্গারাম ধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ বলিয়াই 'গীর' উপাধীতে পরিচিত ছিলেন। সুমতী বাল্যকাল হইতেই পিতৃ আদেশে প্রাতঃস্নান প্রভৃতি কথকগুলি আচার প্রতিপালন করিতেছিলেন। রামগতি আবার মাতার নিকট ঐ সকল বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা সর্ব্বদা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন;—"বৎস! বৃথা বাহ্য প্রাতঃস্নান কিম্বা তীর্থ পর্য্যটনে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না। যদি মন শুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন ও ভগবানে আত্ম সমর্পণ না করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানই বৃথা জানিবে।" এই উপদেশ বাক্য রামগতির চিত্তে চিরনিহিত ছিল, তাই তিনি পরিণত বয়সে বলিয়াছেন;—

"মন যার শুচি নয় শুচি তার দূর।
সহস্র স্নানেতে শুদ্ধ হয় কি কুকুর॥
অনাচারে চরে মন নহে মলাহীন।
চর্ম্মধৌতে নহে দূর মনের মলিন॥
এথা তীর্থ ওথা তীর্থ নানাদেশ ঘুরে।
নবদ্বার পুরে সর্ব্বতীর্থ নাহিস্মরে॥"

এস্থলে তাঁহার একটী শিশু কালের ঘটনা উল্লেখ করিব, যাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছিল, পরিণত বয়সে রামগতি একজন মহাপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইবেন। রামগতি শৈশবে আপন খুল্লপিতামহ রঘুনন্দন রায়ের বাগান হইতে নেবু ইত্যাদি না বলিয়া আনিতেন। এক দিন ভর্ৎসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"দাদা মহাশয়! এখন ফলগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাত্রা কর।" শিশুর এই বাক্য তাঁহার কর্ণে দৈববাণীর ন্যায় বোধ হইল; তখন তিনি সস্নেহে পৌত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন;—"ভাই! তাহাই হইবে।" ঐ দিবস তিনি আর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। পর দিবস সকলে দেখিল,—বৃদ্ধ রঘুনন্দন গৈরিক বসন পরিয়া প্রফুল্লমুখে কাশী যাত্রা করিলেন। খুল্ল পিতামহের এই দেবমূর্ত্তি শিশু রামগতির মনে যেন একটী নব স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়া গেল। অশান্ত রামগতি তদবধি প্রবীণের ন্যায় সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

আমরা রামগতি রায়ের উদারতা ও বদান্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার কনিষ্ঠ লালা জয়নারায়ণ উশৃঙ্খলতা নিবন্ধন ঋণজালে জড়িত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ কলিকাতা নিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মাত্র অধিকারী ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ লালা রাজনারায়ণ আপন অংশ হইতে কিছুমাত্র অংশ ছাড়িয়া দিতেও অসম্মত হইলেন। এদিকে কিন্তু বসু মহাশয় জয়নারায়ণের কথার উপর নির্ভর করিয়াই

* "ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা যুগুপ্সা পঞ্চম।
কুলজাতি শীল অষ্ট পাশের নিয়ম॥"

কিছুমাত্র দলিলাদি না লইয়াই পূর্ব্বে মূল্যের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন; এখন জয়নারায়ণ আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা—সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিক্রয় অঙ্গীকার রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন। এমন কি, সংসার পরিত্যাগ করিতেও কৃত-সংকল্প হইলেন। তৎশ্রবণে জ্যেষ্ঠ রামগতি কনিষ্ঠ রাজনারায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! জীবন বা অর্থ চিরকালের জন্য নয়,—এই অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির জন্য ভ্রাতৃ-পরিত্যাগ কথনই কর্ত্তব্য নয়। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধ বচনে সর্ব্বানুজকে সম্মত করিয়া, বসুদিগকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতেও রামগতির মন প্রবোধ মানিল না, জয়নারায়ণের শোচনীয় দশা দর্শনে অবশিষ্ট সম্পত্তি সমান তিন অংশ করিয়া তাহার একাংশ তাহাকে প্রদান করিলেন। যে সম্পত্তির জন্য, পিতা পুত্রে, ভাই ভাই নিরন্তর মনান্তর, এমন কি, একে অন্যের প্রাণনাশ করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না, সেই বিভবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার আবদার ও সম্মান রক্ষা করিয়া রামগতি যথার্থ মহানুভবতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রামগতি সিদ্ধকাটী নিবাসী হিন্দুবংশীয় সদ্বৈদ্য রাধাকান্ত রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ক্রমে চারিটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। প্রথমা কন্যা আনন্দময়ীর বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার এবং তদীয় পিতৃস্বসা সর্ব্বেশ্বরী দেবীর বিবাহে পিতামহ লালা রামপ্রসাদ বিপুল অর্থব্যয়ে 'করণ' (চন্দন) কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, যাবতীয় ঘটক, কুলীন নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র সন্নিবেশ করেন। মহারাজা রাজবল্লভ স্বয়ং সেই কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বেশ্বরী দেবীর পয়গ্রাম-নিবাসী হিন্দুবংশীয় রামধন সেনের সহিত পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। লালা বংশের যাবতীয় বিবাহকার্য্য সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, সেনদিয়া, খান্দারপাড়, কাজলীয়া, সিদ্ধকাটী, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত চলিয়া আসিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর রামগতি অপর তিন কন্যা ও পুত্রের বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া সংসারের কার্য্য একরূপ পরিসমাপ্ত করেন। এখন আর তাঁহার কোনই বৈষয়িক কামনা রহিল না; ইতিপূর্ব্বেই সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এখন তিনি প্রকৃত সাধকরূপে সংসারমুক্ত হইবার জন্য আপন ইষ্টদেবকে ভক্ত্যুদ্বেলিত ত্রাহিরবে ডাকিতে লাগিলেন।

"শশী শূল মৃগধর, কৃপাদৃষ্টি দীনে কর,
ত্রাণ কর দেব পশুপতি।
সংসার-তিমির ঘোরে, মহাঘূর্ণা সদা ঘুরে,
উচ্চরবে ডাকে রামগতি।"

ভক্তবৎসল আশুতোষ ভক্তের ডাকে পরিতুষ্ট হইলেন,—ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইল,—তিনি রামগতির মনে স্বর্গীয় আলোক উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। রামগতি সেই আলোকে আপনার গন্তব্য পথ দেখিতে পাইয়া, সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করতঃ স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি যাবতীয় স্নেহের বস্তু বিসর্জ্জন দিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

রামগতি সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত "অভয়া (কালী) বাড়ী"তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুরসিদাবাদ অবস্থিতি কালীন, গঙ্গাবক্ষে এক যোগীপুরুষকে অন্তর্দ্ধৌত করিতে দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; তখন সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"সময় হইলে আমি আপনিই তোমার বাসনা পূর্ণ

করিব,—এখন তুমি সংসারী,—তৎকার্য্য সমুদয় যথাযথ নির্ব্বাহ কর।" বাস্তবিকও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সেই মহাপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এই সময়ে তাঁহাকে যোগশিক্ষা দিয়াছিলেন। রামগতিও সদ্‌গুরুর কৃপায় অল্প দিন মধ্যেই যোগপারদর্শী হইয়া স্বয়ং অন্তর্ধৌত দ্বারা আভ্যন্তরিক নাড়ীভুড়ী বাহির করিয়া ধৌত করতঃ আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি "কুম্ভক" অবস্থায় দুই হাত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উপাসনা করিতেন, ইত্যাদি অনেক ঘটনা তৎসম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায়। যাহাই হউক, তিনি এই সময়েই যোগীমহাত্মার উপদেশে "যোগকল্প-লতিকা" নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। *

বড় লোকের সন্তান ও সুখের ক্রোড়ে নিয়ত প্রতিপালিত হইয়াও রামগতি অভ্যাস গুণে অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মাত্র বারিপানে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি যোগাভ্যাস করিতেন, সেই স্থানে একটী নিম্ববৃক্ষ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত থাকিয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত তাহার পুণ্য-কাহিনী দর্শকদিগকে বিদিত করিয়াছিল। ৺ অভয়া দেবীর শান্তি নিকেতনে যে একবার পদার্পণ করিয়াছে, শিব, শক্তি, ঐ নিম্ববৃক্ষ ও শাণবান্ধান বিরাট জলাশয় দর্শনে তাহার মনে স্বতঃই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। হায়! আজ সেই পুণ্যধাম কোথা? লালাবংশের প্রচুর কীর্ত্তি সহ তাহা আজ "কীর্ত্তিনাশা" নদী গর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। লালাবংশধরগণ আজ নিরাশ্রয়, তথাপি তাঁহারা পিতৃপুরুষের ইষ্টদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজও যথাসাধ্য অর্চ্চনা দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। দেবদেবী সকলও তাহাদেরই মত ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরচ্যুত হইয়া, এখন কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন। হায়! মা! অভয়ে! জগতের পরিবর্ত্তন কি এইরূপেই সংসাধিত হইয়া থাকে?— পতিত বংশের কি আর মা! উদ্ধারের উপায় নাই?

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রামগতি কালীঘাটে গমন করিয়া বহু দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথাকার হালদারগণ তাঁহাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলায়, তিনি কালীঘাট পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী "চেতলা" নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। কিন্তু সেই হালদারগণের প্রতি আবার রামগতিকে কালীঘাটে আসিবার জন্য মায়ের আদেশ হইলে, তাঁহারা রামগতিকে পুনরায় কালীঘাটে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামগতি কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন না;—বলিলেন,—এই বিশ্বরাজ্য সমস্তই মায়ের, শুধু কালীঘাট তাঁহার সীমাবদ্ধ স্থান নহে,—আমি আর কালীঘাটে যাইব না, যথায় থাকিব, তথায়ই তাঁহাকে পাইতে পারিব।" তৎপর রামগতি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ৺কাশীধাম গমন করেন; তথায় তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধি হয়। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনার অন্তিম কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী মৃত্যুর প্রাক্কালে,—প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। নবতি বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটনা হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কাশীর মহা শ্মশানে তৎসহ অনুমৃতা

* পূর্ব্বে অন্য পত্রিকায় আনন্দময়ী শীর্ষক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে, "হরিলীলা" "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। "যোগকল্প লতিকা" সংগ্রহ উহার কিঞ্চিৎ পরে রচিত হয়।

হইয়া পতির সহিত সুখময় অনন্তধামে প্রস্থান করেন।

পাঠক মহাশয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় এই স্থানেই এই মহাপুরুষের জীবনী পরিসমাপ্ত করিলাম। রামগতি যে কিরূপ কবিত্ব ও উচ্চ প্রকৃতি লইয়া ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এতৎ পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে। সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করি, আমাদের তেমন ক্ষমতা বা সময় কোথায়? রামগতি শুধু কবি নহেন,—তিনি প্রকৃত পক্ষে সাধক ও কবি দুই ই। তিনি নিজ জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছেন,—নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন,—যাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা, তাহাই তিনি স্বীয়গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ভাষার গুণে, ভাবের কুহকে তাহা মধুর হইলেও ভক্তের প্রাণের কথা বলিয়া তাহা আরও মধুরতর হইয়াছে। যখন "বিদ্যাসুন্দর" "কামিনীকুমার" প্রভৃতি আদি রসের উৎসগুলি উদ্ভূত হইয়া প্রত্যেক বঙ্গ পল্লীকে ভাসাইয়া দিতেছিল,—প্রত্যেক নব যুবককে কামোদ্দীপক বটিকার ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এই প্রবৃত্তি সংযমী মহাপুরুষ নৈতিক জ্ঞানের জন্য এই "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জানিনা, গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইলে, বঙ্গবাসী উহার কতদূর সমাদর করিবে।

শ্রীরমাকান্ত গুপ্ত।

তমোলুক-ইতিহাস (২)।

মহাভারতীয় কাল।

মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ। * * *

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।

মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩

* * *

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ॥ ২৩

ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি।

এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।

বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভে দ্যতম্॥২৪"

ইত্যাদি পর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি রাজনামকীর্ত্তন অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। (৩৩)

অর্থাৎ—"ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ * * *

কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * *

ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।" (৩৪)

অধিকন্তু মহাভারত সভাপর্ব্বে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।

পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥ ২১

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরঃ বাসুদেবং মহাবলম্।

কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।

নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩

সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।

তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা॥ ২৪

(৩৩) মহাভারতম্ আদিপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৪৮২-৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৪) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ॥ ২৫"
ইতি সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ (৩৫)

অর্থাৎ—"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধিশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (৩৬)

উক্ত সভাপর্ব্বে 'রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধনপ্রদান" প্রসঙ্গেও লিখিত আছে ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃপত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্ত রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ॥ ১৯
ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ॥২০
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা॥ ২১"
ইতি সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন সন্তাপে
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ (৩৭)

অর্থাৎ—"বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বারপ্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।" (৩৮)

অপিচ মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদা নদীর নাম ও জনপদের নাম-কীর্ত্তন কালেও তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—

"কঙ্কা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ।
কিরাতা বর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ৫৭"
ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বণি ভারতীয় নদ্যাদি কথনে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ (৩৯)

আরও মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে বীরবর্গ পরিপূজিত পরশুরামের যুদ্ধ-বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"ভৃগো রামাভিধাবেতি যদাক্রন্দন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ততঃ কাশ্মীরদরদান্ কুন্তিক্ষুদ্রকমালবান্॥ ৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
রক্ষোবাহান্ বীতহোত্রান্ ত্রিগর্ত্তান্ মার্ত্তিকাবতান্॥ ১০
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্ব্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥ ১১"
ইতি দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজিকে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। (৪০)

অর্থাৎ—"হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এইকথা বলিবামাত্র তিনি (পরশুরাম) একান্ত ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" (৪১)

(৩৫) মহাভারতম্ সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৬) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত সভাপর্ব্ব, ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৭) মহাভারতম্ সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৮) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৯) মহাভারতম্ ভীষ্মপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪০) মহাভারতম্ দ্রোণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ১২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪১) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব, ৯৮ পৃষ্ঠা, এবং Muir's Sanskrit texts, vol. I, p. 459 দেখ।

আবার মহাভারত কর্ণপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥ ১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥ ৩
শরতোমরনারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে ॥ ৪
* * * *
অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষ্যাতনুচ্ছদৈঃ।
মিমর্দ্দিষন্তস্ত্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ২০
মেকলোৎকলকালিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥ ২১"

ইতি কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ। (৪২)

অর্থাৎ—"হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করত পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * * হস্তি শিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল।" (৪৩)

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে,—"দ্বাপরের অবসান সময়ে নিখিলবীরবিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের সেই ভৈরব সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে ভগদত্ত অস্মদ্দেশের একজন প্রধান নরপতি ছিলেন। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সংগ্রাম-ভূমে অবতীর্ণ হয়েন। কয়েক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ভগদত্ত সমরশায়ী হইলেন। অঙ্গরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তি দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে ও পুণ্ড্রাধিপতি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পরাজিত হইলেন।" (৪৪)

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

"যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্র-ব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট

(৪২) মহাভারতম্ কর্ণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৩) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৪) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথমখণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি, কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এদিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধ শরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিনী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।

পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত।" (৪৫)

'ইহার প্রাচীন মন্দির বহুকাল হইল নদীর গর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে মন্দির বর্ত্তমান আছে, তাহা ৪।৫ শত বর্ষ পূর্ব্বে এক গোপাঙ্গনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে।' (৪৬) রাজপ্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে এই দেবতাদ্বয়ের সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

উক্ত ঘটনা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতেও উল্লেখ রহিয়াছে। যদিও মূল সংস্কৃত মহাভারতে কিম্বা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাবু চন্দ্ বাহাদুরের মহাভারতে, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে অথবা বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারতে ইহার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু জিষ্ণুহরি দেবতাদ্বয় এই স্থানে বিরাজিত থাকিয়া ময়ূরধ্বজের কীর্ত্তিকে স্মরণপথে উদয় করিয়া দিতেছে; তদ্দৃষ্টে এই স্থলেই উক্ত ঘটনা হইয়াছিল, সহজ জ্ঞানে

(৪৫) জৈমিনি ভারত, ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। বিবেক,ব, ৬৯০ ও ৬৯১ পৃষ্ঠা। তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ ৬,৭,৮,৯ পৃষ্ঠা এবং List of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal, pp. 23-25 পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৬) A Statistical Account of Bengal, vol. III, p. 66

বিশ্বাস করিতে বাধা প্রদান করে না। বরং পূর্ব্বকালে এই দেশটী রত্নপুর বা রত্নাবতীপুর বলিয়া উল্লিখিত হইত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে ইতিহাস প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। হণ্টার সাহেবও বলেন, 'কাশীদাসের মহাভারতের উল্লিখিত রত্নাবতী এই স্থানে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, এবং ঐ নাম তমোলুকে এখনও একবারে লোপ হয় নাই।' (৪৭)

আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু অঘোরনাথ দত্ত মহশায় শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে কি উত্তোলন করিয়াছেন, দেখুন—

"পুরা, দ্বারবতী মধ্যে গোষ্ঠী মধ্যে গতোঽর্জ্জুনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ। ভূতলমধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতু মিচ্ছামি দেবেশ তন্মমে প্রীতিকৃত্তমা।
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্মী যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং হি নত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥"

অর্থাৎ—পুরাকালে দ্বারাবতীর (দ্বারকার) সভামধ্যে অর্জ্জুনের উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, "হে প্রভো! আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এবং সেই বিষয় শুনিতে আমার অতিশয় প্রীতি হয়।" কমললোচন কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।" (৪৮)

এতদ্দারা মহাভারতের সময়ে তাম্রলিপ্ত নগরী যে বিশেষ গণনীয় ছিল, সপ্রমাণ হইতেছে। কেননা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে গমন, পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে গমন ও তথায় সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সহস্র হস্তী প্রদান সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।

ক্রমশঃ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত

কি লিখিব?

কোন এক সভার কার্য্যবিবরণে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এই কয়েক পংক্তি ছিল—

"প্রজারা ঋণে ডুবিয়াছে, জমিদারের খাজনা বন্ধ, ভাদ্র মাসে এক টাকার সুদে দুই কাঠা ধান দিতে হইবে, এই করারে অনেক টাকা ঋণ করিয়াছে। মহাজনের গৃহ তামা পিত্তল, রূপা সোণায় পূর্ণ। এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে, অনেক পরিবারের পুরুষ, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, অনেকে ভিটা ছাড়িয়াছে, অনেক মা, কন্যা ফেলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মানুষ বিক্রয়ের কথাও শুনা গিয়াছে।"

একজন উকীল এই অংশ রিপোর্ট হইতে তুলিয়া দিতে প্রস্তাব করেন এবং আর এক জন উকীল তাঁহার পোষকতা করেন। তাঁহারা বলেন, যে দিন কাল পড়িয়াছে, এরূপ লেখায় রাজা বিরক্ত হইতে পারেন, সুতরাং কাজ কি গোলে, এ অংশ তুলিয়া দেওয়া হউক।

উকীলগণ আইন কানুন জানেন, সুতরাং তাঁহাদের ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। এই-

(৪৭) "288. Supposed to be referred to as Ratnavati in the Kasidas, or Bengal recession of the Mah abharat, Aswamedh-parva. The local name of Ratnabati still survives at Tamluk,—"
Vide Hunter's Orissa, vol. p. 309.

(৪৮) প্রতিমা, প্রথমভাগ, ১৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

রূপ লেখাতেও যদি রাজার অসন্তোষের কারণ হয়, তবে আর আমাদের কাগজে লিখিয়া ফল কি ? সত্য কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হইবে, প্রতি পদে পদে ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে, দেশের অবস্থা যদি এরূপ শোচনীয় হইয়াই থাকে, তবে ভারতবর্ষের সকল পত্রিকা তুলিয়া দেওয়া উচিত কি ? অথবা কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসনের ভয় না করিয়া নির্ভীকতার সহিত সত্য কথা বলা উচিত ? একথার একটা মীমাংসা হওয়া ভাল।

ভারতবাসী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের একান্ত পক্ষপাতী। সে এই জন্য যে, আর কোন গবর্ণমেণ্টই স্বাধীনতাব এমন পরিপোষক নন। গবর্ণমেণ্ট কি কাবণে যে, রজ্জু দৃষ্টে সর্প-ভ্রমে পতিত হইয়া, ভারতে যাহা কখনও ঘটে নাই, এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়া সংবাদপত্রের, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। দুর্জ্জয় গবর্ণমেণ্ট কেন ভীত হইয়া পদে পদে বিভীষিকা দেখিতেছেন. কে জানে ? বোধ হয় যেন, দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা মন্ত্রী-সভায় হ্রাস হইয়াছে ; নচেৎ ভারতবর্ষের ন্যায় রাজভক্ত প্রদেশে "রাজ-বিদ্রোহের আইনানুসারে কেন কার্য্য আরম্ভ হইল ? আমরা ভাবিয়া আকুল হইয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। * বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে অবস্থা, তাহাতে রাজ-বিদ্রোহ একেবারে অসম্ভব। আমরা সামান্য লোক, আমাদের এই ধারণা। প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-সভায় কত প্রবীণ, বিজ্ঞ, তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যে কেন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাতে আমরা ব্যথিত এবং চিন্তিত হইয়াছি। ভয় করিবার কি আছে ?

গোখলে এবং ভবনগরীর ন্যায় কাপুরুষ, অন্ধবিশ্বাসী, অসহিষ্ণু এবং অকৃতজ্ঞ লোক যে দেশে বহু আছে, সে দেশে গবর্ণমেণ্টের ভীত হইবার কারণ নাই। ভারতবাসী এত ভীত ও কাপুরুষ যে, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মাত্রে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সত্য রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে যতদিন ভারতবাসী না শিখিবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়ের কারণ নাই। ভারতবাসীর সাহসের কথা মনে হইলে, আমাদের হাসি পায় এবং একটী গল্প মনে পড়ে। গল্পটী এই—"এক সময়ে একজন ইংরাজ দেখিয়া একজন লোক খুব আস্ফালন করিয়া বলিতেছিল, 'আমি কি সাহেব দেখিয়া ডরাই ? কাছে আসিয়া অত্যাচার করিলেই দেখাইব।' সাহেব যখন ঘুসি তুলিয়া ঐ লোকের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সাহসী ব্যক্তি দৌড়াইয়া পলায়ন-তৎপর হইয়াছে দেখিয়া লোকেরা বলিল, 'কেমন, এখন পলাচ্ছ কেন ?' সাহসী ব্যক্তি ফিরিয়া বলিল—'পলাইব না কি সাহেবকে দেখিসা ভয় করিব ?' গোখলের আস্পর্দ্ধা ও আস্ফালন এবং পরে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার সহিত এই গল্পটীর খুব সাদৃশ্য আছে। গোখলে এবার ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা স্মরণে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার ধূর্ত্ততা ও কাপুরুষতার জাতীয় মহা-সম্মিলিত

* রাজবিদ্রোহ আইনে এই কয় জন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন। (১) মারহাট্টা ও কেশরী সম্পাদক মাননীয় তিলক। (২) বৈভব-সম্পাদক মিঃ কেলকার (৩) ইসলামপুরের প্রকাশিত প্রতোদ-সম্পাদক রামচন্দ্র নারায়ণ কসলকার (৪) ওয়াই নগরে প্রকাশিত মধ্যবৃত্ত-সম্পাদক কাশীনাথ শাস্ত্রী (৫) মুরাদাবাদে প্রকাশিত "জমা উল উলম"-সম্পাদক অম্বপ্রসাদ। প্রতোদের সম্পাদকের যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং সত্বাধিকারীর ৭ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

সকল চেষ্টা ও উদ্যমের ফল ব্যর্থ হইয়াছে, মনে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতের অনেক লোকই কি গোখলের ন্যায় নহে? বীর্য্যবান, সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মবীর এদেশে বিরল নহে কি? ধর্ম্মবীর ভিন্ন কি কোন দেশের কখনও স্থায়ী অভ্যুত্থান হইয়াছে? ধর্ম্ম ভিন্ন জগতের অভ্যুত্থান যে অসম্ভব, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান। ধর্ম্মের উন্নতি এবং অবনতির সহিত পৃথিবীর জাতি সাধারণের উন্নতি এবং অবনতি হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের উন্নতি নাই। ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন রাজনীতির আন্দোলন, স্বেচ্ছাচার বিশেষ। ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব। এক কথায় বলিতে পারি, ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে, জ্ঞান-বিস্তার হইতেছে, আন্দোলন হইতেছে, সবই সত্য; কিন্তু এক ধর্ম্মের অভাবে এ দেশের লোকের চরিত্র লাভে অনেক বিলম্ব আছে,—এক ধর্ম্মের অভাবে এ দেশের এক-জাতিত্ব গঠনে অনেক বিলম্ব আছে। ধর্ম্ম এদেশে যতদিন পুনরুত্থিত না হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ভারত ততদিন মৃত, নির্জ্জীব, অসহায়। এ ভারতে ধর্ম্মের যেরূপ হীনাবস্থা দেখিতেছি, কখনও ভারতের জীবন লাভ হইবে কি না, সন্দেহ। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কোন কারণ নাই। সন্তানকুল, প্রজাকুল চিরদাসত্বে নিমগ্ন—ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, পশুবৎ। গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়ের কারণ নাই।

আর আমাদেরই বা ভয়ের কারণ কি আছে? ভারতবাসী দাস, গবর্ণমেণ্ট প্রভু, আমরা প্রজা, গবর্ণমেণ্ট রাজা, আমরা দুর্ব্বল, গবর্ণমেণ্ট সবল। আমাদের ভয় কি? কথায় বলে, "যাহার সমুদ্রে শয্যা, তাহার শিশিরের ভয় কি?" আমরা রাজার বলে বলীয়ান, আমরা রাজার শক্তিতে শক্তিমান। আমরা একটু যদি মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়া থাকি, বলিতেই হইবে, যে কারণেই হউক, তাহা বিট্রিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা হইয়াছে। বলিতে, কহিতে, লিখিতে যাহা শিখিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই তাহা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষকে গবর্ণমেণ্ট সোণার রাজ্য করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে শ্মশানে পরিণত করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভারতবাসীকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে অসুরত্বে নমিত করিতেও পারেন। সকলই গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাৎ। আমাদের উত্থান পতন, গবর্ণমেণ্টের হাতে। আমাদের জীবন মরণ, গবর্ণমেণ্টের হাতে। এহেন প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে প্রহার করেন, নির্য্যাতন করেন, আমাদের কহিবার এবং বলিবার আছে কি? কিছুই নাই। এখানে প্রতিযোগীতা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীতা নাই, এখানে ক্ষমতার সংঘর্ষণ নাই,—কিছুই নাই। মনুষ্যের সহিত পিপীলিকার যেমন তুলনা, গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের তেমনি তুলনা। ক্ষমতা পাইয়া যে তাহার অপব্যবহার করে, সহ্য করা ভিন্ন তাহাকে বলিবার আমাদের কি আছে? যাহারা দয়া ও প্রসাদ-ভিখারী, তাহাদের জোর করিবার কি অধিকার? আমাদের ভয় কি? পিতা মাতা মারিলে, সন্তানের আর কি আব্দার করিবার থাকে? ভয় করিতে হয়, বাহিরের শত্রুকে, পিতা

যাতাকে ভয় করিলে চলে কি ? এখানে কেবল ভক্তি এবং ভালবাসা। এখানে কেবল নীরবতা ও সহিষ্ণুতা। রাজা বা পিতা মাতার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে সহ্যকরা বই আর গত্যন্তর নাই। যে রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে আর রাখিবে কে ? আর ধরিবে কে ? আর তুলিবে কে ? সুতরাং আমাদের ভয় নাই। আপন জনকে ভয় করিতে নাই। তাহাতে অধর্ম্ম এবং দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আমাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে, ভক্তি করিতে করিতে নীরবে মরিতে দাও। ভয় করিব কেন ? মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন—"দৈনিক মুষ্টি তণ্ডুলে যে জীবন ধারণ হয়, তাহার জন্য আর চিন্তা কি ?" আমাদের মনে হয়, যে জীবনে জগতের কোন কাজ হয় না, সে জীবনেই বা কাজ কি, সে জীবনেরই বা মায়া কি ? মৃত্যু, সকলেরই লক্ষ্য। কর্ত্তব্যপালন, মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে জীবন কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ, তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। আমরা যদি বাঁচিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারি, তবে মরিতে ভয় কিসের ? নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড, তাহা ত কিছুই নয়। দেশের সেবা করিয়া যদি কেহ নির্য্যাতন ভোগ করে, হিতৈষীর তাহা অঙ্গের ভূষণ। পৃথিবীর কোন মহৎ কাজ, আপন অনিষ্ট না করিয়া, কেহ সাধন করিতে পারে নাই। মানব-রক্তে মানব-গোষ্ঠীর উৎপত্তি। জীবন ঢালিলে তবে নব জীবনের উত্থান হয়। আমাদের ন্যায় অধম জনের জীবন-পাতে যদি এ দেশের নবজীবনের ভাবী কারণ প্রসূত হয়, আনন্দের সীমা নাই। ভয় কিসের ? সে কাপুরুষ, যে সৎকাজ করিয়া নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড বা মৃত্যুকে ভয় করে ?

৩১শে আগষ্টের (১৮৯৭) অমৃতবাজার পত্রিকায় পাঠ করিতেছিলাম যে, বিলাতের কোন মহাশয় লোক কংগ্রেস বর্ত্তমান আন্দোলনের সময় নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রের মন্তব্যে অমৃতবাজার বলেন —

"Our correspondent justly remarks that the Congress party in India utterly failed in their duty at this crisis. It was not necessary for them to hold indignation meetings' that was not at all needed But a public meeting might have been held at each of the three Presidency towns, to explain the real situation to Government."

The Amrita Bazar Patrika.
August 31, 1897.

এ সম্বন্ধে একদিন একজন বিখ্যাত সম্পাদকের সহিত এবং আর একদিন একজন বিখ্যাত লেখকের সহিত আমাদের কথা হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়, কলিকাতার কংগ্রেস-পাণ্ডাদিগের অপদার্থতা উল্লেখ করিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছিলেন, "আইনানুসারে বিচার হইতেছে, এ অবস্থায় সভা করা চলে কি ?" আমরা বলিয়াছিলাম, 'নাটুভ্রাতাদিগকে কোন্ আইনানুসারে ধৃত করা হইয়াছে ? এ সম্বন্ধে আন্দোলন চলে না কি ?' তিনি বলিলেন, "তাহা চলে।" কিন্তু সভা হয় না কেন, এ সম্বন্ধে তিনি আর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আমরা আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি, আমরা কাজের পক্ষপাতী। যে জাতির লোকেরা তিলককে চাঁদা দিয়া সাহায্য করিতে ভীত হয়, সে জাতি মহা আন্দোলনেও যে জাগিবে না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। জীবিত মানুষ আন্দোলনে জাগিতে পারে, মৃত মানুষ জাগিবে কিরূপে ? এ দেশে জীবিত মানুষ নাই। যে দেশের নরনারী ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, তাহাদিগকে আমরা জীবিত বলি না। আন্দোলনে কিছু হইবে না, জানি। কিন্তু আন্দোলনে ভারত জাগিবে, যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আজ নীরব

ও নিশ্চেষ্ট কেন? আজ তাঁহাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না কেন? নির্ব্বাসনের ভয়ে কি সকলে আজ মূক। এ দেশের সকল নেতাই কি "ধাই-কিরি" দলের লোক? পূর্ব্বে জানিতাম, বাঙ্গালী এমন এক জাতি, যাহাদের এক জনকে প্রহার করিলে অন্যে হাসে। বাস্তবিক, এত আন্দোলনের পর, ভারতবর্ষও কি এই অবস্থায় আসিয়াছে যে, যে যার প্রাণ লইয়া পলায়নে তৎপর? এ কথা ভাবিতেও কষ্ট পাই। হায়, হতভাগ্য গোখলে, তুমি কি ভারতের কাপুরুষদিগের ব্যক্ত প্রতি-মূর্ত্তি? আজ পুণ্যময়ী রমাবাই ধর্ম্মানুপ্রাণিত জীবন্ত মূর্ত্তিতে সত্য-প্রতিষ্ঠায় বা সত্য ঘোষণায় বদ্ধপরিকর হইয়া মহিলাকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিলেন, আর তুমি নরাধম কি অভিনয়ই করিলে? ইহাই কি জাতীয়তা, ইহাই কি হিতৈষণা, ইহাই কি বীরত্ব, ইহাই কি সাহস?* বড়ই আশ্চর্য্য যে, গবর্ণমেণ্ট রজ্জুকে সর্পভ্রম করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের কোন ভয় নাই, নিশ্চয় কোন ভয় নাই।

না—এখন বুঝিতেছি, কাজ নাই আর বৃথা আন্দোলনে। নীরবতাই আমাদের পক্ষে সাজে ভাল? যাহাদের প্রাণ নাই, প্রাণে ধর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নাই, ন্যায়-জ্ঞান নাই, সত্যপ্রিয়তা নাই,—তাহাদের পক্ষে নীরবতাই ভাল। মৌনব্রত এখন ভারতের মূল মন্ত্র হউক। কাজ কি সে আন্দোলনে, ভাই, যে আন্দোলনের পর মুহূর্ত্তে তুমি পলায়নে তৎপর? কাজ কি ভাই তোমার সে হিতৈষণায়, ম্যাজিষ্ট্রেট বা সামান্য একজন কর্ম্মচারীর ভয়ে যাহা মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়? অথবা কাজ কি তোমার দেশসেবায়, যাহা সামান্য সম্মান বা উপাধির খাতিরে উপার্জ্জিত? তুমি সামান্য স্বার্থ ভুলিতে পারিলে না, জীবন-মমতা বিসর্জ্জন দিতে পারিলে না, তোমার এ ব্রত লইয়া কাজ কি? নীরব হও, সংযত হও, বিনীত হও। বহু যুগব্যাপী তপস্যার পর তবে ভারত জাগিবে। এখন ভারতকে নীরবে ঘুমাইতে দেও। একটী, একটী করিয়া পাঁচটী মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে; ইহাতে ভয় কি? শতটী হউক, ক্রমে সহস্রটী হউক—ক্রমে লক্ষটী হউক—ক্রমে অত্যাচারের উষ্ণ শলাকা সকলের দেহে বিদ্ধ হউক, তখন মানুষ স্বার্থ ভুলিতে পারিবে, পরার্থ শিখিতে পারিবে, ধর্ম্ম কি, লক্ষ্য কি বুঝিবে; তখন ভারত জাগিবে, তখন ভারতে আন্দোলন উঠিবে। এ যুগে নীরবে সকলে ঘুমাও। "ধাই-কিরি" দলের জয় জয় কারে দেশ গৌরবান্বিত হউক—আকাশ কম্পিত হউক। সকল লেখাপড়া এখন বন্ধ থাকুক।

* She retorts thus in the *Bombay Guardian* of the 4th instant :--

"The managers of the Plague Hospital can deny the thing with impunity, simply because they are in authority; but truth is truth; all the high authorities in the world will not silence it. Cain denied having killed his brother but God declared that the blood of the innocent brother, which Cain has shed, cried unto Him from the ground, so the blood of my girl will cry unto him who is the 'father of the fatherless and the Judge of the widow.' Neither the Governor nor the managers of the Plague Hospital are able to shut the eyes of Him who is the searcher of all hearts. * * *

Still I do not for a moment think of withdrawing my statement concerning her and the general management of that Hospital. I cannot deny what my eyes saw and ears heard even though the *Governor of Bombay and the powers of this world may declare it untrue.*"

Amrita Bazar Patrika, Sep. 10, 1896.

দীন-জননী মহারাণী স্বর্ণময়ী।

১৩০৪ সালে বঙ্গের প্রধান ঘটনা, দুর্ভিক্ষ নয়, ভূমিকম্পও নয়,—প্রধান ঘটনা, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বর্গারোহণ। একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে,

"এদেশে কেবল দুটী মানুষ আছে—এক মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং অন্য তারকচন্দ্র প্রামাণিক;—আর সব পশুতুল্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন এরূপ বলেন? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"যাহার হৃদয় আছে, দয়া আছে, যে দরিদ্রের উপকার করে, সে-ই মানুষ, আর সব পশু।" আমরা মনে মনে এই দুই জনের সহিত আর এক জনের নাম সংযোগ করিয়াছিলাম, তিনি আমাদের চিরপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়। বঙ্গের তারকচন্দ্র গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন—একাকিনী স্বর্ণময়ী ঘোরতিমিরাবৃত হৃদয়-শূন্য ভারত-শ্মশানে দীপ্তিময়ী করুণাধারা ঢালিতে ছিলেন। হায়, হায়, হায়, তিনিও ১০ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩০৪, ৭১ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বঙ্গের দুঃখের সীমা নাই—নিরানন্দের অবধি নাই।

আমরা বাল্যকাল হইতে মহারাণীর নাম শুনিয়া আসিয়াছি। যৌবনের প্রারম্ভে যখন সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিতেছিলাম, সেই সময় হইতে পরিচয় পাইয়াছি—"স্বর্ণময়ী দীন-জননী।" যখন প্রথম সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন দারুণ দারিদ্র্য-পীড়নে আমরা অস্থির ছিলাম। যখন শরৎচন্দ্র প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কঠোর সামাজিক শাসনে আমরা ব্যতিব্যস্ত—একজন বন্ধু বা একজন আত্মীয় করুণার চক্ষে দেখিবার ছিলেন না। সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ হইলে চক্ষে জল পড়ে। সেই দুর্দ্দিনে কদর্য্য কাগজে শরৎচন্দ্র ছাপা হইয়া মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইল। দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, করুণার মধুর দৃষ্টিতে এক বিন্দু উৎসাহ-বারি নিক্ষেপ করিলেন। সামান্য উৎসাহ-বারিতে—কত কি হইল, আমি অধম লেখক, কি লিখিব? মহারাণী আমার নিকট যেন অমিয়া-ধারা হইলেন। একটী মিষ্ট কথায়, একটু স্নেহ-ধারায়—নবজীবনের সঞ্চার যে জগতের প্রাত্যহিক ব্যাপার, এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষায় যে দেশের অসংখ্য লোক জীবন ধারণ করিতেছে, সে দেশের লোক আমরা, সামান্য বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করিতে শিখি নাই। ঘোর দুর্দ্দিনে ১০টী মাত্র টাকায় স্বর্ণময়ী আমাদের নিকট "দীন-জননী" আখ্যায় আখ্যাতা হইলেন।

সেই এক দিন, আর আজ এক দিন। ১২৮৪ সালে শরৎচন্দ্র প্রথম প্রকাশিত হয়, আর আজ ১৩০৪ সাল। আমাদের মনে পড়ে, সেও ভাদ্র মাসের কথা—এও ভাদ্র মাস। দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১৯ বৎসর; এতদিন মহারাণীর জীবন আমাদের নিকট যেন অমৃত-ধারার ন্যায় ছিল। স্মরণে সুখ হইত, ধ্যানে আরাম পাইতাম। মহারাণী যে দেশের মাতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া কৃতার্থ মনে করিতাম। আজ আমরা মাতৃহারা? আর এ বঙ্গ প্রদেশ?

জ্ঞান হইয়াছে পর শুনি নাই, মহারাণী কাহারও প্রতি বিমুখ হইয়াছেন? আমরা সময়ে সময়ে যে সকল দুঃখীর জন্য লিখিয়াছি, মহারাণী মুক্তহস্তে সাহায্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণীর পদধূলি যে পুরীকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আমরা সেই কাশিমবাজার রাজধানী দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছি—প্রত্যহ কত শত লোক সেখানে অন্ন বস্ত্র পয়সা পাইতেছে। মহারাণীর জীবনী অলিখিত, প্রতিমূর্ত্তি কোন ফটো-ছবিতে কেহ দেখে নাই—তবুও কেন বঙ্গের ঘরে ঘরে মহারাণীর কথা? এই দেশে দানের ফর্দ্দ রাখিয়া ও সংবাদ পত্রে তাহা ছাপাইয়া

অনেকে দাতা হইয়াছেন, রাজসম্মান পাইয়াছেন। কিন্তু তারকচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের দানের তালিকা কোন সংবাদ পত্র আজ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহাদের পরিবারের লোকেরাও তাহা জানেন কি? জানেন না—জানা অসম্ভব। যেখানে দানের ফর্দ্দ থাকে, সেখানে দেবত্ব নাই। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া অনেক সময়ে ভাবি "যিনি আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিকে এত দয়া করেন, তিনি কি জগৎকে ভুলিয়া আছেন? কখনই নয়, কখনই সম্ভব নয়।" যাহারা স্বর্ণময়ী সম্বন্ধেও কত সময়ে ভাবিয়াছি, যিনি আমার ন্যায় নগণ্য সামান্য পরিত্যক্ত, নির্য্যাত, ঘৃণিত ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, তিনি কি বঙ্গের অসংখ্য দরিদ্রকে ভুলিয়া থাকেন? শেষে শুনিয়াছি, কাহারও প্রতি তিনি বাম নহেন। দুঃখীর কথা শুনিলেই তিনি দয়া করিতে অগ্রসর। এইরূপে কত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দয়ার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছে; কিন্তু তাহার কোন বিবরণ নাই। বিবরণ থাকা সম্ভব নয়। সে কালে শুনিয়াছি, দাতাকর্ণের নাম, একালে শুনিতেছি, মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম। স্বর্ণময়ী বঙ্গের প্রতি গৃহে দয়া-রাণীরূপে প্রভাসিতা। কে তাঁহাকে জানে না? কোন্ দুঃখী তাঁহার সাহায্য পায় নাই! মহারাণীর স্বর্গারোহণে আজ বঙ্গভূমি স্নেহময়ী জননী-হারা হইয়াছেন।

হিন্দু-গৃহে মাতৃ-বিয়োগ, সকল দুর্ঘটনার মধ্যে প্রধান। সকল কথা মানুষ ভুলিতে পারে, মাতার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। আজ বঙ্গভূমি দয়ার অনন্ত-প্রসবণ-স্বরূপা মাতৃ-হারা হইয়াছেন; সুতরাং এমন দুর্ঘটনা বঙ্গে এ বৎসর আর ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষের হাহাকার, ভূমিকম্পের প্রকোপ মানুষ ভুলিয়া আজ পুণ্যময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্য অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। মা বঙ্গের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়াই বুঝি বা পলায়ন করিলেন! বঙ্গ-ভূমি আজ দয়া-মায়া-শূন্য শ্মশানে পরিণত! দুঃখীর আর্ত্তনাদে হাস্য পরিহাস করিবার লোক এ বঙ্গে অনেক আছে, কিন্তু অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে আর লোক নাই! এমন দুর্দ্দিন আর বঙ্গে কখনও হয় নাই। এ অন্ধকারময় বঙ্গে যে তিনটী দয়ার প্রদীপ জ্বলিতেছিল, একে একে সে তিনটীই নির্ব্বাণ হইল। হা বঙ্গভূমি, তোমার দরিদ্র-কুলকে আর কে রক্ষা করিবে?

আজকাল মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধি-কারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ চলিতেছে। চলিতেছে, চলুক। যাহার প্রাপ্য, শূন্য সিংহাসন সে পাউক, সাধারণের তাহাতে ক্ষতিও নাই, বুঝি বা বৃদ্ধিও নাই। এই ভাদ্র মাসে ভাগী-রথী কুল কুল বহিয়া যে শ্মশান ভস্ম সাগরকে উপহার দিয়াছে, বুঝিবা, বঙ্গের শেষ দয়ার বিন্দু তাহার সহিত চির বিসর্জ্জিত হইয়াছে। ধন পাইয়া লোক নৃত্য করে, বিলাসিতা করে, গাড়ী ঘোড়ায় উঠে, রিপুসেবা করে, অহ-ঙ্কারে মত্ত হয়, দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করে। কি কুকার্য্য না করে, জানি না। ধন পাইয়া দান করে, অতি অল্প লোক—দরিদ্র-সেবা করে লক্ষে একজন। যাহার ধন পাওয়ার, সে পাউক, যে বড় হইবার, সে বড় হউক। দরিদ্র-সাধারণের সহিত সে বড়ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের মনে হয়, মহারাণী কেবল নিঃসন্তান নহেন; তিনি উত্তরাধি-কারী-হীনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে, তাঁহার পিতৃ মাতৃ কুলে, তাঁহার স্বামীর কুলে, তাঁহার সন্তান সদৃশ বঙ্গকুলে দয়ার উত্তরাধি-

কারী রাখিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই। এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। তারকচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং মহারাণীকে দয়ার উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহারাণীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু হায়, মহারাণী স্বর্ণময়ী দয়ার বংশে বাতি দিতে আর কাহাকেও রাখিয়া যান নাই। তাই বুঝি আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ—দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে অশনিপাত হইতেছে। কে বলিবে, বঙ্গের এ দুর্দ্দিন কেন?

আমরা বলিয়াছি, মহারাণীর উত্তরাধিকারী নাই। উত্তরাধিকারী নাই, ফটো নাই, জীবন-চরিতও নাই। আছে কেবল দয়ার কথা। তাহা অকথিত, অব্যক্ত, অশেষ;—তাহা লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত, প্রতিবিম্বিত। তাহার ছাঁচ তুলিয়া দেখাইতে পারে, এমন মহাজন এদেশে নাই। মহারাণীকে চিনিতে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ যতদিন এ দেশের নরনারী না পাইবে, ততদিন তাঁহাকে কেহই চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিবে না। চেষ্টা ব্যর্থ। চেষ্টায় ভাবা সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকৃতি সৃষ্ট হয় না। প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষমতা মানুষের হৃদয়ে। যে জিনিস যাহার হৃদয়ে নাই, তাহা সে বুঝিতে অক্ষম। যে হৃদয়ে দয়া নাই, সে দয়ার চিত্র আঁকিতে অক্ষম। মহারাণীর জীবনচরিত লিখিবার উত্তরাধিকারীও তিনি রাখিয়া যান নাই। নীরবে সে জীবনের আরম্ভ, নীরবেই তাহা শেষ হইয়াছে। তিনি মাতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়া আজ বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছেন। অমর-কূলে আজ আনন্দ-ধ্বনি, আর এই বঙ্গে হাহাকার, নিদারুণ হাহাকার।

তাঁহার স্বামী এবং পিতৃ মাতৃ কুল সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা কোন পত্রিকা হইতে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া কতকটা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"কাশীমবাজারের রাজ পরিবারের নাম কাহারও নিকট অবিদিত নয়। এক শত বৎসর হইল এই পরিবার প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতায় সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিচিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত রাজ পরিবারের যশঃসৌরভ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজ বণিকগণ যখন ভারতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন নানাস্থানে তাহাদের কুঠী ছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব-কালে মুর্শিদাবাদে যে কুঠী ছিল, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রূপ অট্টালিকার ভিত্তি পত্তন করেন। তখন নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজের মনান্তর ঘটে এবং তদ্দরুণ ইংরেজের সমস্ত সম্পত্তি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া কুঠীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য নবাব হুকুম প্রচার করেন। নবাবের সৈন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে আক্রমণ করিল; নবাব সৈন্যের আক্রমণ হইতে কুঠী রক্ষা করার শক্তি সামর্থ্য হেষ্টিংস্ সাহেবের ছিল না, সুতরাং কুঠী নবাবের হস্তগত হইল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল বিপদের সময়ে একজন বাঙ্গালী তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তিনিই কাশীমবাজারের রাজ পরিবারের উন্নতির আদি পুরুষ।

কান্ত বাবু নিজ বাড়ীতে হেষ্টিংস্ সাহেবকে, আশ্রয় দিয়াছিলেন। নবাবের এই আদেশ ছিল, যে ব্যক্তি কোন ইংরেজকে

আশ্রয় দিবে, তিনি তাহাকে সপরিবারে শূলে দিবেন। কান্ত বাবু এই ভীষণ আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হেষ্টিংস্ সাহেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার কলিকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং তিনি কান্ত বাবুকে তজ্জন্য শাস্তি দিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইব বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নবাবের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, সুতরাং কান্ত বাবু রক্ষা পাইলেন।

পলাশি-ক্ষেত্রে নবাব পরাজিত হইলে পর ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশের প্রভুত্ব লাভ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ সাহেব বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি এদেশে আসিয়াই কান্ত বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নিজের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে তিনি ভুলিলেন না। কান্ত বাবু কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই পদে তিনি ১৪ বৎসর কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং গাজিপুর ও আজিমগঞ্জ জেলাতে বৃহৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দী পিতার জীবিতাবস্থাতেই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহা সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছিলেন। রাজা লোকনাথ অনেক নূতন জমিদারী ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হরিনাথ নামক একটী শিশু সন্তান রাখিয়া তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালক হরিনাথ জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতি করিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। ১৮২০ সনে লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। রাজা হরিনাথ উদারমনা এবং মহানুভব লোক ছিলেন। তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডার স্বদেশবাসী দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। তিনি কাশীমবাজারে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অল্প বয়সে রাজা হরিনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ তৎকালে নাবালক ছিল। কৃষ্ণনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, তাঁহার বিবাহের জন্য বহুদিন যাবৎ পাত্রীর অন্বেষণ হইতেছিল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ভট্টকুল গ্রামে একটী পাত্রী নির্দ্ধারিত হয়। ১২৩৪ সালের মার্গশীর্ষে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অধীন ভাটকুল গ্রামে এই পাত্রীর জন্ম হয়। গণকগণ পরীক্ষা করিয়া মেয়েটীকে সুলক্ষণা এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার নাম ছিল স্বর্ণময়ী। বলা অনাবশ্যক, তিনিই আমাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী। তাঁহার শারীরিক রূপ লাবণ্য যথেষ্ট ছিল। ১৮৩৮ সালে ১১ বৎসর বয়সে কুমার কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কুমার কৃষ্ণনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তৎপর বৎসর লর্ড অক্‌লাণ্ড তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও শিক্ষিত এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত্নবান ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজের যে সভা হয়; তাহাতে রাজা

কৃষ্ণনাথ হেয়ার সাহেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া তজ্জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। সকলেই ভাবিল, কালে রাজা কৃষ্ণনাথের যশ এবং কীর্ত্তি সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইবে। কি সে আশা মিটিল না। যৌবন অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই রাজা কৃষ্ণনাথ এ পাপ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু ঘটনা যারপর নাই শোচনীয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন উদ্ধত-স্বভাব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য রাজা কৃষ্ণনাথের উপর শমন জারী হইল। প্রকাশ্য ফৌজদারী আদালতে হাজির হওয়া এবং ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়া তিনি নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন এবং কলিকাতা যাইয়া বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী হইলেন। রাণী স্বর্ণময়ী যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই (১৭ বৎসর বয়সে) বিধবা হইলেন। স্বামী হারাইয়া শোকে অধৈর্য্য হইলেন। বিপদের উপর আবার বিপদ উপস্থিত হইল। মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীকে দান করিয়াছেন, এই মর্ম্মে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী একখণ্ড উইল বাহির করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দাবী করিলেন। এক মাত্র স্ত্রীধন ভিন্ন রাণী স্বর্ণময়ীর জীবনোপায় কিছু রহিল না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া সমস্ত সহিতে লাগিলেন। মিতব্যয়িতার বলে কয়েক বৎসরের মধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া, সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। আদালতে উইল মিথ্যা বলিয়া পরিণত হইল। রাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যে সময় বিশাল কাশিমবাজার ষ্টেটের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তখনও তিনি সম্পূর্ণ যুবতী। সম্পত্তির দখল লইয়া দেখিলেন, কোম্পানীর সময়ে যারপর নাই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং আয় এত কমিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সদর রাজস্ব আদায় হওয়াও দুষ্কর। সেই সময় তিনি মৃত রায়বাহাদুর রাজীবলোচন রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রাজীবলোচন প্রভৃত ক্ষমতা বলে সম্পত্তির আয় ৩২ লক্ষ টাকাতে পরিণত করিয়াছিলেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও রাণী স্বর্ণময়ী সর্ব্ব প্রকারের বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। দিনে এক বেলা মাত্র আতপ তণ্ডুল এবং শাক সবজী আহার করিতেন। মাটীর উপর কম্বল পাতিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন। সামান্য থানের ধুতি পরিতেন। দেবসেবা এবং পরোপকার তাঁহার জীবনের দুইটী প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। ন্যূনকল্পে তাঁহার দানের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হইবে। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে তিনি প্রায় ১॥ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বহরমপুরের কলেজ এবং জলের কল তাঁহার অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপোষিত। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র এবং অসীম দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি দান করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন যে, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধি দেওয়া হইবে। পরিশেষে মেম্বর অব্ দি ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব্ দি ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর মহারাণী রায় বাহাদুর শ্রীনাথপালকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর গত হইল তিনি সি, আই, উপাধি পাইয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৭১ বৎসর বয়সে (১৩০৪)

১০ই ভাদ্র, বুধবার, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার শাশুড়ী হরসুন্দরী সম্পত্তির মালীক হইয়াছেন। রাণী হরসুন্দরী কাশীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু মণীন্দ্রনাথ নন্দী কাশীমবাজারের রাজ-গদীতে বসিবেন। জগদীশ্বর মণীন্দ্র বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন।”

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

সঙ্গীত।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

যে ঘন আঁধার ঘেরেছে মা তোরে—
অভাগী ভারত কুল দেখিনা যে রে।
অধীনতা পাশে, পরায়ত্ব শাসে,
বর্ষপরি বর্ষ চলিছে অশেষে।

বিগত গৌরব, বিচ্যুত বিভব,
চির দরিদ্রতা, নিত্য নিপীড়ন—
যশ কীর্ত্তি আশা,—অতীতের খেলা
চির অধীনতা নিয়তি এখন।

অধম তনয় তনয়া সবে মোরা
নীরবেতে সহি তোর অশ্রুধারা।
ধিক্ এ জীবন,—ধিক্ এ জীবন!
ধিক্ বুদ্ধি জ্ঞান! ধিক্ ধন মান,
মায়ের সন্তান যদি না দেয় প্রাণ,
মায়ের যাতনা করিতে মোচন।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

সমাধি।

শুয়েছে প্রাণের প্রাণ পৃথিবীর কোলে,
বসন্ত মলয় বায়ু বহেনা হেথায়!
মর্ম্মর প্রস্তর নীচে দেহ সমাহিত,
আসে না কেহই হেথা কভু পথ ভুলে!
আকাশ হইতে ঘন পড়িয়া তুষার,
ভাঙ্গিতে পারে না তার যোগ-গত প্রাণ!
দেখেনা চাহিয়া কভু নির্ম্মল উষার,—
সুন্দর সে প্রস্ফুটিত প্রেম প্রস্রবন!

নিশিতে শিশির কাঁদে ফেলি অশ্রুজল,
নিশা অবসান হ’লে, সুন্দর উষায়
বিষাদে ঝরিয়া পড়ে সেফালিকা ফুল,
টুপ্ টাপ্ করে পড়ে সমাধির গায়।

এখানে ঘুমায় মোর হৃদয়ের ধন।
এক বছরের শিশু কি বুঝিবে তার?
সে কি বুঝে প্রকৃতির নির্জ্জন শোভার
হু হু শব্দে কাঁপাইয়া যায় সমীরণ।

কঠিন হস্তেতে দেব! হয়ে যাবে ম্লান,
কোলেতে নিয়েছ তাই কাঁদায়ে পরাণ;
তাইতে নিলে গো বুঝি হৃদয়ের ধন?
তোমার(ই) মঙ্গল ইচ্ছা হউক পুরণ!!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

বালবিধবা।

(সত্য ঘটনা।)

১

দশ বছরের ‘বিন্দু’ বালিকা এখন,—
আজো সে খেলার ঘরে
সারাদিন খেলা করে
রাঁধিয়া মাটীর ভাত মাটীর ব্যঞ্জন!
গান গেয়ে হুলু দিয়ে,
পুতুলের দেয় বিয়ে,
পরায়ে রঙ্কিন বাস নানা আভরণ!
আ’জো তার হ’লে ক্রোধ,
নাহি থাকে বিন্দু বোধ,
টুপা ঠালি ভেঙ্গে ফেলে করে সে ক্রন্দন!
দশ বছরের ‘বিন্দু’ বালিকা এখন।

দশ বছরের 'বিন্দু' বালিকা এখন,—
বাল্য সহচরী সনে
আ'জো সে প্রফুল্ল মনে
ছুটা ছুটি করি খেলা করে অনুক্ষণ,
পাড়ায় বেড়াতে গেলে,
সারাদিন থাকে ভুলে,
খাবার কথাও তার থাকে না স্মরণ।
রাগ করে গালি দিলে
চেয়ে থাকে মুখ তুলে
নীরবে দাঁড়ায়ে করে অশ্রু বরিষণ!
আবার আদর ক'রে
ডাকিয়া লইলে তারে,
দেখিতে দেখিতে হয় প্রফুল্ল বদন!
দশ বছরের 'বিন্দু' বালিকা এখন।

৩

দশ বছরের 'বিন্দু' বালিকা এখন,—
আ'জো সে লইয়া ডালা,
প্রতিদিন ভোর বেলা
কাননে কাননে করে কুসুম চয়ন;
শেফালি, বকুল, যূঁতি
তুলি ফুল নানা জাতি,
যতনে বসিয়া গাঁথে হার সুচিকণ,
কুসুমের মালা গড়ে,
পরে সুকোমল করে,
সাজায় সুচারু ফুল-নূপুরে চরণ!
ফুলরাণী সেজে আসি,
দেখায় মায়েরে হাসি,
পুরস্কার লতে শত স্নেহের চুম্বন!
দশ বছরের 'বিন্দু' বালিকা এখন।

৪

দশ বছরের বিন্দু বালিকা এখন,—
আ'জো সে কোমল বালা
বুঝেনা ধরার জ্বালা,
খেলা ধূলা ল'য়ে আছে ব্যস্ত অনুক্ষণ!
আ'জ সে মায়ের বুকে
রহিয়াছে কত সুখে,
দেখিনি দুঃখের মুখ স্বপ্নেও কখন;
সরলা বালিকা সে যে
শোক তাপ নাহি বুঝে
আ'জিও প্রফুল্ল তাই চারুচন্দ্রানন।
জানে না কেমন করে,
অজ্ঞাতে প'ড়েছে শিরে
বিধির আগ্নেয়-অস্ত্র "বৈধব্য" ভীষণ!
বুঝেনি সে হায়! হায়!!
নিদারুণ বিধাতায়
নিয়াছে কাড়িয়া তার অমূল্য রতন!
ধরার সুখের আশা—
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা
সকলি গিয়াছে তার জন্মের মতন!
কোমল বালিকা দে'খে
হ'লোনারে দয়া বুকে,
চিরদুখ-স্রোতে বিধি দিল বিসর্জ্জন!
দশ বছরের 'বিন্দু' বালিকা এখন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বীণাপাণি।

উজল মানস জলে মরাল খেলিছে কিবা
দুলাইয়া শুভ্রদেহ ঈষৎ হেলায়ে গ্রীবা;
নামিছেন শ্রান্ত রবি পশ্চিম সোপান দিয়া
চঞ্চল তরঙ্গ চূড়ে স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া;
নব দূর্ব্বাদল শির, সমীর চুমিয়া যায়
কোমল পরশে তার কাঁপিয়া উঠিছে কায়;
সমুজ্জল তরুশির, কণক কিরণ মাখি;
ও কার মুরতি হেথা মোহিছে মানস-আঁখি?
স্নিগ্ধ সুশীতল ধরা, প্রস্ফুটিত কমলিনী;
কে তুমি গো বীণা করে, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপখানি?
আলুথালু কেশদাম, নিমীলিত আঁখিপাতা,
সুরঞ্জিত ওষ্ঠাধর হৃদয়েতে ভাব গাঁথা।

মৃণাল আসনে বসি ঝঙ্কারিছ বীণাতার,
উঠিছে সঙ্গীত সুধা উথলি স্বরগ পার।
মধুর বীণার রবে কমল সরসী জলে
পড়িছে সোহাগে ঢলি তোমার চরণ তলে।
নীরবে শুনিছে পাখী বীণার মোহন সুর,
বিভোরে নয়ন মুদি ভাবিয়া অমরা পুর।
শুনে সেই কলকণ্ঠ, বীণার পূরবী তান,
দ্রবীভূত আত্মহারা বাল্মীকি পাষাণ প্রাণ।
মুকতি দিয়াছ যারে, আঁধারে ধরিয়া হাতে
ফুটায়ে কনক জ্যোতি হৃদয়ের পাতে পাতে;
পঙ্কজ কাননে বসি, যাহারে করুণা কর,
অতৃপ্ত হিয়ার মাঝে দেও তারে শুভবর।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

নববলে নবোৎসাহ।

এস এস নবোৎসাহ, পৌরুষ-সাধনা।
বাজিল বিষাণ ওই,—
কই রে মানব কই?
ভেঙ্গে ফেল কর্ম্মবন্ধ—আরাম-খেলনা,
নব বঙ্গে, এস প্রিয় পৌরুষ-সাধনা।

উঠিছে কালের ঝড়ে তরঙ্গ কোথায়?
দে রে—দে রে—পাল টানি,
সেই স্রোতে তরীখানি,
যায় যদি, যাক্ ভেসে উন্মত্তের প্রায়;
তবু—তবু—ভেঙ্গে যাক্ জড়তা তাহায়।

দূরে থেকে প্রণমিব তিতিক্ষার পায়;
শম, যম, যোগ, ধ্যান,
ব্রত, যাগ, অনুষ্ঠান
বারেক তোমরা সবে দাওগো বিদায়;
একটু ছুটিয়া আসি কালের খেলায়।

আমরা কালের শিশু, বেশী নাই পুঁজি;
বড় বড় কথাগুলি,
কি জানি যাই বা ভুলি,
অকালে প্রবীণ হ'য়ে শিষ্ট শান্ত বুঝি।
তাই বলি, আগে ভাগে খেলাঘর খুঁজি।

কে যাবি? আছিস্ বসে, আয় রে এখন;
কেন স্বার্থ, অভিমান?
মিছে বিজ্ঞতার ভাণ,
এক ধ্যান, এক প্রাণ, হোক্ এক পণ;—
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন!"

শোন না বাঙ্গালী নামে উঠিছে ধিক্কার
দু দিনে ফুরায় খেলা,
ডোবে উদ্যমের ভেলা,
ফিরে এসে হন শুধু কথার ভাণ্ডার;
বিশ্ব গুহাপ্রান্তে সেই মূষিক আবার!

এ যুগ—নবীন যুগ,—তপস্যার ফল;
এবারো কি ঘুচিবে না কলঙ্ক প্রবল?
বায়, শশী, গ্রহ, তারা
দেখুক্ বিহ্বল পারা,
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড চেয়ে, আছে কিনা বল;
বাঙ্গালীর দর্প, গর্ব্ব, শুধু নহে ছল!

ওজস্বী বক্তৃতা ঘটা, লেখনি গরব;
পথে যেতে উড়ে যায় ফাঁকা ধোঁয়া সব!
বিদ্রূপ ত অবসাদ;
যুক্তি মূলে বিসম্বাদ,
আকাশ কুসুম ভাঙ্গি গড়'যা সম্ভব;
স্বার্থ জেগে থাক্ চির রোদন নীরব।

বিদেশীর যাহা কিছু—থাক্ অত্যুজ্জ্বল!
তর্ক ধরি রুক্ষ রুক্ষ,
বাছিব না সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম,
একে একে ফেলে দিব খুলিয়া সকল;
ফিরিব ঘরের ছেলে স্বগর্ব্বে অটল।

স্বদেশের যত কিছু দৈন্য ধূলি বালি,
তুলে নিয়ে সসম্ভ্রমে সাজিব বাঙ্গালী।
তুমি শিল্প সজ্জা হীর্ণ,
এস প্রিয় বেশ জীর্ণ,
নিজস্ব নিজত্ব বেচি হব না কাঙ্গালী;
পরদ্বারে ভিক্ষা, সেত কৃপাপূর্ণ-গালি!

বাজিল বাজিল, ঘরে আর কে রে রয়?
কার্য্যক্ষেত্র যার যার,
লহ বাটি এইবার,
দেবের আশীষ লয়ে নির্ভয় হৃদয়;
এস নবোৎসাহে মাতি' বঙ্গের তনয়!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

জন্ম ও মৃত্যু।

ঝম্ ঝম্ শব্দে বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল; রাত্রি ১০টা, এখনও বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নাই। অনেক দিনের পর বৃষ্টি, পৃথিবী শীতল হইয়াছে। একাদশীর চাঁদ মেঘের আড়ে থাকিয়া মাঝে মাঝে সমুদয় গাছপালায় মিঠে আলো মাখাইয়া দিতেছে। এমন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ সময়ে নিকটস্থ পুষ্করিণীর ভেককুলের চীৎকার ভাল লাগে কি? কিন্তু দুঃখেরও বিরাম আছে। অল্পক্ষণ পরে চীৎকার আর শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয় একঘেয়ে বলিয়া ঘুমাইয়া গেলাম।

এইরূপে কতক্ষণ গিয়াছে, জানি না। দেখিলাম, শুধু ভেক নয়, সমুদয় প্রাণিজগৎ আমায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। এক দিকে সূক্ষ্ম "আমিবা" (Amœba) স্বীয় শ্যান দেহ ক্ষণে ক্ষণে বিস্তৃত ও আকুঞ্চিত করিয়া আর্দ্র ভূমিতে গুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিন্দু মাত্র জলে শত শত "ইন্‌ফ্যুসোরিয়া" (Infusoria) দেহের দ্রুত কেশ-সঞ্চালনে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। প্রবালপুঞ্জ সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন দ্বীপে পুরুষানুক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উহাদের নড়ন চড়ন নাই দেখিয়া উহাদিগকে প্রথমে গাছ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু মুখের রজ্জুবৎ ক্ষেপণী দেখিয়া সে ভ্রম তিরোহিত হইল। কঞ্চুলিকা, জলৌকা প্রভৃতি স্ব স্ব দীর্ঘ দেহ তরঙ্গায়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শত ও সহস্রপদী প্রস্তরের নিভৃত কোণ হইতে রেলের গাড়ীর মত গুড়ি গুড়ি বাহির হইতেছে। দেখিলাম, পতঙ্গকুল জল স্থল বায়ু ছাইয়া ফেলিয়াছে; উহাদের বুক পেট মাথা পৃথক্ বলিয়া উহারা আপনাদিগকে কৃমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিতেছে। এ দিকে ইংচাক কর্কট প্রভৃতি স্বীয় চর্ম্মাবৃত দেহের অধোভাগে সহস্র সহস্র অণ্ড ধারণ করিয়া বক্রপদে ক্ষণে ক্ষণে গিয়া থামিয়া যাইতেছে। বৃশ্চিক ঊর্ণনাভ প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপে একান্তমনে কীটধ্বংস প্রতীক্ষা করিতেছে। শম্বুক, শুক্তিকা প্রভৃতি নিজ নিজ প্রস্তরময় আবাসগৃহ হইতে স্থূলপদ বিস্তৃত করিয়া মন্থরগতিকেও লজ্জা দিতেছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণীর কথা কি বলিব? কোথাও সফরী রোহিত প্রভৃতি মৎস্যকুল জলমধ্যে দৌড়িয়া যাইতেছে। কোথাও গোধিকা, সরট, কুম্ভীর মুখব্যাদান করিয়া আহার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। কোথাও গৃধিনী শকুনি, কোথায়ও কাক, কোথাও বক, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে। কোথাও মৃগ মেষ মহিষ, কোথাও শশক ইন্দুর, কোথাও সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু শৈলময় অরণ্যানী ঘোর গর্জ্জনে সন্ত্রস্ত করিতেছে। শিশুক তিমি বিশাল দেহ দ্বারা জলরাশিকে দ্বিভাগ করিয়া অপসৃত হইতেছে। অজিন-পত্রা ঊর্দ্ধপদ সন্ন্যাসীর ন্যায় তপোক্লেশের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। মর্কটাদি ফলা-ন্বেষণে লম্ফে ঝম্পে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

দেখিয়া একান্ত ভীত ও বিস্মিত হইলাম। এ কোন্ রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম, ভাবিয়া চিন্তাকুলিত হইলাম। এই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ কেন এত ছুটাছুটি করিতেছে, কি উদ্দেশ্য

কিসের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠার পরিচয় দিতেছে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলিকাতায় চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়াছি, পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার জনস্রোত লক্ষ্য করিয়াছি, বর্ষাকালের মেঘগুলাকে বাতাসে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু এত ছুটাছুটি, এত মারামারি, এত কলহ, এত চীৎকার কোথাও দেখি নাই। ইহাদের মধ্যে আমি যেন নাই, এরূপ বোধ হইতে লাগিল। ইহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেই আমি দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছি, ইহাদেরই অনুকম্পায় যেন আমি বাঁচিয়া আছি।

এইরূপে ভয়-বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখি, এক ভেক-বধূ আমার চামেলীর মূলে বসিয়া আমায় লক্ষ্য করিতেছে। ভেককুলকে কখনও ভাল চক্ষে দেখিতে পারি নাই। এই বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় ভেক-বধূকে দেখিয়া আমার ঘৃণা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু ভেক-বধূ বড় মুখরা, বলিতে লাগিল, "তুমিও যে উদ্দেশ্যে আপন অস্তিত্ব-রক্ষায় নিযুক্ত আছ, আমরাও সেই অভিপ্রায়ে কালযাপন করিতেছি। তুমি বা কত দিনের? কত কত প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কত কত প্রাণিপুঞ্জ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু সেই আদিম জীবস্রোত কখনও রুদ্ধ হইয়াছে কি? যে অলঙ্ঘ্য নিয়মে তুমি আমাদের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ, পৃথিবীটা তোমার একার রাজ্য বলিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইতেছে, তাহা তোমারও নয়, আমাদেরও নয়। তুমি অনন্ত সাগরতরঙ্গের একটা জলকণা মাত্র। তরঙ্গের জলকণা প্রতি মুহূর্ত্তে স্থানচ্যুত হইতেছে, কিন্তু তরঙ্গের শেষ হইয়াছে কি? আমরা ও তোমরা সেই তরঙ্গের পা[illegible] রহি[illegible] তোমরা নয় সেই তরঙ্গের শীর্ষে উঠিয়াছ, কিন্তু তা বলিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া তোমার অস্তিত্ব নাই।"

ভেক-বধূর মুখে দার্শনিকের গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়া আমি আরও বিরক্ত হইলাম। কিন্তু কথা শুনায় একটু বিস্ময় জন্মিল। ভেক-বধূ আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিল; এ জন্য বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাদিগকে যত নিকৃষ্ট মনে করিতেছ, বস্তুতঃ কি তাই? আমাদের দেহ, আমাদের কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিলে আমাদের অপেক্ষা তোমাদিগকে বেশী উৎকৃষ্ট মনে করিতে পারিবে না। মানব নাম লইয়াছ বলিয়া বুঝি তোমরা আমাদের অন্তর্গত নও? মনে রেখো, কেবল তোমাদের জন্য কোন নূতন নিয়ম নাই।"

আমি এই কথা শুনিয়া আরও রুষ্ট হইলাম। মানব যে উহাদের বাহিরে নয়, একথা প্রগল্‌ভা ব্যতীত অপর কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, কূপমণ্ডুকের সহিত তর্কে কে কবে জয়লাভ করিতে পারিয়াছে? এই ভাবিয়া একটু নরম হইয়া বলিলাম "হে অনিন্দিতে, তুমি অত গর্ব্বিতা হইওনা। উচ্চ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে নীচ ব্যক্তি উপহাসাস্পদ হয়। আমরা বড় কি তোমরা বড়, সে কথা অন্য সময়ে হবে। এমন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ সময়ে তোমাদের কোলাহলে আমি প্রীত হই নাই। চপলতা ছাড়িয়া একটু লজ্জাশীলতা অভ্যাস কর।"

আমার কথা শুনিয়া ভেকবধূ কোপনা রমণীর ন্যায় মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা দীনহীন বটি, কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, নানাবিধ শত্রু হইতে আপনাদিগকে কোনক্রমে রক্ষা করিতেছি।

দেখিতেছি, তোমরাও আমাদের নূতন শত্রু হইতেছ।”

আমি প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, “দেখ, তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। আমি তোমাদের বংশকে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে বলি নাই। আমাদেরই একজন তোমাদের প্রধান চিরশত্রু ধ্বংস নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তোমরা যদি এত প্রজাবৃদ্ধি না করিতে, তাহা হইলে এত বিড়ম্বিত হইতে না।”

ভেকবধূ অবজ্ঞাসূচক স্বরে বলিতে লাগিল, “তোমাদের বকধার্ম্মিকত্বের আর পরিচয় দিও না। তোমাদের আহার সংস্থাপন নিমিত্ত, তোমাদের সেই ব্যক্তি নাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তোমাদের সভ্যদেশে আমাদের 'আবাদ' আরম্ভ হইয়াছে। যে কয়েকটী প্রাণী তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সন্তুষ্ট হওনা কেন? আমাদিগকেও তোমাদের আহার্য্য মধ্যে গণনা করিয়া আমাদের শত্রু সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিও না। আমাদের শোণিত উষ্ণ নহে বলিয়া তোমাদের জীব-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতেছেন, আমাদের চৈতন্য লোপ করিয়া তাঁহারা নিজের নিজের জীবন-ক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। দেখিতেছি, তোমরা আমাদের সভ্যশত্রু হইয়াছ।” এই বলিয়া ভেকবালা রোদন করিতে লাগিল।

তাহার রোদনে আমি একটু দুঃখিত হইয়া বলিলাম, “জীবন-সঙ্কটে সকলের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। আরণ্য প্রাণিগণের ন্যায় তোমরা যদি গৃহপালিত অবস্থায় অপত্য উৎপাদন না করিতে, তোমাদের এই নূতন বিপদ ঘটিত না।” ভেকবধূ উত্তর করিল, “হের গ্রাম্য প্রাণীরাই ত পথ দেখাইয়া দিয়াছে, দাস্য অবস্থায় সন্তান প্রসব করিয়াই ত তোমাদের লোভ বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা আপন মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পোষাকের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়াছে। তাহারা সঙ্কর উৎপত্তি করিয়া তোমাদের আকাঙ্ক্ষার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাদের জীবনকে ধিক্!” এই বলিয়া ভেকবধূ বিষণ্ণচিত্তে চামেলীকে বলিতে লাগিল, “তোমাদের যে দশা হইয়াছে, অচিরে আমাদেরও সেই দশা ঘটিবার আশঙ্কা করিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে ক্ষীণজীবী করিয়াছেন; কিন্তু প্রজারক্ষার নিয়ম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী উদ্ভূত হইয়া মানুষের দর্প নিশ্চিত খর্ব্ব করিবে।”

ভেক-রমণীর কথাগুলা আমার নিকট অভিশাপ বলিয়া বোধ হইল। মনে মনে আতঙ্ক হইল। ভাবিলাম, বিধাতা কি ক্রমবিকাশবিধি এতদূর প্রসারিত করিবেন? আমরাদিগকে চরমসৃষ্টি ভাবিয়া তিনি কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই? যদি তাঁহার এরূপই সংকল্প থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎকালের ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামে আমরা কিরূপে রক্ষা পাইব? আমায় বিষণ্ণ দেখিয়া ভেক-বধূর সমবেদনাস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে আমার আরও ক্লেশ হইতে লাগিল। মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাণীর কল্পনা করিতেও গা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। না জানি তাহাদের মতিগতি কি হইবে, না জানি তাহারা আমাদিগকে কি চক্ষে দেখিবে?

সুযোগ বুঝিয়া ভেকবধূ বলিতে লাগিল, “দেখিতেছ না, অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের অসভ্য অরণ্যবাসী হইতে সভ্য নাগরিকগণের কত প্রভেদ ঘটিয়াছে? অল্পে অল্পে ভবিষ্যৎ মানবের সহিত তোমাদের বিভেদ

ঘটিবে। তোমাদিগকে তখন শতপুত্রের পিতা মাতা হইয়া কিম্বা নীচ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।”

কথাগুলা আমার ভাল লাগিল না। ভেক-বধূকে বিষয়ান্তরে আনিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “অয়ি সুকণ্ঠে, দূর ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার চিন্তায় এখন ফল কি? তখন তুমিও থাকিবে না, আমিও থাকিব না। সুতরাং তৃণাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অস্পষ্ট প্রতীয়মান ভবিষ্যতের ভাবনার প্রয়োজন কি? আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, কবে আবার ধারাসম্পাতে তোমার বসন্ত উপস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।”

ভেক-যুবতী ঈষৎ লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিল, “যদি আমার দেহত্যাগে আমি ইহধাম ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে তোমার স্বার্থপর প্ররোচনায় ভুলিয়া যাইতাম। যদি আমার পুত্রেরা জীবিত থাকে, তাহা হইলে যে আমিই জীবিত থাকিব! অমরত্বলাভের নিমিত্ত তোমাদের কত লোক কত না ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত দেহখানা অমর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। তাহারই জন্য এত ছুটাছুটি, এত কোলাহল করিয়া থাকি। একবার আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আইস,তোমার দিব্যজ্ঞান হইবে।”

ভেকবালার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। ভাবিলাম, আত্মাকেই অমর বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেহখানাও কি অমর? তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যু, শব্দ দুইটার অর্থ কি? উত্তরটা ভেকবালাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ হইল। এজন্য প্রৌঢ়া চামেলীকে লইয়া প্রাণিরাজ্যে বেড়াইতে বাহির হইলাম। চামেলীকে সঙ্গে লইবার অপর অভিপ্রায় ছিল। তাহারাও আপনাদিগকে অমর ভাবে কি না,জানিবার ইচ্ছা হইল।

দেখিলাম, জীবনকালের আদি ও অন্তের নাম জন্ম ও মৃত্যু। ভাবিলাম, যদি জীবনটা কি, বুঝিতে পারি, তাহা হইলে উহার আরম্ভ ও শেষও বুঝিতে পারিব। কিন্তু জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া জন্ম মৃত্যু বুঝিতে গেলাম, পারিলাম না। যেমন শক্তি, জড় প্রভৃতি মূল বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তেমনই জীবন রূপ ব্যাপারকেও কয়েকটা বাঁধাবাঁধি শব্দে বুঝিতে পারা অসম্ভব। জীবনের কয়েকটা সংজ্ঞা দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের সীমা দেখিতে পাইলাম। কেহ বলিয়াছেন, যে সকল ক্রিয়া দ্বারা মৃত্যু নিবারিত হয়, তাহাই জীবন; কেহ বলিয়াছেন, সজীবদেহের অভ্যন্তরে নিয়ত যে সকল সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ চলে,তাহারই সমষ্টির নাম জীবন। কিন্তু এইরূপে যে সকল সংজ্ঞা নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারা ঠিক বস্তু নির্ণয় ঘটে না। যে কোন সংজ্ঞাই হউক, তাহাতে দেহ-শব্দ যোগ না করিলে উত্তরটা জটিল হইয়া পড়ে। আবার দেহ-শব্দ যোগ করিলে সংজ্ঞায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।

তবেই, যাহার আদি ও অন্তের কথা বুঝিতে যাইতেছি, সেইটাই বুদ্ধির অগম্য। কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা বাল্যকালে যত সহজ মনে হইত, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ততই দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে। জ্ঞান অসীম না হইলে, জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞাত না হইলে, সংজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ থাকে। নড়ন চড়ন দেখিয়া জীবিত কি মৃত, ঠিক করা অত্যন্ত স্থূলদর্শীর উপযুক্ত।

জীবনের সংজ্ঞা দিতে না পারিলেও, উহা

যে কি, তাহা কতকটা সকলেই জানি। জীবের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) জন্ম, বর্দ্ধন, পুষ্টি, অপত্যোৎপাদন ও মৃত্যু আছে। যে জীবই হউক, উহা প্রথমে অতীব ক্ষুদ্র থাকে; এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ-রূপ প্রখর দৃষ্টি ব্যতীত চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। বাহিরের বস্তু নিজসাৎ করিয়া একদিকে যেমন তাহা আকারে বড় হইতে থাকে, তেমনই উহার ভিতরে ভিতরে কত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সদ্যঃপ্রসূত কুক্কুরশিশু অপেক্ষা মানবশিশু আকারে বৃহৎ কিন্তু পুষ্টিতে হীন। শরীর পরিপুষ্ট হইলে যৌবন বলি; এই সময় সন্তান জন্মে। যৌবনের পর আর বৃদ্ধি বা পুষ্টি হয় না। তখন অবনতি আরম্ভ হইয়া কিছুকাল পরে দেহত্যাগ ঘটে। এইরূপে প্রত্যেক জীবে কয়েকটী ক্রিয়া চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কিন্তু জীবন-ক্রিয়াকে এইরূপে বুঝিতে গিয়া ও জন্মমৃত্যু বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা স্বতন্ত্র দেহকেই আমরা জীব বলিয়া জ্ঞান করি। এজন্য জীবের দেহ রচনা বুঝিবার আশায় ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম 'আমিবা', 'ইনফ্যুসোরিয়া' প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণীর দেহ এক-একটী কোষমাত্র। কতকগুলি প্রাণীর দেহে কোষ-সংখ্যা অধিক; কতকগুলির এত অধিক যে, দেহখানা বৃহৎ দেখায়। এই কোষগুলি যেন এক একখান ইট, আর দেহগুলা যেন এক একটা গৃহ। কোন গৃহে কোটি কোটি ইট লাগিয়াছে, এ গুলি বৃহৎ; কোন গৃহে তদপেক্ষা অল্প লাগিয়াছে, এ গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; আবার এমন গৃহ আছে, যাহাতে একখানির অধিক ইট নাই। এই শেষোক্ত এককোষ নির্ম্মিত জীবগুলি প্রায়ই আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু তিমি ও হস্তীর ন্যায় বিশাল দেহ প্রাণীই হউক, কিম্বা আণুবীক্ষণিক 'আমিবা' হউক, কেবল আকারের পরিমাণে ভিন্ন রচনায় ভিন্ন নহে। যেমন বৃহৎ অট্টালিকায় কোটি কোটি ইট লাগিলেও তাহা ইষ্টকপুঞ্জ মাত্র, তেমনই বিশাল-দেহ প্রাণীগণের শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ-সমষ্টি মাত্র। তবেই আমিবার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ পুঞ্জীকৃত হইলে বৃহৎ দেখাইতে পারে। ইটের মধ্যে ছোট বড় প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু সে প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর। উহার কোন কোনটাতে বালুকা কিম্বা মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকে সত্য, কিন্তু বালুকা ও মৃত্তিকা ব্যতীত ইটের অন্য উপাদান নাই। ইটের কোন কোনটা কঠিন, কোন কোনটা কোমল; আবার কোন কোনটা এত কোমল যে, তরলকর্দ্দমের ন্যায় দেখায়। বস্তুতঃ নানাজাতীয় জীবের দেহ রচনা দেখিয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা মনে হইল। এক-কোষ-নির্ম্মিত জীব সমূহ যেন এক একটা বিন্দু; কোন কোন জীবে সেই সকল বিন্দু একত্র হইয়া দীর্ঘ-রেখার আকার ধারণ করিয়াছে; কোনটার বিন্দুগুলি দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া ক্ষেত্র বা তল হইয়াছে; কোনটার তিন দিকে বিস্তৃত হইয়া ঘন আকার পাইয়াছে। প্রাণিরাজ্যে বিন্দু হইতেই একেবারে ঘন আকার দেখা যায়, উদ্ভিদরাজ্যে চতুর্ব্বিধ আকারই বর্ত্তমান। তবেই, কি স্থূল উপাদানে, কি দেহরচনায় প্রাণিগণের মধ্যে সবিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না।

দেখিলাম, জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলি ক্রিয়া দ্বারা দেহ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, অপরগুলি দ্বারা বংশ রক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারে আহার আবশ্যক বলিয়া উহা-

দের সামান্য নাম আহার-ক্রিয়া দেওয়া যাইতে পারে; শেষোক্ত গুলিকে সামান্যতঃ বিহার বলা যাইতে পারে। তবেই যে প্রাণীই হউক, আহার ও বিহার, এই দুই প্রকার ব্যাপারেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। আবার আহারেরও উদ্দেশ্য বিচার করিলে একমাত্র বিহারই অবশিষ্ট থাকে। বস্তুতঃ বংশরক্ষা ব্যতীত জীবের জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া গেল না। উহার আহার বিহার, স্থিতিগতি, যাবতীয় চেষ্টাই প্রজা-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিকে চলিতেছে।

ব্যবসায়-ভেদে জাতি-ভেদের উৎপত্তি, এ একটা পুরাণ কথা। নরসমাজে সভ্যতার গতি ব্যবসায়-ভেদের দিকে চলিতেছে। সকল লোকে সকল কাজ সুচারু সম্পন্ন করিতে পারে না। কার্য্যভেদ দ্বারাই কার্য্যের উন্নতি হয়। উপযুক্ত পাত্রে কাজ যতই পড়ে, কাজও তত ভাল হয়। সমাজ-বিজ্ঞানে ব্যবসায়-ভেদের যেমন আবশ্যকতা, জীবন-বিজ্ঞানেও তাই। 'আমিবাকে' তাহার সর্ব্বাঙ্গে সকল কাজ করিতে হয়। তাহার পৃথক্ হাত পা নাই, মুখ নাই, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই। ইহারা প্রাণিরাজ্যে অসভ্য প্রজা। তদপেক্ষা যাহারা সভ্য, তাহাদের দেহের কিয়দংশ শরীরের বর্দ্ধন ও পুষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত; অপর কিয়দংশ বংশ রক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। প্রথমোক্ত ক্রিয়াগুলির সম্পাদন জন্য দেহের অংশ-বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয়, শেষোক্ত ক্রিয়ার নিমিত্তও অন্য অংশ তদনুরূপ রূপান্তরিত হয়। এইরূপে প্রথমে হরগৌরী-রূপের উৎপত্তি। একই প্রাণীর বিহারাঙ্গের কিয়দংশ পুংস এবং কিয়দংশ স্ত্রী। প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা উন্নত, তাহাদের কোনটা বা পুংস; এবং কোনটা বা স্ত্রীরূপে পৃথক্ হইয়াছে।

দেখিলাম, 'আমিবা', 'ইন্‌ফুসোরিয়া' প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী স্বীয় দেহরূপ কোষখানিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বয়ং দুইটি কন্যাতে বিভক্ত হয়। কন্যাদ্বয় আহার দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে আবার দ্বিখণ্ডিত হয়। এইরূপে কন্যা প্রকন্যাদিরূপে প্রথম'আমিবা'বর্ত্তমান থাকে। প্রবালাদি কতকগুলি প্রাণীর দেহে স্ফোটক-সদৃশ কলিকা (bud) বহির্গত হয়। এই কলিকাগুলি কখনও বা পৃথক্ হয়, কখনও বা পুরুষ-পরম্পরা বহুকাল একত্র বাস করে। এইরূপে তাহাদের উপনিবেশের উৎপত্তি। জলৌকা শুক্তিকাদি কতকগুলি প্রাণীর এক একটা হরগৌরীরূপ (hermaphrodite); উহাদের প্রত্যেকে স্ত্রী পুংসত্ব উভয়ই আছে। অপর প্রাণীর স্ত্রী ও পুংস পৃথক্(diœcious) হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বতন হরগৌরীরূপের চিহ্নাদি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

স্ত্রী-পুংসে বিভক্ত প্রাণিগণের মাতা পিতার আকার প্রায়ই এত ভিন্ন যে, দেখিলেই তাহাদের কোন্‌টী স্ত্রী কোন্‌টী পুরুষ তাহা চিনিতে পারা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রাণী আছে যে, তাহাদের স্ত্রী পুরুষ, ভেদ করিতে পারা যায় না। অথচ দুইটী প্রাণীর সমাগম(conjugation)ব্যতীত সন্তান জাত হয় না। এস্থলে দুইটী কোষ মিলিয়া উভয়ে একটি সন্তানরূপে প্রকাশিত হয়। স্ত্রী পুরুষ ভেদ করিতে পারা যায় না বলিয়া উহাদিগকে একই মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের চোখে প্রভেদ দৃষ্ট না হইলেও যে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রভেদ থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না প্রভেদ না থাকিলে সন্তান প্রসবের জন্য দুইটী আবশ্যক হইবে কেন? তবেই জীবজগতে (প্রাণী ও উদ্ভিদ) বংশ রক্ষার ত্রিবিধ ব্যবস্থা দেখা গেল।

প্রাণিরাজ্যে বিহার-ব্যাপারে বিস্তর দেখিবার ছিল। একটা জোনাকী-স্ত্রী জলসিক্ত বাবলা গাছ হইতে লণ্ঠন লইয়া তাহার স্বামীকে ঘরে আলো দেখাইয়া আনিতেছিল। কয়েকটা পতঙ্গিনী কাঠঠকঠকি সন্ন্যাসীর ন্যায় দেহের কয়েকখান কাঠের ঠক্-ঠকিতে, অপর কয়েকটা বা ঝিঁঝিঁ শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বিরহ-বেদনা জানাইতেছিল, কয়েকটা পতঙ্গ কন্যা-হরণ করিয়া পথিমধ্যে বিবাহ করিল। এক ভেকযুবক ভেক কন্যার চীৎকারকে সুমধুর সঙ্গীত অনুভব করিয়া ভেক-কন্যার সমীপস্থ হইয়াছিল। পিকবর সহস্রাক্ষ পক্ষ বিস্তার করিয়া বধূর নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতেছিল। মৎস্য ব্যাঘ্র প্রভৃতি কতকগুলি স্বয়ম্বরারূঢ়া কন্যার পাণিগ্রহণ নিমিত্ত পরস্পর ভীষণ রণে ব্যাপৃত ছিল। এইরূপ নানাবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া বিহারে নিযুক্ত ছিল। সমুদয় দেখিবার অবসর হইল না।

স্ত্রীপুরুষ বিভক্ত কোন কোন প্রাণীর মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার লক্ষিত হইল। তাহাদের পুরুষ ব্যতীতও স্ত্রীগণের সন্তান জন্মিয়া থাকে। মধুমক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণী ব্যবসায় ভেদে তিন প্রকার। এক এক মধুমক্ষিকা সমাজে ২০।৩০ হাজার মক্ষিকা বাস করে। উহাদের মধ্যে ১টী স্ত্রী, ২।৩ শত পুরুষ, এবং অবশিষ্ট ক্লীব। সেই স্ত্রী-মক্ষিকাকে অনেকে রাণী বলিয়া থাকেন। যাহার বিশ ত্রিশ হাজার দাস, সে নিজে কোন কাজ করিবে কেন? যাহারা তাহা[র] প্রণয়-পাত্র, তাহারাও যে নরসমাজের ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় কেবল বিহার নিমিত্ত জীবন ধারণ করিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মক্ষিকা-সমাজে ইহারা না থাকিলেও প্রজা বৃদ্ধির বিঘ্ন ঘটে না। রাণীর বিবাহের পূর্ব্বে তাহার যে সকল ডিম্ব হয়, তাহারাই পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের পুরুষ হয়; এবং যেগুলি বিবাহের পরে জাত হয়, তাহারাই রাণী ও দাস হয়। যে সকল ডিম্ব হইতে মক্ষিকা-সমাজ রাণী পাইবার অভিলাষ করে, তাহাদের আবাস-গৃহ ও আহারের ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট করে। রাজভোগ পাইয়া রাণীর জন্ম হয়। আর যাহারা কায়ক্লেশে অনাদরে শৈশবে লালিত পালিত হয়, তাহাদের ভাগ্যে দাসত্বই ঘটে। যাহা হউক, দেখিলাম, এখানে বিবাহ না হইলেও কন্যা অপত্যোৎপাদন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে কুমারীর গর্ভাধান (parthenogenesis) বলিয়া থাকেন। চামেলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের রাজ্যও কানীন পুত্রের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কিন্তু বিবাহই যদি জীবনের শেষ উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্লীবত্ব কেন? দেখিলাম, যেমন প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনই কতকগুলি প্রাণী স্বজাতীয়ের বংশ রক্ষায় নিযুক্ত এবং অপরগুলি ভবিষ্য বংশীয়ের ভরণ পোষণ জন্য সচেষ্ট থাকে। তবেই এ বিষয়ে ইহারা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কালক্রমে যেমন আমাদের অংশবিশেষ ব্যস্ত (differentiated) হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযুক্ত হইয়াছে, তেমনই সমাজরূপ দেহ ব্যস্ত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ পুংস্ত্রীত্ব ব্যতীত ক্লীবত্ব পাইয়াছে। ক্লীবেরা সমাজের কেবল উপকার সাধন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নিজের সন্তান থাকে না। অপরের সন্তানকে নিজের সন্তান জ্ঞান করিয়া তাহার লালন পালন করিয়া থাকে। উন্নতির নিয়মই এই। যেমন ব্যবসায়ের ভিন্নতা অবলম্বন

ব্যতীত তাহার উন্নতি হয় না, তেমনই সমাজ-রূপ দেহের বংশরক্ষা ও আহার সংস্থান রূপ প্রধান দুই কার্য্যের ভিন্নতা সম্পাদন উন্নতির পরিচায়ক বলিতে হইবে। শুনিয়াছি নাকি কোন কোন সভ্য নরসমাজে বিবাহ তত প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ইহাদেরই বংশধরেরা ভবিষ্যতে ক্লীবদাসে পরিণত হইবে কিনা, বলিতে পারি না।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, মাতাই তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। কিন্তু পারাবতাদি কোন কোন প্রাণীর পিতাই শিশুর লালন পালনের ভার লইয়া থাকে। কোথাও বা পিতা মাতা এত নির্ম্মম যে, সন্তানকে পরের ঘরে রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বসন্তের প্রিয়সহচরী পরপুষ্টা পিকবধূর এ কলঙ্ক চির-প্রসিদ্ধ। সে যেমন নিজের সন্তানকে পর জ্ঞান করে, সন্তানও তেমনই পালক পিতামাতার সন্তানগুলিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

নররাজ্যে নবাবি চা'লে অনেকে চলেন। ভৃত্যে খাওয়াইয়া পরাইয়া না দিলে তাঁহাদের একদণ্ড চলে না। একপ্রকার লাল পিপীলি-কাও ভৃত্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য থাকিলে কি হয়, ভৃত্য নইলে খাবার মুখে, ধরে কে? ভৃত্য নইলে সন্তান পালন করে কে? বাস্তবিক দাস নইলে ইহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব। কাজেই দাসপুত্রকে শৈশবাবস্থা হইতেই ঘরে পুষিতে থাকে।

সাংসারিক ব্যাপারে পুরুষদিগকে যত পরিশ্রম করিতে হয়, রমণীদিগকে তত হয় না। রমণীগণকে সন্তান প্রসব, সন্তানের লালন পালন প্রভৃতি বংশরক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় সত্য, কিন্তু পুরুষদিগকে বিবাহের সময় উদ্যোগী হইতে হয়, রমণীর অনুসন্ধান ও স্থলবিশেষে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কাজেই প্রাণিরাজ্যে পুরুষ যত বলবান্ ও যাতায়াত-ক্ষম, মেয়েরা তত নহে। অনেক পতঙ্গের কেবল পুরুষদিগের ভাগ্যে পক্ষলাভ ঘটে, মেয়েরা ঘরকন্না করে, বেশী নড়িতে চড়িতে চায় না।

আর এক বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কতকগুলি প্রাণীর পুরুষ-পরিবর্ত্ত ঘটে। মনে করুন, ক পুরুষে স্ত্রী-পুংস দুইই আছে, কিন্তু উহাদের বিবাহে যে খ পুরুষের জন্ম হইল, তাহাতে স্ত্রী-পুংসত্ব কিছুই নাই। ইহাদিগকে ক্লীব বলিবার যো নাই; কেন না ক্লীবদিগের স্ত্রী-পুংসের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু অ-স্ত্রীপুংস খ পুরুষ হইতে আবার স্ত্রীপুংস ক পুরুষের জন্ম হয়। এইরূপে ক-খ-ক-খ ইত্যাদি ক্রমে ইহাদের পুরুষ-পরিবর্ত্ত (alternation of generations) ঘটে। চামেলী ও বলিল, তাহাদের এক বৃহৎ রাজ্যে এই প্রকার পুরুষ-পরিবর্ত্ত বিলক্ষণ আছে।

এই প্রকার কতই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিতে দেখিতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম। প্রত্যাবর্ত্তন কালে চামেলী বলিতে লাগিল, "প্রজাসৃষ্টির যে তিন প্রকরণ দেখিলে, তাহাতে তুমি আমি সকলে অমর নই কি? যাহারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া কন্যারূপ ধারণ করে, তাহাদের মৃত্যু কোথায়? যতদিন কন্যা প্রকন্যাদি জীবিত থাকে, ততদিন তাহারা অমর। উহাদের অপমৃত্যু ঘটে সত্য, কিন্তু অপমৃত্যু সামান্য নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। অপমৃত্যু না ঘটিলে উহাদের মৃত্যু হয় না। যাহারা কলিকা প্রসব করিয়া বংশরক্ষা করে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা। একটী প্রাণী দুইটী

অসমান ভাগে বিভক্ত হইলেই ক্ষুদ্রটীকে কলিকা বলা যায়। তৃতীয় প্রকরণে দেখিয়াছ, দুইটি বিভিন্নাকার প্রাণীর সংযোগে সন্তান জন্মে। কিন্তু এরূপ সংযোগ যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলিতে পার না, কেন না কুমারীরও সন্তান জন্মিতে পারে।

স্ত্রী পুরুষের সংযোগে সন্তান জন্মে। এটা অতি স্থূল কথা। স্ত্রী ও পুরুষের কোষ-বিশেষ (egg and sperm-cells) সংযুক্ত হয়, এটাও স্থূল। দেহের অন্যান্য কোষের ন্যায় পুংস্ত্রী কোষেও একটু জীবনাধার (Proto plasm) এবং তন্মধ্যে জীবকেন্দ্র (nucleus) থাকে। পুংস্ত্রী কোষের জীবনাধার মিশ্রিত হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিলে জানা যায়, জীবনাধারের সম্মিলন ব্যতীত জীবকেন্দ্রের একীভবন আবশ্যক। পূর্ব্বে উদ্ভিদ-রাজ্যে বীজের ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলাম। এখানেও দেখি তাই। একটী স্ত্রীকোষের জন্য বহু সংখ্যক পুংকোষ সৃষ্ট হয়। কিন্তু একটী মাত্র পুংকোষই স্ত্রীকোষের সহিত মিলিত হয়, অপরগুলি মধুমক্ষিকা সমাজের পুরুষগুলির ন্যায় অকর্ম্মণ্য থাকিয়া লুপ্ত হয়।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীকে ক্ষেত্র এবং পুরুষকে বীজের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে গেলে স্ত্রীকোষ হইতেই সন্তানের জন্ম, সেইটীই বীজ, পুংকোষ তাহাকে বলবান্ করে মাত্র। কুমারীর গর্ভধারণে পুরুষ আবশ্যক হয় না। দ্বিখণ্ডনে (fission) কিম্বা কলিকাধারণে (gemmation) পুরুষ কই?

দেখিলাম, আমরা সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ অর্থ লইয়া বিড়ম্বিত হই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যে তাহার জন্ম হয়, এমন নহে। তাহার পূর্ব্বে সে মাতৃ-দেহের কোষ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। কেননা মাতৃদেহ যত বড়ই হউক, কেবল কোষের সমষ্টি। পিতৃদেহও তাই; জীবিত অবস্থায় নূতন নূতন কোষের নিয়ত জন্ম হইতেছে, অনেক পুরাতন কোষ বিকৃত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া দেহ হইতে নির্গত হইতেছে। মাতৃকোষ-বিশেষ পিতৃকোষ-বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পর মাতৃকোষে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করে। উহার জীবকেন্দ্রের ও জীবনাধারের অণুর বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হয়, উহার নূতন কলেবর হয়; উহা নূতন শক্তিতে খণ্ডিত হইতে হইতে দুইটী চারিটী করিয়া বহু কোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশঃ উহারা ভ্রূণের আকার প্রকার গ্রহণ করিয়া গর্ভ হইতে বিচ্যুত হয়। কোথাও বা ভ্রূণের আকার পাইবার পূর্ব্বেই মাতৃকোষ (ovum) দেহ হইতে নির্গত হয়। দেহের বাহিরে সেই কোষ খণ্ডিত হইয়া ভ্রূণের আকার গ্রহণ করে। কোথাও বা মাতৃকোষ দেহ হইতে বাহির হইবার পরে পিতৃ-কোষের সহিত মিলিত হয়। যেমনই হউক, সর্ব্বত্রই সেই একই ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

তবেই, আমার সন্তানে আমিই জীবিত থাকি। আমাদের 'জায়া' শব্দেও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। যদি বৃক্ষের শাখা হইতে বৃক্ষ হয়, এই শাখাবৃক্ষকে নূতন বলিব কেন? যদি বল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুংকোষের সমাগমে স্ত্রীকোষে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়; সেই সময়েই জন্ম। কেন না, মাতৃদেহে স্ত্রীকোষের সত্ত্বা থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য থাকে না; পুংকোষের সংযোগেই উহা স্বতন্ত্রভাবে জীবনচক্র পরিবর্ত্তনে সমর্থ হয়। ইহারও উত্তর পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। কুমারীর গর্ভধারণে উপরি উক্ত তর্কের খণ্ডন হইতেছে। আবার ঐ অর্থ সর্ব্বত্র গ্রহণ করিলে, কোন কোন

প্রাণীর আদৌ জন্ম হয় না বলিতে হইবে। সুতরাং জন্ম শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিতে হইবে। এই অর্থে জীবের জন্ম প্রতিনিয়তই হইতেছে। যখনই কোন জীবের স্নীকোষের জন্ম হইতেছে, তখনই সন্তানের জন্ম বলিতে হইবে।

তবেই যদি বংশ থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু কোথায়? আমার আমিত্ব চলিয়া যায় কি না, তাহা মনোবিজ্ঞানবিদেরা বিচার করিবেন। সর্ব্বদেহ বিকৃত হইলেই মৃত্যু বলিয়া থাকি। কিন্তু যখন দেহের ক্ষুদ্রাংশও জীবিত থাকে, তখন তাহার মৃত্যু কোথায়? ক্ষুদ্রাংশ বলিয়া যদি আপত্তি কর, তাহাতেও মূল কথার অন্যভাব দেখা যায় না। কেন না সর্ব্বদেহ নিয়ত এক থাকে কই! অণুর পর অণু নিরন্তর দেহ হইতে চলিয়া পঞ্চভূতে মিশিতেছে, অণুর পর অণু ভৌতিক জগৎ হইতে দেহে আসিয়া বাস করিতেছে। বস্তুতঃ দেহখানিকে সাগরের তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তরঙ্গের রূপ আছে, কিন্তু যে যে জলকণায় এই মাত্র এই তরঙ্গটীর উৎপত্তি, পরক্ষণে তাহারা মিলিয়া গিয়াছে। দেহরূপ তরঙ্গের কণিকাও স্থায়ী নহে। পুনশ্চ, জলের তরঙ্গ একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, কিন্তু জল-কণিকার স্থানচ্যুতি ঘটে না, তরঙ্গের রূপেরই গতি হইয়া থাকে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের দেহরূপ তরঙ্গে যে সকল অণু ছিল, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই সে গুলি স্থায়ী ছিল না, আমাতেও সেই গুলি নাই, কিংবা আমার সন্তানেও সেগুলি থাকিবে না। কিন্তু যে তরঙ্গ সেই তরঙ্গই আছে। নির্ব্বংশ হইলে সেই তরঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটে। এই জন্যই হয়ত বা শাস্ত্রকারেরা উহাকে এত দূষণীয় মনে করিয়াছিলেন।"

ব্যক্তিত্ব-আকারে ২০।২২ বৎসর পরে আমাদের দেহবৃদ্ধি শেষ হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তির লম্বোদর দেখিলে দেহবৃদ্ধি বুঝায় না। উদরে মেদ-সঞ্চয়কে দেহবৃদ্ধি বলিলে পুরু কাপড় পরিলেও ক্ষীণ ব্যক্তির দেহ বৃদ্ধি হয়। যৌবনের পর দেহ বাড়িল না; ইহাতেই সেই দেহ-তরঙ্গের স্থায়িত্ব-কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। জীবনকালে দেহের যেমন ক্ষয়, তাহার তেমনই পূরণ হয়। অবিরত ক্ষয় পাইতে থাকিলে দেহ থাকিবে কেন? আর দেহ না থাকিলেই বা জীবনী-শক্তি থাকিবে কেন? শৈশবে ক্ষয় অপেক্ষা পূরণ অধিক, কাজেই দেহ বাড়িতে থাকে। যৌবনের পর ক্ষয় ও পূরণ সমান চলিতে থাকে, দেহ-বৃদ্ধিও শেষ হয়। ইহার পর, পূরণ অপেক্ষা ক্ষয় অধিক হয়, বার্দ্ধক্যের জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি দেহের ক্ষয় পূরণ করিবার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিত, তাহা হইলে দেহের বিনাশ হইত না।

কিন্তু ক্ষয় পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকে না কেন? যে ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা যায় কেন? কেহ কেহ বলেন, দেহে ক্ষয়িত পদার্থ সঞ্চিত হয়। কিন্তু কেন হয়? ক্ষয়িত পদার্থ দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল, সে ক্ষমতা যায় কেন? এখানে রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর কথা বলা যাইতেছে না। রোগে মৃত্যু, অপমৃত্যু মাত্র। জলে ডুবিয়া কিম্বা আগুনে পুড়িয়া মরাও যা, রোগ বিশেষে মরাও তা। বার্দ্ধক্য জরা আসিয়া যে মৃত্যু ঘটায়, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। কিন্তু এ মৃত্যু হয় কেন?

এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত চিন্তায় মন দোলিত হইতেছিল, কখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, জানিতে পারি নাই। গত সন্ধ্যায়

বৃষ্টির পর, আকাশ পরিষ্কার, গাছপালা সমুদয় পরিষ্কার। বাসারুণও সময় বুঝিয়া পরিষ্কার আলো ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাত্রের কথা আরও পরিষ্কার স্মরণ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, সকল স্বপ্নই কি অমূলক চিন্তা মাত্র!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বৌদ্ধ-দর্শন।

অনাথপিণ্ডিকা বৌদ্ধ সঙ্ঘের নামে শ্রাবস্তি নগরের জেতবন বিহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথাগত অনেক দিন এ জেত বনে বাস করিয়াছিলেন। একদার তথাগতের তথায় বাস করিবার সময় মালুঙ্কপুত্রের মনে একটী সন্দেহের উদয় হয়। তথাগত কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করেন নাই। পৃথিবী চিরস্থায়ী কি অচিরস্থায়ী, অনাম কি সসীম; দেহ ও আত্মা এক কি ভিন্ন, মৃত্যুর পরে ধার্ম্মিক সাধুগণ থাকেন কি থাকেন না। মালুঙ্কপুত্র তথাগতের নিকট আপন সন্দেহ নিবেদন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, এ সন্দেহের নিরাকরণ করা না হইলে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

তথাগত বলিলেন, মালুঙ্কপুত্র, যদি কেহ বিষাক্ত বাণে আহত হয় এবং তাহার আত্মীয় স্বজন চিকিৎসক ডাকিয়া আনে এবং চিকিৎসক যদি বাণ বাহির করিতে চায়, কিন্তু আহত ব্যক্তি যদি বলে যে আমি এ বাণ বাহির করিতে দিব না, যতক্ষণ আপনি না বলিবেন যে, যে এই বাণ মারিয়াছে সে ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র, অথবা যতক্ষণ না বলিবেন, তাহার নাম ও গোত্র কি, অথবা যতক্ষণ না বলিবেন যে,সে দীর্ঘ, হ্রস্ব না মধ্যমাকার; কৃষ্ণ, গৌর, না পাণ্ডুবর্ণ, এ গ্রামবাসী না গ্রামান্তরের, পল্লিবাসী না নগরবাসী; যে ধনুকে বাণ মারিয়াছে তাহা চপ না কোদণ্ড, তাহার ছিলা বাঁশ, লতাতন্তু না মৌর্ব্বী নির্ম্মিত, সে শরে গৃধ, শ্যেন, ময়ূর না শিথিল হমুর পুচ্ছ ছিল, সে শর বেকণ্ড, আয়স, বৎসদন্ত না করবীরপত্র? মালুঙ্কপুত্র! প্রশ্নের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। সেইরূপ যে বলিবে, জগৎ নিত্য কি অনিত্য, আত্মা আছে কি নাই, না জানিলে আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিব,তথাগত তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে তাহারও মৃত্যু হইবে।

জগত নিত্য একথার উপর জীবনের পবিত্রতা নির্ভর করে না, জগত অনিত্য একথার উপরও নির্ভর করে না, মরত্ব বা অমরত্ব, দেহাত্মার ভিন্নতা বা একতা, পৃথিবীর সান্তত্ব বা অনন্তত্ব এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার উপর পবিত্র ধর্ম্ম জীবন নির্ভর করে না,এজন্য শিষ্যদিগকে কোন্ কথা শিখাইতে হইবে, কোন্ কথা শিখাইতে হইবে না, তথাগত সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন। আমি কোন্ কথা তোমাদিগকে শিখাই নাই? আমি শিখাই নাই জগৎ নিত্য, শিখাই নাই জগত অনিত্য, শিখাই নাই দেহ ও আত্মা অভিন্ন, শিখাই নাই দেহ ও আত্মা ভিন্ন, শিখাই নাই মৃত্যুর পরে সাধু নবজীবন লাভ করে বা করে না, শিখাই নাই সে কল্পে ও করে না। কেন শিখাই নাই?

শিখাই নাই যে ধর্ম্মজীবনের মূল সূত্রের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, শিখিলে কোন উপকার নাই, বৈরাগ্য, রিপুবিনাশ, নিষ্কামতা, শান্তি, প্রজ্ঞা ও নির্ব্বাণ লাভে তাহাদের শিক্ষায় কোন সাহায্য হয় না। আমি তোমাদিগকে কি শিখাইয়াছি? আমি শিখাইয়াছি যে, সংসার দুঃখময়, দুঃখের কারণ শিখাইয়াছি, দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় শিখাইয়াছি। কেন শিখাইয়াছি? এ সকল শিখিলে উপকার হয়, ধর্ম্ম জীবনের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আছে, বৈরাগ্য, রিপুবিনাশ, নিষ্কামতা, শান্তি, প্রজ্ঞা ও নির্ব্বাণ লাভে ইহারা সহায়তা করে।

(মধ্যম নিকায় মালুঙ্ক পুত্র সূত্র।)

জেতবন বিহারে পরিব্রাজক বৎস এক দিন তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌতম, আপনি কি বলেন জগত নিত্য এবং এই মতটাই সত্য আর সব ভুল? তথাগত বলিলেন, আমার মত নয় যে জগত নিত্য বা এই মতটী ঠিক আর সব মত ভুল। আপনি কি বলেন জগত অনিত্য? আমার মত নয় যে জগত অনিত্য, বা এই মতটী ঠিক আর সব ভুল। জগত নিত্য বা অনিত্য, সান্ত বা অনন্ত, দেহ ও আত্মা এক বা ভিন্ন, জীব অমর বা মরণশীল, এই সকল মতে কি আপত্তি আছে যে আপনি তাহাদের কোনটী গ্রহণ করেন না? বৎস! এ সকল মতবাদ জটা জটিল, দুঃখের বৃদ্ধিকারক, বৈরাগ্য, শান্তি, প্রজ্ঞা বা নির্ব্বাণের উপাদেয় নহে, এজন্য ইহাদের কোনটি আমি গ্রহণ করি নাই। তবে আপনার কি নিজের কোন স্বতন্ত্র মত আছে? বৎস! তথাগত মতবাদশূন্য, তিনি কেবল সংস্কার, সংস্কারের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত আছেন, সংজ্ঞা, সংজ্ঞার উৎপত্তি ও বিনাশ; অনুভূতি, অনুভূতির উৎপত্তি ও বিনাশ; বাসনা, বাসনার উৎপত্তি ও বিনাশ এবং জ্ঞান, জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত আছেন। এই জন্য তথাগত মায়া অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন। গর্ব্বিত অহংবাদ তাঁহাকে চিন্তিত বা কল্পনাকাতর করিতে পারে নাই। অভেদবাদ বা আত্মবাদ বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গৌতম! যে এই মোক্ষ প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছে, তাহার পুনর্জ্জন্ম কোথায় হয়? তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় বলা ঠিক নহে। তবে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না? তাহা বলা ঠিক নহে। তবে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং না হয় তাও নহে? তাহা বলা ঠিক নহে। গৌতম আমি কি বুঝিব, বুঝিতে পারিতেছি না, বড়ই গোলমাল বোধ হইতেছে, আপনার পূর্ব্বের কথায় মনেতে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে।

বৎস! চিন্তিত, ভীত বা ত্রাসিত হইওনা। আমার মত বড় গভীর ও দুর্জ্জেয়, কেবল বুদ্ধির প্রখরতায় বুঝা যায় না। অতি সূক্ষ্ম, কেবল প্রজ্ঞাবানের অধিগম্য। তুমি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, শিক্ষা দীক্ষা সাধনা ভিন্ন গুরুর উপদেশে তোমার ভিন্ন হইয়াছে। আমি তোমাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিব। তুমি যেরূপ বুঝ সেইরূপে উত্তর দিবে। তোমার সম্মুখে যদি আগুন জ্বলে, তুমি কি জানিতে পার যে তোমার সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছে? পারি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সে আগুনের উপাদান কি? আমি বলিব তৃণ বা কাষ্ঠ। আগুন নিবিয়া গেলে বুঝিতে পারিবে? পারিব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে সে আগুন কোন দিকে চলিয়া গেল? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব না পশ্চিম? কি বলিবে? এরূপ প্রশ্ন ঠিক নয়। যে তৃণ বা কাঠে আগুন জ্বলিতেছিল, সে তৃণ

বা কাঠ শেষ হইলে এবং নূতন উপাদান না পাইলে আমরা বলি যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে।

বৎস! যে সংস্কারে সাধুর জীবিততা নির্দ্দেশিত, হয় যখন সে সমুদয় সংস্কার পরিত্যক্ত ও তাল বৃক্ষের ন্যায় নির্ম্মূল হয়, যখন সমুদয় সংজ্ঞা, সমুদয় অনুভূতি, সমুদয় বিজ্ঞান পরিত্যক্ত, নির্ম্মূল, ও তাল বৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হয়, তখন তাহার পুনর্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। সংস্কার, সংজ্ঞা, অনুভূতি, কর্ম ও বিজ্ঞান মুক্ত ভিক্ষু মহাসাগরের ন্যায় সুগভীর, অপরিমেয় ও অতলস্পর্শ। তাঁহার পুনর্জন্ম হয়, এ কথা বলাও ঠিক নহে, হয় না বলাও ঠিক নহে, হয় এবং হয় না, এমন বলাও ঠিক নহে।

(মধ্যম নিকায় অগ্নিবৎস গোত্রসূত্র)

রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—আপনার নাম কি? লোকে আমাকে নাগসেন বলে। পিতা মাতা নির্দ্দেশ করিবার সুবিধার জন্য নাগসেন সুরসেন বীরসেন বা সিংহসেন বলিয়া ডাকেন, এটী নাম মাত্র, এ নাম কোন বস্তু বা আত্মার নির্দ্দেশক নহে। ভদন্তে নাগসেন! আত্মা যদি না থাকে, এই ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রয়োজনায় আহার শয়ন বস্ত্র ঔষধ কে সংগ্রহ করিয়া দেয়? কে ব্যবহার করে? কে ধ্যান সমাধি সাধন করে, অষ্ট সম্মার্গ পঞ্চশীলা ও নির্ব্বাণ কাহার সাধ্য? কে হিংসা করে, চুরি করে, মিথ্যা বলে, মাদক সেবন করে, অধর্ম্মাচরণ করে? পাপ নাই, পুণ্য নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই, পাপকারী ও পুণ্যকারী কেহ নাই। ভিক্ষুকে বধ করিলে কেহ নরঘাতক হয় না, গুরু শিষ্য বিনয় নাই। ভন্তে! আপনি বলিলেন লোকে আপনাকে নাগসেন বলিয়া ডাকে, আপনার মস্তকের কেশ কি নাগসেন না শরীরের লোম? নখ, দন্ত, চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, পেশী, হস্ত, মুখ, পা, মাথা, সংজ্ঞা, অনুভূতি বিজ্ঞান, কে নাগসেন? ইহারা প্রত্যেকে ব্যষ্টি ভাবে বা ইহাদের সমষ্টি অথবা এ সকলের অতীত কি কিছু নাগসেন? না। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, নাগসেন বলিয়া কেহ এখানে নাই। নাগসেন একটী শূন্য গর্ভ শব্দ মাত্র। ভন্তে! আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন—নাগসেন বলিয়া কেহ নাই।

মহারাজ! আপনি সুকুমারদেহ। পদব্রজে ভ্রমণ করিতে আপনার নিতান্ত কষ্ট হয়। আজ আপনি এখানে কি পদব্রজে আগমন করিয়াছেন, অশ্বারোহণে, গজারোহণে না রথারোহণে? আমি রথে চড়িয়া আসিয়াছি। আপনি রথারোহণে আসিয়াছেন, মহারাজ! রথ কি? যূপ, চক্র, নেমী, আকার, পতাকা, বলগা, ইহার কোনটীকে রথ বলে? ব্যষ্টিভাবে এক একটী না সকলগুলি একত্র করিলে রথ হয়? রথ কি এ সকলের মধ্যে আছে, না ইহাদের অতীত কিছু? মহারাজ! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, রথ ত কোথায় নাই। রথ একটী সারশূন্য শব্দ মাত্র; রথ কোথায়? রথ ত নাই! আপনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। আপনি রাজাধিরাজ, কাহার ভয়ে মিথ্যা কথা বলিলেন? ভন্তে! আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। রথ একটী নাম, যূপচক্র, নেমী, ধ্বজ রথাকার প্রভৃতির সমষ্টিকে নির্দ্দেশ করে। মহারাজ! আপনি সত্য বলিয়াছেন, কতকগুলি পদার্থের সংযোগকে যেমন রথ বলে, তেমনি দেহ আকার নখকেশের সংযোগকে নাগসেন বলে। নাগসেন একটী শব্দ মাত্র, কোন বস্তু, সত্তা পুদ্গল বা আত্মাকে নির্দ্দেশ করে না। গৃহে বলিলে কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতির

সংযোগ বিশেষ বুঝায়, এক একটী করিয়া দেখিলে গৃহ বলিয়া কিছু পাওয়া যায় না। কাষ্ঠ তৃণ গৃহ নহে, ইহাদের অতীতও কিছু নহে। সংযোগ বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার উপায় একটী শব্দ মাত্র গৃহ। তেমনি কতকগুলি চির পরিবর্ত্তনশীল সংস্কারের সংযোগ বিশেষকে নাগসেন বলে, সংস্কারের অতীত কোন বস্তু সত্তা পুগগল বা আত্মা নির্দ্দেশ করে না।

(মিলিন্দ প্রশ্ন।)

আত্ম বস্তু হয় ধ্বংস হয়, না হয় বলিতে হইবে হয় না। ধ্বংস হয় বলিলে নাস্তিকতা আসে, না হয় বলিলে অপরিবর্ত্তন শীলতা বুঝায়। উভয়ই দোষাবহ। ক্ষীরের পূর্ব্বাবস্থা দুগ্ধ। তেমনি জগতে কিছুই নাই, যাহার পূর্ব্বাবস্থা ছিল না। সংস্কার সংযোগ বা পদার্থ মাত্র পরিবর্ত্তনশীল, সকলই হইতে যাইতেছে, কিন্তু হইবার পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তিত হয়, পূর্ণতা পায় না। সকলই ভব, ভূত কিছুই নাই। কেহ বলে সংজ্ঞাই আত্মা, কেহ বলে সংজ্ঞা আত্মা নহে। যে সংজ্ঞাকে আত্মা বলে তাহাকে বলিতে হইবে, সংজ্ঞা তিন প্রকার — আনন্দ সংজ্ঞা, নিরানন্দ সংজ্ঞা, নির্ব্বন্দ্ব সংজ্ঞা। আনন্দ সংজ্ঞা হইলে নিরানন্দ বা নির্ব্বন্দ্ব সংজ্ঞা থাকে না। আনন্দ সংজ্ঞা চির দিন থাকে না, নিরানন্দ সংজ্ঞাও চির দিন থাকে না, নির্ব্বন্দ্ব সংজ্ঞাও চির দিন থাকে না। সংজ্ঞা মাত্র পরিবর্ত্তনশীল, কারণে কার্য্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আনন্দের সংজ্ঞা হইলে লোকে বলে এই আমার আত্মা। আনন্দ চলিয়া গেলে বলে আমরা আত্মা চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ অন্যদের সম্বন্ধে। সুতরাং যাহারা সংজ্ঞাকে আত্মা বলে, তাহারা বিশ্বাস করে যে এক জীবনেই আত্মার পরিবর্ত্তন, উদয় ও অস্তগমন হয়। সংজ্ঞার বিনাশ হইলে তাহাদিগকে বলিতে হয়, আত্মার বিনাশ হইয়াছে। যাহারা বলে, আত্মা সংজ্ঞাতীত, আত্মার কোন সংজ্ঞা নাই, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, যাহাদের সংজ্ঞা নাই তাহাদের কি আত্মা আছে? সংজ্ঞাই আত্মা বা আত্মা সংজ্ঞাশূন্য, এ উভয় বাদই ভ্রান্ত।

(দীর্ঘ নিকায় মহানিদান।)

জেতবন বিহারে সারিপুত্র থাকিবার সময় যমক নামে একজন ভিক্ষু বলিয়াছিলেন যে, তথাগতের অভিপ্রায় আমি এইরূপ বুঝি, দেহ নাশ হইলে নিষ্পাপ ভিক্ষুর লয় হয়, মৃত্যুর পরে আর পুনর্জ্জীবন হয় না। সারিপুত্র তাঁহাকে বলিলেন ভ্রাতঃ। সংজ্ঞা অনুভূতি বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার মাত্র পরিবর্ত্তনশীল-সুতরাং দুঃখময়। সংজ্ঞা বা অনুভূতি বা বিজ্ঞান দেহ রূপ নাম বা আকার ভিক্ষু নহে। ইহাদের সমষ্টিও নহে, ইহাদের অতীতও কোন পদার্থকে ভিক্ষু বলে না। ভিক্ষু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। সংস্কারের সংযোগ বিশেষের নাম ভিক্ষু। সুতরাং এ জীবনেই ভিক্ষুর কোন সত্তা নাই। এ জীবনেই যাহার সত্তা নাই, পরজীবনে তাহার সত্তা থাকে না, এ কথা বলা উচিত নহে। বলিলে এ জীবনে ভিক্ষুর সত্তা আছে স্বীকার করা হয়।

(সংযুক্ত নিকায়)

পঞ্চ ছ বর্গীয়দিগকে তথাগত বলিলেন, আকার, সংজ্ঞা অনুভূতি, কর্ম্ম বা বিজ্ঞান ইহাদের কেহই আত্মা নহে। ইহারা সকলেই পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তন দুঃখের কারণ, যাহা ক্ষণভঙ্গুর, পরিবর্ত্তনশীল, দুঃখময়, তাহাকে আপনার বলা, আত্মা বলা, যুক্তিসঙ্গত নহে। এ সকলকে ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্ত্তনশীল ও দুঃখময় জানিয়া ভিক্ষু ইহাদিগকে উপেক্ষা করেন, ঘৃণা করেন। এই ঘৃণাহেতু তিনি

মোহ হইতে নিষ্কৃতি পান, স্বাধীনতা লাভ করেন, মোহবিমুক্ত ব্যক্তি আপনাকে মোহ বিমুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার পুনর্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, তিনি জীবন পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন, সংসারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মহাবর্গ।

নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! যে শিশুকালে দোলায় শুইয়াছিল আর আমার সম্মুখে শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত এই আপনি এ দুজনে কি ভিন্ন? ভিন্ন। নাগসেন বলিলেন তাহা হইলে আপনার পিতামাতা শিক্ষক কিছুই নাই। জরায়ুবাসী ভ্রূণ ও আপনি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একত্ব লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! যদি কেহ দীপ জ্বালে, সে আলোক সারারাত্রি জ্বলিবে কি না? জ্বলিবে। প্রথম রাত্রের আলোক ও মধ্য রাত্রের আলোক একই পদার্থ কি না? না। মধ্য রাত্রের আলো ও শেষ রাত্রের আলো একই পদার্থ কি না? না। তবে কি প্রথম রাত্রে একটী আলো, মধ্যরাত্রে আর একটী ও শেষ রাত্রে অপর একটী আলো জ্বলিয়াছিল? না, সংস্রব সূত্রে, প্রথম ও মধ্যম ও শেষ রাত্রের আলোক একসূত্রে সম্বন্ধ। এইরূপে অবস্থা সকল ক্রম পরম্পরায় এক সূত্রে আবদ্ধ। ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী সম্বন্ধ থাকে। একটীর লয় হইলে, অব্যবহিত পরে অন্যটীর উদয় হয়। তাহারা একও নহে, ভিন্নও নহে। দুগ্ধ, দধি, মাখম ও ঘৃত ভিন্ন হইলেও এক, এক হইলেও ভিন্ন, একের বিনাশে অব্যবহিত পরে অন্যের উৎপত্তি। এক জন্মের সহিত অন্য জন্মের সম্বন্ধ এইরূপ। মোহর ও মোহরের ছাপ এক হইলেও ভিন্ন, ভিন্ন হইলেও এক। সংস্কার সকলের একরূপ সমবায়ে জীবের এক অবস্থা, অন্যরূপ সমবায়ে ভিন্ন অবস্থা। আত্মা না থাকিলেও জীবের জন্মান্তর লাভ বুঝিতে কষ্ট হয় না। দুধের আত্মা আছে কেহ বলেন, অথচ দুধ হইতে দধি হয়, ইহা সকলে বিশ্বাস করে। একরূপে দুগ্ধ অন্যরূপে দধি। মোহরের কর্ম্মফলে ছাপ, মনুষ্যের কর্ম্মফলে দেবত্ব বা পশুত্ব। জীবের জীবন পরিমাণ একটি চিন্তাকাল। চক্র ঘুরিতে একটি বিন্দুর উপর ঘোরে, বিশ্রাম করিতেও একটি বিন্দুর উপর বিশ্রাম করে। একটি চিন্তা মুহূর্ত্ত এক জনের জীবন, দ্বিতীয় চিন্তার উদয় মাত্র সে জীব জন্মান্তর গ্রহণ করে, স্বতন্ত্র জীব হয়। সুতরাং জন্মান্তরের জন্য মৃত্যুর আবশ্যকতা নাই।

অশিক্ষিত লোকেও দেহের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারে। জন্ম, বৃদ্ধি ও লয় বুঝিতে পারে, বুঝিয়া দেহকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখে। কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন অশিক্ষিত লোকে বুঝেনা, এ জন্য এই মন আমার, ইহা আমার আত্মা বলিয়া তাহার মোহ জন্মে। মনকে আত্মা না ভাবিয়া দেহকে আত্মা ভাবিলে অশিক্ষিত লোকের উপকার হইত, তাহার এ মোহ জন্মিত না। দেহাত্মবাদে তাহার ঘৃণা জন্মিত, অথচ দেহ দশ কুড়ি সত্তর আশী একশত বা ততোধিক বর্ষ থাকে, কিন্তু মনের নিত্য পরিবর্ত্তন। দিন রাত মনের পরিবর্ত্তন চক্র ঘুরিতেছে। এক মুহূর্ত্তের মন পর মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়। সুখস্পর্শ দ্রব্যের সংস্পর্শে আনন্দের সংজ্ঞা হয়, সে সংস্পর্শ চলিয়া যাইবামাত্র নিরানন্দের সংজ্ঞা। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি, বিয়োগে অগ্নির লয়। ইহা বুঝিয়া ভিক্ষু স্পর্শকে ঘৃণা করেন, সংজ্ঞাকে ঘৃণা করেন, অনুভূতি ও

বিজ্ঞানকে ঘৃণা করেন। এই ঘৃণা হইতে মোহ নাশ, তখন আর এ সংসারের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব থাকে না। সংযুক্ত নিকায়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

চরিত্র-নির্ণয়।

১। উপক্রমণিকা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লক্ষণ ও চিহ্নের দ্বারা চরিত্র কথন প্রথা অতি প্রাচীন কাল অবধি সকল দেশেই চলিত আছে। অস্মদ্ দেশেও সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিলক্ষণ সম্মান ছিল, এমন কি কোন ব্যক্তিকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অথবা বিবাহের পাত্র বা কন্যা স্থির করিতে হইলে, তাঁহাদের অবয়ব উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া চরিত্র নির্ণয় করা হইত। পূর্ব্বে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও কতক পরিমাণে আছে যে, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি অবয়বাদির লক্ষণের দ্বারা চরিত্র কথনে সক্ষম; বস্তুতঃ সামুদ্রিক শাস্ত্র যে বিজ্ঞান বিশেষ এবং সকলেই আয়ত্ত করিতে পারেন, এ বিশ্বাস এখন পর্য্যন্ত অনেকের নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত এরিষ্টটল্ এই শাস্ত্রের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং ইহার প্রচার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ঈশ্বর সৃষ্ট সকল দ্রব্যের মধ্যেই জাতি-গত ও বংশগত বিভিন্নতা আছে। একের সহিত অন্যের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ জগতে সকল প্রকারে এক রকমের দুই জন মনুষ্য নাই বলিয়াই, অবিকল এক প্রকার চরিত্র-সম্পন্ন দুই জন লোক পাওয়া দুর্লভ। এইরূপ আকৃতি ভেদ লক্ষ্য করিয়া চরিত্র নির্ণয় করা আমাদিগের একটী প্রাকৃতিক ক্ষমতা। শৈশব কাল হইতেই আমরা এই ক্ষমতা অল্প বিস্তর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিতে পাই যে, অপরিচিত হইলেও কোন বিশেষ লোকের নিকট শিশুগণ আহ্লাদের সহিত গমন করে, এবং কোন কোন ব্যক্তির নিকট সহজে যাইতে চাহে না। আমরাও জানি যে, সম্যকরূপে অপরিচিত এবং আমাদের কার্য্য কলাপের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট না হইলেও, কোন কোন লোকের উপর আমাদের কেমন এক প্রকার ক্রোধ, ঘৃণা বা ভালবাসার উদয় হয়। বন্ধু বান্ধবের সহিত পথে চলিতে চলিতে আমরা প্রায়ই এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকি "লোকটার কি কুৎসিত চেহারা।", "আহা কেমন চেহারা দেখ, দেখিলেই ভক্তি হয়।" সামুদ্রিকের নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমরা এই সকল কথা বলি না বলিয়া উহা একেবারে অর্থশূন্য নহে। বিখ্যাত উপাখ্যান লেখক চার্লস ডিকেন্স বলেন * "লক্ষণ-তত্ত্বে আমরা স্বভাব-পণ্ডিত। প্রথম সংস্কারকে মনে পোষণ না করিয়া ভ্রান্ত-উদারতায় আমরা কুলক্ষণাক্রান্ত লোকের সংসর্গ উপেক্ষা করি না, তখন তাহারা আমাদিগকে প্রতারণা করিবার সুযোগ পায়।"

চরিত্র-নির্ণয় ক্ষমতা যখন স্বাভাবিক, তখন

* We are all natural physiognomists. Our fault lies not in heeding our instinct or first impression sufficiently by allowing *people to come too near tous and by this* false action explaining away their real character.

আমরা অল্প আয়াসেই, বিজ্ঞান সাহায্যে আলোচনা দ্বারা, এই শাস্ত্র আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হইতে পারি। কোন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, সর্ব্বদা তাহার কার্য্য কলাপ ও মানসিক প্রবৃত্তি সকল লক্ষ্য করিয়া চরিত্র নির্ণয় করা অপেক্ষা এই শাস্ত্রের সাহায্যে অল্প সময় মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লওয়াই শ্রেয়। ইহাতে কোন প্রকার প্রতারণার সম্ভাবনা নাই। অল্পমাত্র পরিশ্রমে দেখা যাইবে যে, কোন্ ব্যক্তির কোন্ প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি হয় নাই, কোন্ প্রকৃতির কোন্ গুণ উপযুক্ত সুবিধার অভাবে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারিতেছে না, কোথায় বাহ্যিক পৌরুষ স্বভাবের ভিতর ঔদার্য্যাদি গুণ সকল অন্তর্নিহিত আছে। প্রত্যুতঃ লক্ষণ দ্বারা চরিত্র নির্ণয় অসম্ভব বোধ হইলেও ইহা যে সম্ভবপর এবং সকল মনুষ্যেরই আয়ত্তাধীন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, বোধ হয় আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। বরাহ মিহির বলিয়াছেন,* "মনুষ্য ও পশু পক্ষী লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, জীবগণের আকৃতিই তাহাদিগের শুভাশুভ প্রকাশ করে, যেমন স্ফটীক নির্ম্মিত ঘটের মধ্যগত প্রদীপের প্রভা বাহিরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রাণীগণের অন্তর্গত তেজ ও গুণ বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এই প্রবন্ধে আমরা মস্তক ও মুখের লক্ষণের বিষয়ই আলোচনা করিব। ইংরাজীতে Physiognomy ও Phrenology দুই চিহ্ন প্রতীয়মান হয়; সেই কারণে এ দুইটী বিভিন্ন শাস্ত্র হইলেও একের অভাবে অন্যটী সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। বদনমণ্ডলের লক্ষণ সমূহ ও তথাকার প্রত্যেক অস্থির বিবৃত্তির দ্বারা মানসিক প্রবৃত্তির প্রাখর্য্য এবং তৎসমুদয়ের উন্নতির প্রধান কারণ শারীরিক-কার্য্য কারিতার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। কপটতার গাঢ় আবরণের ভিতর হইতেও, একজন দক্ষ ব্যক্তির নিকট অন্তর্নিহিত প্রকৃতি স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বাল্যকাল হইতে অদম্য ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে প্রকৃত মনের ভাব অহরহঃ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও অন্যান্য চিহ্নাদির পরিস্ফুটনের সহিত কপটতা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

মুখমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন রেখা সকল উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া, বিরুদ্ধ ভাবাত্মক চিহ্নাদি তুলনা করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের পারিমাণিক উৎকর্ষতা বিচার করিয়া, মনুষ্যের চরিত্র নির্ণয় করা আয়াস-সাধ্য, ইহা সর্ব্বদা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। কাহারও বদনে কোন বিশেষ চিহ্নের আতিশয্য হেতু হঠাৎ কোন বিশেষ গুণের অস্তিত্ব বা প্রাখর্য্য বলা কোন মতেই উচিত নহে। কারণ মনুষ্যমাত্রেই অবস্থার দাস। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত স্বভাব ও চরিত্র পরিবর্ত্তনের উদাহরণ আমরা নিয়তই দেখিতে পাই। এরূপ অনেক দেখা যায় যে, কোন সম্পদাভিমানী, গর্ব্বিত, নির্ব্বন্ধারূঢ়, কোপন-স্বভাব, অমিতব্যয়ী ধনাঢ্য ব্যক্তি, দারিদ্র্য দুঃখের তুষানলে দগ্ধ হইয়া অমায়িকতা, নম্রতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন হইয়া উঠে। এই প্রকার লোকের বদনে উভয় অবস্থা-ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ চিহ্নগুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাবৃত, তাহারই বিচার করা উচিত।

চক্ষু।

মনুষ্য প্রকৃতি দুই প্রকার—দয়া দাক্ষি-

* "ছায়া শুভাশুভানি নিবেদয়ন্তি লক্ষ্যা মনুষ্য পশুপক্ষিষু লক্ষণাজ্ঞঃ।
তেজোগুণান্ বহিরপি প্রবিকাশয়ন্তি দীপপ্রভা

শ্যাদি দেব-প্রকৃতি ও হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুর প্রকৃতি। আমাদিগের আসুর প্রকৃতির প্রাধর্য্য অধিক, কিন্তু দেব প্রকৃতি সর্ব্বদা উহাকে দমন করিয়া রাখে। করোটি মধ্যস্থ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গুণের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত, সেই জন্যই পণ্ডিতগণ বলেন "সর্ব্বেষু শরীরেষু শিরঃ প্রধানম্।" মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষু, মুখ, ও নাসিকা এই তিনটী বাহ্য ইন্দ্রিয় বিশদরূপে অন্তঃপ্রকৃতি প্রকাশ করে। মস্তিষ্কের অব্যবহিত সান্নিধ্যে অবস্থান হেতু চক্ষু ধীশক্তি ব্যক্ত করে। নাসিকা, অস্থি ও উপাস্থি দ্বারা গঠিত বলিয়া উহার উচ্চতা এবং বিশিষ্টতা অনুসারে মনুষ্যের কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায়। মাংসপেশী ধমনী ও স্নায়ু প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হওয়াতে মুখের দ্বারা প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সূচিত হয়। এইরূপে ললাট ও চক্ষু ধীশক্তি, নাসিকা ও হনু কার্য্যকারিতা এবং মুখ আসুর প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ প্রকৃতি কি পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহা কেবল সেই সেই প্রকৃতির অবস্থান স্থলের বৃদ্ধি ও বিকাশের দ্বারা বিচার করিতে হয়। চক্ষুকোটরের উর্দ্ধতন ভাগে অনুভূতির স্থান। এই গুণ Frontal sinusএর পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। চক্ষুকোটরের উপরিভাগ ক্রমান্বয়ে কতকগুলি গুণের স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু এই স্থানগুলি এত স্বল্পায়তন যে দৃষ্টি দ্বারা সহজে তাহা পরীক্ষা করা দুষ্কর। Phrenologistদিগের মতে গুণগুলি এই—আকারজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, সময়জ্ঞান শৃঙ্খলা, গণিতপ্রিয়তা, কারণ পরম্পরা, উপযোগিতা, উপমাশক্তি, স্মরণশক্তি এবং গঠনশীলতা। একটী আদর্শ মস্তক লইয়া উক্ত গুণগুলির স্থান এবং তাহাদের বিকাশের তারতম্য দৃষ্টিমাত্রই অনুমান করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা বিধেয়।

অতঃপর চক্ষুই যখন ধীশক্তি ব্যঞ্জক, তখন কোটরের মধ্যে উহারা কি প্রকারে অবস্থিত, তাহা দেখা উচিত। চক্ষু যতই কোটরগত হয়, ততই উহা মস্তিষ্কের সান্নিধ্যতা লাভ করে, দর্শন স্নায়ু দৈর্ঘ্যে অল্প হয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি শীঘ্রই হয়। ফলতঃ চক্ষু যতই কোটরগত হইবে, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ততই অধিক হইবে। বিশিষ্ট চক্ষু অপেক্ষা কোটরগত চক্ষু অধিক চতুরতা প্রকাশক। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধির সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। কেহ বা অতি শীঘ্রই কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কাহারও বা সেই বিষয় উপলব্ধি করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত; কতকগুলি লোকের মধ্যে একজন হাস্যোদ্দীপক কোন কথা বলিলে অনেকেই শুনিবামাত্রই হাসিয়া উঠেন, কিন্তু কাহারও কাহারও সেই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিতে কিছু বিলম্ব হয়।

চতুর লোকের ভ্রূযুগল চক্ষুর উপরিভাগ আবরণ করিয়া থাকে। চক্ষু যখন কপালের সমতল হয়, তখন সম্যক উপলব্ধির অভাব এবং নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি সূচিত হয়। বহির্গত চক্ষু দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান অতি শীঘ্র জন্মে এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বদর্শনক্ষম হয়, কিন্তু প্রতি দ্রব্যের অনুভূতি হইতে সমাধির সময় লাগে। কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু দ্বারা স্পষ্ট ও নির্ভুল অনুভূতি লাভ করা যায়, গোলাকার চক্ষুর দর্শনক্রিয়া অতি প্রবল হইলেও চিন্তাশীলতা ব্যক্ত করে না। অপ্রশস্ত চক্ষুর দর্শনশক্তি অল্প হইলেও চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ়

প্রকাশ করে। অক্ষিতারা যতই বুদ্ধি ততই তীক্ষ্ণ ধারণাশক্তি য়। যাহার অক্ষিতারার উপরে শ দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি অতিশয় য়। চতুর বা বুদ্ধিমান ব্যক্তির চক্ষু দৃষ্ট হয় না—নির্ব্বোধ লোকেরই এরূপ চক্ষু হয়। কৃষ্ণবর্ণ অক্ষিতারা ও অকৃষ্ণতারা কোমলতা ব্যক্ত করে। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু হইতে রিপু ও উত্তেজনা শ পায়। ধূসর চক্ষু হিসাবিতা, ধীরতা, শ্চয়তা প্রকাশ করে। কাহারও কাহারও তে ধূসর চক্ষু পেটুকতা-ব্যঞ্জক। এই মত ঠক হইলে বোধ হয় হিসাবতা ও লাভের াধিক ইচ্ছা হইতে পেটুকতা উৎপন্ন হয়। চক্ষুর নিম্নদেশ বিশিষ্টতা বা পূর্ণতা লাভ করিলে ভাষাজ্ঞান প্রকাশ পায়। বিশিষ্ট চক্ষুযুক্ত ব্যক্তি প্রায়ই সুবক্তা বা সুলেখক। তিকের মধ্যে চক্ষুগোলকের অব্যবহিত শ্চাতে ও উপরে ভাষাজ্ঞান বা বক্তৃতা-ক্তির স্থান। অতএব এই কেন্দ্রস্থল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে চক্ষুগোলক সম্মুখে ও নিম্নে বহি ত হয়। তৃতীয় frontal convolutionএর র্ব্বোল্লিখিত স্থানে শরীরতত্ত্ববিৎগণ বক্তৃতা-ক্তির কেন্দ্রস্থল নির্দ্দেশ করেন। এস্থলে অপেক্ষা বাগ্মিতা বলাই শ্রেয়ঃ, াজ্ঞান বলিলে সাধারণতঃ বহুবিধ ভাষায় পারদর্শিতা অর্থাৎ বহুভাষিতা বুঝায়। বাস্তবিক পক্ষে গাঢ় প্রয়োগাদি লক্ষণের দ্বারা বহুভাষিতা ব্যক্ত হয়। ফলকথা খ্যাতনামা লেখক ও বাগ্মীগণের চক্ষুর নিম্নদেশ বিশি-ষ্টতাযুক্ত হইয়া থাকে। বিশিষ্টতা বা পূর্ণতা অর্থে স্ফীত বুঝিতে হইবে না। উক্ত স্থান স্ফীত হইলে শারীরিক অসুস্থতা ও ইন্দ্রিয়ানু-রাগ বুঝায়। ডিকেন্স, ডিজরেলী, বায়রণ প্রভৃ-তির চক্ষুর নিম্নভাগ সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্টতা-পন্ন। অনেক সঙ্গীতজ্ঞেরও চক্ষু এইরূপ, তাহার কারণ এই যে, চক্ষুগোলকের উপরি-ভাগে মান ও সুরের কেন্দ্রস্থান এবং ঐ স্থানের বিবৃত্তির জন্য এইরূপ চক্ষু দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতকেও ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিলে ভাষা হয় এবং তান, লয়, মান যুক্ত ছন্দবদ্ধ পদাবলীর দ্বারা অন্তরের ভাব ব্যক্ত করাই সঙ্গীত।

এই সকল ব্যতীত চক্ষু দ্বারা প্রায় সকল ক্ষণোদিত ভাব প্রকাশ পায়। যথা শোক, দুঃখ, ক্রোধ, রসিকতা, স্নেহ, আশ্চর্য্যতা, নৈরাশ্য, গর্ব্ব, অভিমান, আলস্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলি এত অল্পক্ষণস্থায়ী ও ঐ সকল দেখিতে দেখিতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, সেই সকল ক্ষণো-দিত ভাবের বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজনীয়।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র লাহিড়ী।

বিলাসে বিনাশ।

কৃষক। ... সয়া ... টা ... বাতায়াত করিতেছে, আমার কতকগুলা প্রজা তাহার বড় অনুগত হইয়াছে। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? তবে নায়েব বলে, উহাকে আমার জমীদারিতে আসিতে দিলে ঐ ব্যক্তি আমার প্রজা বিগড়াইয়া দিতে পারে।

লোকটা কাহার জমীদারিতে বাস করে, তাহার সন্ধান পাই নাই। সে বাস্তবিকই কৃষক, না কাহারও চর, চাসা সাজিয়া কোনও সন্ধানে বেড়ায়, তাহাও এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এই যে আসিতেছে।"

আইস কৃষক ভায়া। ভাল আছ ত?

কৃষক।—আপনারা যেমন রাখিয়াছেন, তেমনি আছি।

জমীদার। ইহার অর্থ কি?

কৃষক। ইহার অর্থ? আপনারা জমীদার, আমরা চাসী প্রজা। আমাদিগের ভাল মন্দ আপনাদিগেরই হাতে। আপনারা দয়া করেন ত ভাল থাকি, আপনারা নিগ্রহ করেন ত দুঃখ কষ্টে ধড়ফড় করি।

জমীদার। এবার আমাদিগের প্রতি তোমার কিছু ভক্তি দেখিতেছি।

কৃষক। যেথানে শক্তি, সেইখানেই ভক্তি। ভক্তি না করিলে যে প্রাণ বাচে না। আপনাদিগের লাঠীকে কবে প্রজা ভক্তি করে নাই? তবে দুঃখ এই, প্রজা খাটে, অথচ খাইতে পায় না। জমীদার খাটেন না, অথচ খাইতে পান। আপনি লাখপতি, আমি পথের কাঙ্গাল। আপনি খাটেন না, গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া থাকেন, কেবল গালগল্প করেন, অথবা পাশা বা তাস খেলেন। আপনি খান, ক্ষীর, সর, ননী। আর, আমরা! বৈশাখের রৌদ্রে আমাদিগের টাঁদি ফাটিয়া যায়। শ্রাবণের ধারায় দেহ পান্থ ভাতের মত বসিয়া যায়। দিন রাত্রি খাটি, তবুও দুইবেলা খাইতে পাই না, এক বেলা খাইয়া থাকি। ইহার অর্থটা আপনি আমাকে বলিতে পারেন? আপনি যে মিহি চাউল খাইতেছেন, তাহা কি আপনি জন্মাইয়াছেন, না আমরা গরিবলোক চাস করিয়া জন্মাইয়াছি? যাহা আপনি খা[ইতেছেন] আমি তাহা খাইতে পাই না। এই পাকা ও চকমিলন বাড়ী[তে আপনারা বাস করিতে]ছেন, তাহা আমরা গরিব [লোকেরা] তৈয়ার করিয়াছি, না আপনি [তৈয়ার করিয়া]ছেন? আমরা তৈয়ার করিয়া [দিয়াছি।] আমরা কেহই নহি, সমাবত অট্টালিক দূরে থাকুক, আমরা খড়ে ঘরে থাকি, তা[হাও] সটকায় সকল সময় খড় থাকে না। আপ[নাদের] ঘরে বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে, দেয়[ালে] খাসা খাসা ছবি দেখিতেছি। মেজে ন[রম] গালিচা পাড়া রহিয়াছে গালিচার উপর মেহ[গ]নি খাট, খাটের উপর এক হাত উঁচু গদি গদির উপর ধপ্ ধপে সাদা ঝালর ওয়াল চাদর ঝুলিতেছে। এসব আমরাই খাটিয় তৈয়ার করিয়াছি। অথচ আপনারা তাহ পরম সুখে ভোগ করিতেছেন। আমর হতভাগারা কেহই নই। আমরা আমাদে চালার ভিতর, কাদার মেজের উপর, বসিবা বা শুইবার জন্য একটা ছেঁড়া পাটীও পাই না। পৌষের জাড়ে একখানা কম্বল বা কাঁথা তাহাও কখন জোটে, কখন জোটে না। দুনি[য়া]য় কেহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও খাই[তে] পায় না, কেহ না খাটিয়াও লাখপতি, ইহ[ার] অর্থটা আপনি আমাকে কি বুঝ[াইতে] পারেন?

জমীদার। পারি। তোমার [টাকা নাই,] আমার টাকা আছে। তুমি দেখি[তেছ আমি] পরিশ্রম করি না। কিন্তু আমার [পূর্বপুরুষেরা] পরিশ্রম করিয়া এই ট[াকা রাখিয়া গিয়া]ছি[লেন।]

এ

ে

আমার পিতার যাহা ছিল, তাহা আমি পাইয়াছি। ইহাতে তোমার আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। উপর্জ্জিত ধন—যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে দিতে চাহে। পিতা পুত্রকে সকলের অপেক্ষা ভালবাসেন, পুত্রের ভরণপোষণের জন্য পিতা দায়ী। সুতরাং পিতার সমুদয় ধন পুত্রই পায়। তোমাতে আমাতে প্রভেদ এই, আমি পিতার নিকট অনেক অর্থ পাইয়াছি, তুমি অল্প পাইয়াছ। কিন্তু তুমি যদি বুদ্ধি ও শ্রমবলে অধিক টাকা উপাৰ্জ্জন কর, তুমিও তাহা তোমার পুত্রকেই দিবে। তোমার মৃত্যু হইলে তোমার ঐ টাকা তোমার পুত্রের পক্ষে অতিরিক্ত বলিয়া যদি কেহ তোমার পুত্রকে কিঞ্চিন্মাত্র দিয়া অবশিষ্ট সমুদয় টাকা কাড়িয়া লয়, সে কার্য্যটা তোমার মতে কি অন্যায় নহে?

কৃষক। হাঁ, অন্যায় বই কি।

জমীদার। আচ্ছা বেশ। তবে, শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, সে তাহা ভোগ করিতে পাইবে?

কৃষক। অবশ্য পাইবে।

জমীদার। তুমি যদি ভোলানাথের অপেক্ষা অধিক ধন উপার্জ্জন কর, তাহা হইলে সেই ধন ভোগ করিবার অধিকার কার? তোমার অবশ্য। ধর, ভোলানাথ তাহার পিতার নিকট ১০০ বিঘা জমী পাইয়াছিল, তুমিও তাহাই পাইলে, কিন্তু ভোলানাথ অলস, গুলিখোর, জুয়া খেলে; তাহাতেই তাহার টাকা উড়িয়া যায়, সে তাহার কৃষিকার্য্যে মন দেয় না, সুতরাং তাহার ফসল ভাল হয় না। ক্রমে সে ঋণে জড়িত হইল। এ বৎসর ৫০ বিঘা জমী দেনা ডিক্রীতে নীলাম হইল। ফিরে বৎসর, আর ৫০ বিঘা জমীও নীলাম হইল। সে এখন মজুর খাটিয়া খায়। তার এখন বড় কষ্ট। দোষ কার? অবশ্য ভোলানাথের। আর ধর, তুমি পরিশ্রমী, কোনও নেশা কর না, ভাল করিয়া আবাদ কর, তোমার ক্ষেতে খুব ফসল হয়। তুমি প্রতিবৎসর সিকি সঞ্চয় কর। পাঁচ বৎসর পরে সঞ্চিত ধন দিয়া আর ১০০ বিঘা জমী কিনিলে, আর কয়টা বলদ কিনিলে। তোমার জমী এখন ২০০ বিঘা হইল। এখন আবও অধিক হইল, টাকাও অধিক সঞ্চিত হইতে লাগিল। এইরূপে টাকা বাচাইয়া বাচাইয়া কুড়ি বৎসর পরে, তুমি একজন ধনবান কৃষক হইলে। এখন তোমাকে আর নিজ হস্তে খাটিতে হয় না। এখন তুমি অনেক কৃষাণ মজুর খাটাও। এখন ভোলানাথ তোমার ক্ষেতে মজুর খাটিয়া খায়। তুমি আরও বিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে আরও ধনী হইবে। হয় ত একটী ক্ষুদ্র গ্রামও খরিদ করিতে পারিবে। এইরূপে তুমি একটী ক্ষুদ্র জমীদার হইবে। তোমার মৃত্যুর পর সেই জমীদারী তোমার পুত্র পাইবে। আর ভোলানাথের পুত্র? তাহার পিতার ভগ্ন কুটীর, তাহার ছিন্ন বস্ত্র মাত্র পাইবে, আর হয় ত একটা ঘটী আর একখানা থালা। ইহাতে তোমার পুত্রের কোন অপরাধ আছে কি? এখন ভোলানাথের পুত্র রাগিতে পারে কাহার উপর? তাহার পিতার উপর, তোমার নিরপরাধী পুত্রের উপর নহে। এ কথা তুমি স্বীকার কর কি?

কৃষক। কেন করিব না? কিন্তু আপনি কি বলেন যে, যে গরিব সেই ভোলানাথ বা ভোলানাথের পুত্র, সে হয় নিজে আলসে নেশাখোর, না হয় আলসে নেশাখোরের ছেলে। আপনি কি বলেন যে, যাহা খাটিয়া রোজগার করে, সে তাহা ভোগ করিতে পায়?

আপনি কি মানেন না যে, ডাকাইতি চাতুরী করিয়া অনেকেই টাকা রোজগার করে। এক জন লোক যতই খাটুক, যতই বাঁচাক, সে যদি অন্যের টাকা বা মাল জোর জবরদস্ত ফেরিবী করিয়া না লয়, অন্য লোকের মুখের গ্রাস সে যদি কাড়িয়া না লয়, সে কখনই মস্ত বড় মানুষ হইতে পারে না।

জমীদার। তুমি যেমন বলিলে গরিব মাত্রই ভোলানাথ অর্থাৎ অলস ও অকর্ম্মণ্য নহে। তেমনি আমিও বলিতেছি, জমীদার বা ধনী মাত্রই দস্যু বা শঠ নহে। তুমি কি যথার্থই মনে কর যে,যে ব্যক্তি ক্রোরপতি বা লাখ্পতি সে হয় ডাকাইত, না হয় জুয়াচোর?

কৃষক। হাঁ মহাশয়, আমি অনেকটা তাহাই মনে করি। আপনি রাগ করিলে আমি নাচার। আপনি বেশ লেখা পড়া জানেন, আমি ভাল লেখা পড়া জানি না। তবে আমি নিরেট বোকা নহি। চাস করিয়া টাকা বাঁচান ও বড়মানুষ হওয়ার যে খাসা কথাটী বলিলেন, সেই রকম চাস করিয়া টাকা বাঁচাইয়া কয় জন ক্রোরপতি বা লাখপতি হইয়াছে। আমাদিগের দেশের বড় বড় জমীদারদিগের কথা ধরুন। কাহারও পূর্ব্বপুরুষ নায়েব ছিল। সেই নায়েব বোকা মনিবের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, গরিব প্রজার বুকে বাঁশ ডলিয়াছিল। তাই মাসিক বিশ টাকায় চাকুরী করিয়া, মাসে দুই হাজার টাকা রোজগার করিয়াছিল। প্রতি বৎসর ১০ হাজার টাকা জমাইল। দশ বৎসর এক লক্ষ টাকা জমা করিল। তাহাতে জমিদারী কিনিল। আর কথা কি? সে বিশ টাকার নায়েবী করিয়া একলক্ষ টাকার জমীদারী কিনিতে পারিল, সে জমিদার হইয়া কত লাখ টাকা রোজগার করিবে, বুঝিয়া দেখুন ঠাকুর। এখন সে জমীদার। এখন তাহার দৌবে, চৌবে, পাঁড়ে পাকা বাঁশের বড় লম্বা লম্বা লাঠী লইয়া গাঁয় গাঁয় ফেরে। এখন "ধর্ প্রজা, মার প্রজা, লাও আসামী, লাগাও জুতা, দেও ম্লা"—এই বই আর কথা নাই। সুতরাং জমীদারের কাছারীতে ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চিক্‌চিকে টাকা পড়িতে লাগিল। এখন জমীদারের মস্ত চকমিলন বাড়ী, মস্ত পূজার দালান। এখন সদর দরজায় নহবৎখানা উঠিল, নহবৎখানায় প্যাঁ প্যাঁ করিয়া সানাই বাজিতে লাগিল। এখন জমীদারের জয়জয়কার। আর একজন জমীদারের পূর্ব্বপুরুষ কি ছিল? না মোক্তার। সে মক্কেলের সদর খাজনার টাকা কালেক্টরিতে দাখিল না করিয়া,নিজে হাজির না হইয়া, সেই টাকাতে অন্যের নামে বেনামী করিয়া মক্কেলের জমীদারীর একটা মহল খরিদ করিল। আর একজন জমীদারের পূর্ব্বপুরুষ সদ্য ডাকাত, ডাকাইতের সর্দ্দার ছিল। অনেকগুলি লাঠিয়াল রাখিয়াছিল। সুবিধা পাইলেই দুর্ব্বল জমীদারকে লাঠীবাজী দ্বারা বেদখল করিত। আর একজনের পূর্ব্বপুরুষ সাহেবদিগের প্রথম আমলে সেরেস্তাদার ছিলেন, দুই হাতে ঘুস লইয়া ফুলিয়া মস্ত জমীদার হইলেন। আপনি কি এ সব জানেন না? খোঁজ করিলে প্রায়ই কি দেখিতে পান না—জমীদারীর গোড়ায় হয় ডাকাইতি, না হয় জুয়াচুরি। লাখ লাখ লোক মেহনত করিয়া রাশি রাশি মাল জন্মায়। সেই রাশি রাশি মালের দাম লাখ লাখ টাকা। অধর্ম্ম না করিলে মহাশয়, লাখ লাখ লোকের মেহনতের লাখ লাখ টাকা কেমন করিয়া এক একটা মানুষের হাতে পড়িতে পারে? আমি ত বুঝি না। আপনি পারেন ত আমাকে বুঝাইয়া দিন।

জমীদার। ভায়া, তুমি কথা বলিতে বলিতে কিছু গরম হইয়া উঠ। একটু ঠাণ্ডা হইয়া কথা বার্ত্তা কহিলে ভাল হয় না কি?

কৃষক। যাহাদিগের পেট ঠাণ্ডা থাকে, তাহাদিগের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকাও উচিত। তবু মহাশয়, আপনাদিগের মেজাজ সততই কত গরম থাকে দেখুন। আমাদের পেটের ভিতর সদাই আগুন জ্বলিতেছে। সদাই আগুনে পুড়িয়া লোক যদি গরম না হয়, তবে আর গরম কিসে হয়? তবে আমাদের গরম ভিতরে ভিতরেই থাকে, ভয়ে প্রকাশ হয় না। আর আপনাদের গরম চাকর বাকরের উপর, প্রজার উপর, গরিব পাড়াপড়শীর উপর সদাই প্রকাশ হয়। তবে আপনি যে ঠাণ্ডা মেজাজে দুটা কথা কহিতেছেন, তাহা আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য।

জমীদার। সে কথা যাউক। আচ্ছা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মতে কি একজনও ভাল জমীদার নাই।

কৃষক। এ কথা কে বলিল? আমি এই দুর্ভিক্ষে যে না খাইয়া মরি নাই, তাহা একজন জমীদারের দয়ায়। আমি যে একটু লেখা পড়া শিখিয়াছি, তাহাও ঐ জমীদারের দয়ায়। আমাদিগের দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে আমি যে আজিও খেপিয়া যাই নাই, তাহা ঐ জমীদারের মিষ্ট উপদেশে। তিনি মস্ত জমীদার, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি আমার গুরু। কি দয়া, কি সরল কথা, কি বুদ্ধি, কি সাধু! দেমাক মোটেই নাই, জাকজমক মোটেই নাই, মেজাজ এতদিন দেখিতেছি, কখন গরম দেখি নাই। দুঃখী দেখিলেই দয়ায় গলিয়া যান। তাঁহার দান খয়রাতের কথা কি বলিব? তিনি লোক দেখান দান করেন না, দান চুপি চুপি। আহা! তাঁহার মত যদি সব জমীদার হইত, তাহা হইলে দুনিয়ার দুঃখ থাকিত না। তাঁহার মত আরও কেহ কেহ থাকিতে পারেন। পূর্ব্বেও ছিলেন, জানি। লালা বাবুর নাম কে না জানে? রাণী ভবানীর নাম কে না শুনিয়াছে? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও নাকি খুব ভাল ছিলেন। আর এখনকার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, তিনি সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। জমীদারদিগের মধ্যে ভাল লোক নাই, তাহা আমি বলি না। তবে অতি কম।

জমীদার। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল লোক কম নহে কি? গরিবদিগের মধ্যেও ভাল লোক অল্প, ধনীদিগের মধ্যে ভাল লোক অল্প।

কৃষক। এ কথাটা এখন ছাড়িয়া দেন, অন্য আর এক দিন হইবে। আমি বলিতে ছিলাম, পাপে না পড়িলে একজন লোক কখনই রাশি রাশি সম্পত্তি ভোগ করিবার ইচ্ছা করিবে না। দেখুন একজন লোকের পেটের মাপ কত ছোট, তাহাতে কত কম ধরে। তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ এই, তোমরা যতই টাকা রোজগার কর না কেন, একটা পেটে এক সের অন্নের অধিক ধরিবে না। তাই অন্যের গ্রাসের অন্ন তাহাতে পুরিতে বৃথা চেষ্টা করিও না। মানুষের দেহ বড় জোর ৪॥০ হাত লম্বা, বেড় বড় জোর দুই হাত। সুতরাং দশ হাতের অধিক লম্বা কাপড় কাহারও দরকার হয় না। মানুষ যত বড় ঘরই করুক না কেন, একখান ৫ হাত লম্বা তিন হাত প্রস্থ খাটের অধিক স্থান লইয়া সে শুইতে পারে না। এই সব দেখিয়া ও ভাবিয়া কি বোধ হয়? অতি অল্পে মানুষের খাওয়া পরা ও শোওয়া নির্ব্বাহ হইয়া যায়। তার উপর নিজের জন্য যাহা

কর, সেটা কেবল দেমাক ও ভড়ং। আর একটা কথা, মহাশয়! জীবনটা কদিনের জন্য? এই সংসারটা আমাদিগের বাসাবাড়ী বইত নহে, আজ আছি কাল নাই। তার জন্য এত জাঁক, এত ভড়ং, এত দেমাক কেন? বৃথা জাঁক দেমাকে অর্থ নষ্ট করা কি পাপ নহে? আপনার চোখের উপর আপনার প্রজারা দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, তাহা দেখিয়াও আপনি গাড়ী, জুড়ি, বাড়ীতে অনর্থক এত টাকা খরচ করিতেছেন। সেই টাকাটা ঐ রকম নষ্ট না করিয়া যদি তাহাতে চাউল কিনিয়া কাঙ্গাল প্রজাদিগের মধ্যে বিলাইতেন, কত জনকে আপনি প্রাণ দিতে পারিতেন। কত জন প্রাণে বাঁচিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিত। কিন্তু দেখুন বড মানুষরা এমনি পাপে ভুলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সে সুমতি হইবার যো কি?

জমীদার। আমার টাকা যদি আমি নিজের সুখের জন্য ব্যয় করি, তাহাতে তুমি রাগ কর কেন?

কৃষক। যাহার পাঁটা সে যদি বলে আমার পাঁটা আমি লেজের দিকে কাটিব, তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতে অন্যের কি? আপনার কথাটা কি একটু সেই রকম হইল না? আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা সুখ নহে। তাহা আপনার একটা খেয়াল। পাপের খেয়াল বই আর কিছুই নহে। তাহা দেমাক বই আর কিছু নহে। আচ্ছা আপনি বলুন, কিংখাপ পরিতে আরাম না মলমল পরিতে আরাম? আপনিই বলুন, হীরা, মুক্তা, সোণা গায় জড়াইলে গাটায় কি খুব আরাম হয়? গ্রীষ্মকালে কিংখাপ, হীরা, মুক্তা, সোণা কি শরীরটা শীতল করে, শীতকালে তাহাতে কি শীত ভাঙ্গে? হীরা, মুক্তা, সোণা কি গায় ফুটে না? ফুটে বই কি। তবে পরেন কেন, মেয়েদের পরান কেন? দেমাক, দেমাক, দেমাক। "আমি বড় মানুষ, ওগো দেখগো আমি কত বড় মানুষ! দেখগো, আমার গায় কত হীরা, মতি, ঝাম্না, পান্না। তোমরা সকলে বলগো, আমি খুব বড়মানুষ। তোমরা পাছে বল, আমি বড় মানুষ নই, সেই ভয়ে আমার সার্টিফিকেট গা'র উপর বাঁধিয়া আনিয়াছি। এই গহনাগুলি আমার গায় ফুটিতেছে, তবু পরি কেবল তোমাদিগের চটক লাগাইবার জন্য। তোমরা সকলে ছোটলোক, আর আমি বড় লোক, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই কষ্ট ভোগ করিয়াও তোমাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, একবার দেখ গো।" মহাশয়, ইহার ভিতর সুখ কোন জায়গায়? এই গহনার ভিতর কি ষোল আনা দেমাক দেখা যাইতেছে না? এই দেমাক কি পাপ নহে? মেয়েদের কথা ছাড়িয়া দিন। তাহাদের বুদ্ধি চিরকালই হালকা। আপনাদিগের ভিতর মরদের কথা ধরুন। আপনি যখন গাড়ীতে বাহির হন, তখন আপনার মনটা কেমন হয়? দারোয়ান ফটক খুলিল, হুড়মুড় করিয়া চেরেট সদর রাস্তায় উঠিল। আপনার সহিস দুটা "হৈ হৈ সামনেওয়ালা" বলিয়া হাঁকিতেছে। গাড়ি গম্‌গম্ করিয়া চলিতেছে। তখন রাস্তায় যাহারা হাঁটিয়া যায়, তাহাদিগের সকলকেই কি আপনি ছোটলোক মনে করেন না? আপনি হাসিতেছেন, হাসুন। আমার কিন্তু তখন আপনাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, দেমাকে আপনার বুক ফুলিয়া উঠিতেছে—যেন ভাবিতেছেন এই স্বর্গ। তাহার উপর আবার যদি কোন হতভাগা সামনেওয়ালাকে আপনার কোচয়ান হুপাৎ করিয়া একঘা চাবুক দিতে

পারে, তাহা হইলে ত আপনি মনে করিলেন, আমি ত্রিলোকের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। কি দেমাক, কি নীচতা, কি মোহ, কি পাপ—

জমীদার। থাম কৃষক ভায়া থাম। তুমি কি দেখিয়াছ, আমার কোচমান কাহাকেও চাবুক মারিয়াছে? আর একটা কথা তুমি আদৌ ধরিতেছ না। আমরা গাড়ী চড়ি, তাই কোচ-ম্যান সহিসগণ খাইতে পায়। আমরা অলঙ্কার ক্রয় করি, তাই স্বর্ণকারগণ খাইতে পায়, আমরা বড় বড় বাড়ী তৈয়ারি করি, তাই কত মিস্ত্রি, কুলি, মজুর অন্ন পায়। সুতরাং ধনীর বাবুগিরিতে গরিবের অন্নের সংস্থান হয়। তুমি কি গরিবদিগের অন্নের পথে কাঁটা দিতে চাও।

কৃষক। মহাশয়, ওটা চালাকির কথা। আমি অনেকবার শুনিয়াছি। কথাটা শুনিয়া প্রথমে ধাঁধাও লাগিয়াছিল। পরে কথাটা মনে হইল যে, যদি বড় মানুষের বাবুগিরিতে গরিবের অন্ন জুটে, তবে সব ধার্ম্মিক লোকই কেন বলেন, বাবুগিরি করিও না। ধার্ম্মিক লোকগুলা কি সব বোকা? এই বার গুরুঠাকুর আসিলে—গুরুঠাকুরকে জানেন ত, সেই জমীদার—এইবারে তিনি আসিলে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি খুব বড় মানুষ, গরিবের মা বাপ। যদি বড় মানুষের বাবুগিরিতে গরিবের সুবিধা হইত, তা হইলে তিনি কেন বাবুগিরি করেন না? তিনি লাখপতি হইয়াও কেন সন্ন্যাসীর মত থাকেন? গুরুঠাকুর আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিলেন ও বলিলেন "বাছা, এ বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে একটু সময় লাগিবে। পণ্ডিতদিগের ভিতরও এ বিষয় কেহ কেহ ভুল করিয়াছেন। আমার চতুষ্পাঠীতে বার্ত্তাশাস্ত্র সম্বন্ধে আমি যে উপদেশ দিয়াছিলাম, আমার এক জন শিষ্য তাহার কতকভাগ সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। সেই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে বিলাস সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আমার কোন শিষ্যের নিকট সেই অধ্যায়টী পাঠ করিবে।"—আমি সেই অধ্যায়টী পড়িয়াছি এবং বুঝাইয়া লইয়াছি। আপনি যদি তাহা পড়িতে চাহেন, আমি সেই পুস্তকখানি আপনাকে পড়িতে দিতে পারি। আপনি বেশ লেখা পড়া জানেন; আপনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

জমীদার। সে পুস্তক কোথায়?

কৃষক। এই আমার পোঁটলার ভিতর আছে। এই লউন। এখন রাত্রি হইল, আমি চলিলাম।

জমীদার। আবার তুমি এই গ্রামে কবে আসিবে?

কৃষক। ঠিক নাই। আগামী পূর্ণিমাতে আসিতে পারি।

এই বলিয়া পুটলীটী বগলে করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই দূরে মাঠের দিকে, নৈশ আকাশ নিনাদিত করিয়া মধুর গীতিস্বর উত্থিত হইল। পবনের মৃদুমন্দ হিল্লোলে তাহা জমীদারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—"মন তোর কৃষিকায আসে না" এই বিখ্যাত গানটী ভক্তিকম্পিতস্বরে উচ্চতানে, আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া ঐ গাহিতেছে কে রে? সেই কৃষক। জমীদার ভাবিতে লাগিলেন—এই কৃষকটী কে? ইহার গানে বোধ হইতেছে, এ একজন ভক্ত। ইহার গুরু জমীদার সন্ন্যাসী। এই জমীদার সন্ন্যাসীর চতুষ্পাঠী আছে। তাহাতে Political Economy বার্ত্তাশাস্ত্রের চর্চ্চা হয়। চতুষ্পাঠীর অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়, [illegible] উপর ইউরোপীয় আধুনিক [illegible] তাঁহাদের

কৃথ আলোচিত হয়, বোধ হয় কৃষকের কথার ভাবে বোধ হইল, এই সন্ন্যাসীর অনেকগুলি শিষ্য আছে। এই জমীদার-সন্ন্যাসী কি একটা নূতন সম্প্রদায়ের সংস্থাপক? লোকটা বোধ হইতেছে দাতাও খুব। এক ব্যক্তিই জমীদার সন্ন্যাসী, কৃষকপ্রিয়, টোলধারী, হিন্দু ও ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধ্যাপক, একটা নূতন অপ্রকাশিত সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রচারক, গুপ্তদাতা—আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তিটী কে, জানিতে হইবে। বোধ হয় যে এই গ্রন্থখানি দিল, তাহাকে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। (ক্রমশঃ) শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা।

বিগত ৭ই বৈশাখের (১৩০৪) চারুমিহিরে কোন পরিব্রাজক ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"পঞ্চ বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এ দেশের যত কিছু উদার, যত কিছু মহৎ এবং উচ্চতর অনুষ্ঠান হইত, প্রত্যেক বিষয়েই ব্রাহ্মগণ অগ্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মগণ তাহার নেতা ছিলেন। আজ সেই ব্রাহ্ম এবং গয়াধামের ফল্গুনদী একই পদার্থ। সকলই অভ্যন্তরে। বাহিরে কিছুই প্রকাশ নাই। বহির্জগতের সহিত বেশী সম্বন্ধও নাই। ক্রমে ব্রাহ্মগণ অন্য লোক হইতে সরিয়া পড়িতেছেন, আপনাদিগের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে প্রবিষ্ট হইয়া একটী ক্ষুদ্র সমাজ গঠিত করিয়াছেন। অথচ যে ধর্ম্মবল এবং ধর্ম্ম ভাবের কাছে জগত অবনত হয়, যে ভাবকে সর্ব্বজনে পূজা করে, এখন তদ্রূপ কোন উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারিতেছেন না। অধিক দিন এই ভাবে চলিলে ব্রাহ্মগণ একটী সম্প্রদায় হইয়া পড়িবেন।"

উপরোক্ত তীব্র মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ দোষের কথা শুনিলে ব্রাহ্ম-সাধারণ বিরক্ত হন, তাহা সংশোধনের চেষ্টা করেন না। বিরক্ত হইয়া গায় ত্রুধ-প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতেও গ্রীষ্মকালে হন না। ভাদ্র-আশ্বিন মাসের নব্য-শরীরটা শীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে কার্য্য শীত ভাঙ্গে? হইয়াছে, এবং যাহার পৌষকতা ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কীর্ত্তির কথা লিখিয়াছি বলিয়া অনেকে চটিয়া লাল হইয়াছেন, প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করিয়া, অসাক্ষাতে, ভীরু এবং কাপুরুষ জনোচিত ভাষায় গালি দিতেছেন। কেহ কেহ বা এমনই নির্লজ্জ যে, কোন হিংসা-প্রদীপ্ত, প্রবীণ এবং বিজ্ঞ বলিয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত পত্রিকা সম্পাদক আমাদিগকে তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তিভাজন বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিগত ২৭শে সেপটেম্বর, (১৮৯৭) রামমোহন রায়-স্মৃতি-সভায় ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া নিন্দিত হইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়, পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিভাজন শিবনাথ বাবু কি ভাবিতেছেন, অদ্য সকলে তাহা দেখুন। অধিক দিনের কথা নয়, বিগত (১৮৯৭) ৯ই এপ্রেল শাস্ত্রী মহাশয় সুহৃৎ-গোষ্ঠীতে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অনেক কথা উপরোক্ত পরিব্রাজক মহাশয়ের মন্তব্যের কথার সহিত ঐক্য হয়। শিবনাথ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ লোকের দৃষ্টি সমাজের অভ্যন্তরে

দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ব্বে যদি তিনি সতর্ক হইতেন, তবে ব্রাহ্ম-সংসার সোণার সংসার হইত, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা চলিত না, কথা এবং কাজে ঠিক থাকিত, ব্যবহার সংযত হইত, মানুষ মানুষ হইত। এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় ব্রাহ্ম-সাধারণের উপকার হইলে আমরা যারপর-নাই সুখী হইব।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।*

অদ্যকার আলোচনা উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য সুতরাং আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না।

আলোচ্য বিষয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর শাখার অবস্থা কি তাহার আলোচনাতে প্রয়োজন নাই, কারণ সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহাই প্রধানরূপে আলোচনা করা যাউক। কিন্তু এই আলোচনা করিতে গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসার বিষয় যাহা কিছু আছে, ইহার কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহার উল্লেখ করিব না; কারণ তাহা সমাজের সভ্য মাত্রেরই বিদিত এবং আপনা আপনির মধ্যে বসিয়া আপনাদেরই গুণাবলীর উল্লেখ অপেক্ষা আপনাদের দোষ ও অভাব সকলের উল্লেখ করাতে অধিক উপকার আছে। অতএব আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের সমাজের অভাব কত ও কার্য্যক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহারই কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিব।

প্রথম,—ইহার সভ্য ও অনুরাগী লোকের সংখ্যা। ১৮৯০ সালের ব্রাহ্ম পঞ্জিকাতে ব্রাহ্ম-সমাজের সংখ্যা ২৩৮ ছিল, এ বৎসর অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে এক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজের সংখ্যা ১৮৬ হইবে। ১৮৭৮ সালে অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বৎসর মিস কলেট যে পঞ্জিকা প্রকাশ করেন তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ১২৪ ছিল। ১২৪ হইতে ২৪০ হইয়াছিল, আবার হ্রাস হইয়া ১৮৬ দাঁড়াইয়াছে। এই সকল সমাজের অবস্থার বিষয় যাহা কিছু জানা যাইতেছে, তাহাতে দেখিতে পাই সকলের অবস্থাই অতিশয় দুর্ব্বল। অধিকাংশই নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ, সর্ব্বত্রই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মপরিবারের সংখ্যা অতি অল্প, সমাজগুলির সভ্য সংখ্যা অল্প, অতি অল্প সংখ্যক সমাজেই দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদির আয়োজন দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা আছেন তাঁহারাও নিরুৎসাহে দিন যাপন করিতেছেন। বাহিরের লোকের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানসূত্রে যে যোগ ছিল, তাহাও চলিয়া যাইতেছে।

এই সকল সমাজের মধ্যে যাঁহারা এক সময়ে উৎসাহের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও উৎসাহ ও অনুরাগ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে ও দিন দিন যাইতেছে। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন যে আমাদের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাদের

* ৯ই এপ্রেল, শুক্রবার, সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাবাসী সভ্যগণের এক সুহৃৎ-গোষ্ঠীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

বিশেষ লাভ নাই। তাহাদের সম্বন্ধে যে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে, আমাদের কার্য্যের দ্বারা অদ্যাবধি তাহা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের অনুরাগ ও উৎসাহজনক বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অন্তরের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা আর আমাদের আধ্যাত্মিক বন্ধুতার প্রত্যাপেক্ষা করিতেছেন না; প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনক্ষেত্রে নিজ নিজ সুখ দুঃখ লইয়াই আছেন; আমাদের নিকট বিশেষ সাহায্যের আশা রাখেন না। আধ্যাত্মিক সহায়তা ও প্রত্যাশার অভাবে আমাদের কার্য্য কলাপের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষাবুদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা এখানে কি করিতেছি ও কি বলিতেছি তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের আর ঔৎসুক্য নাই। ইহার ফল এই হইতেছে—আমাদের সংবাদপত্র সকল লইতে অনেকের প্রবৃত্তি নাই। এরূপও শুনিয়াছি অনেক স্থলে অনুরোধ বশতঃ আমাদের কাগজ লওয়া হয়, কিন্তু আর খোলা হয় না, টেবিলেই পড়িয়া থাকে। ওদিকে আমাদের কার্য্য কলাপের প্রতি যতই ঔদাসীন্য ভাব আসিতেছে ততই আমাদের সাহায্যার্থ অর্থ-দান প্রবৃত্তি হ্রাস হইতেছে; কাজেই আমাদের সকল কার্য্যে দারুণ অর্থাভাব ঘটিতেছে। অনুরাগী জনের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব না করিলে সে অনুরাগ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। দেখুন কাশ্যপ ইউনিটেরিয়ান মণ্ডলীর সংবাদ লইবার জন্য ব্রিটিশ ও ফরেন ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন বর্ষে বর্ষে কেমন উপযুক্ত এজেণ্ট প্রেরণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় —একদিকে যেমন মফঃস্বলস্থ সমাজ সকলের সহিত যোগের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, অপর দিকে তেমনি দেখা যাইতেছে এক সময়ে যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে সমাজের কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন, তাঁহারা আমাদের কার্য্যে উদাসীন হইয়া দূরে যাইতেছেন। প্রায় বিশ বৎসর হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, আজ আমাদের ঘর উৎসাহী অনুরাগী ও কার্য্যদক্ষ সভ্য সমূহে পূর্ণ থাকা উচিত ছিল। আজ এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে সভাপতি বা অপর কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে হইলে, দশ বিশ জন উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লইব, তাহা স্থির করা কঠিন; মেসেঞ্জারের সম্পাদক ও লেখক স্থির করিতে হইলে বিশ পঁচিশ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হাতের কাছে বিদ্যমান, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লই সেই ভাবনা হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কি দেখিতেছি, দেখিতেছি ঘর শূন্য, মানুষের অভাবে সকল কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম। যাঁহাদের উৎসাহে ও সাহায্যে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে আমাদের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ হইল, তাঁহারা আজ কোথায়? ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রসমাজের উদ্যান-সম্মিলনে যে তিন চারি শত যুবক আমাদের সঙ্গে যাইত, তাহারা আজ কোথায়? যে শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ এক সময়ে উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে সবল করিয়াছেন তাঁহারা আজ কোথায়? যে কৃতবিদ্য সভ্যগণ এক সময়ে ইহার অনেক কার্য্যে যোগ দিয়া কার্য্য চালাইয়াছেন ও পত্রিকাদিতে লিখিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোথায়? কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শুষ্ক পলাণ্ডুর খোসার ন্যায় খসিয়া খসিয়া ক্ষীণ-কলেবর হইয়া যাইতেছে? এই কি কারণ নহে যে আমরা অনুরাগী জনের অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করিতে ও রক্ষা করিতে

সমর্থ হইতেছি না; আমরা মানুষকে inspire করিতে পারিতেছি না।

তৃতীয়—ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় যে সকল ধর্ম্ম-সমাজ মানবজীবনের নব আদর্শ লইয়া উঠিয়াছেন ও সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, জগতের ইতিহাসে দেখি, তাঁহারা সকলেই প্রচার কার্য্যকে প্রধান কার্য্য ভাবিয়াছেন। য়িহুদী ধর্ম্মের সংস্কারার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারোৎসাহী ধর্ম্ম; আরবীয় ধর্ম্মের সংস্কার মানসে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় সুতরাং ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারোৎসাহী ধর্ম্ম; সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার মানসে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় সুতরাং তাহা প্রচারোৎসাহী ধর্ম্ম। প্রচার তাঁহাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায় এজন্য প্রচারে তাঁহাদের উৎসাহ। ব্রাহ্মধর্ম্মও জগতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকলের সংস্কার মানসে অভ্যুদিত সুতরাং প্রচারোৎসাহ ইহার একটা প্রধান লক্ষণ হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রচার কার্য্যে আমাদের সমাজের সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বলিতে কি এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যতদূর অকৃতকার্য্য হইয়াছেন এরূপ আর কোনও বিষয়ে নহে। বিগত বিশ বৎসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কলিকাতাবাসী সভ্যগণ অভাব পক্ষে দশ বার লক্ষ টাকারও অধিক স্থাবর সম্পত্তি করিয়াছেন। আজ যদি গবর্ণমেণ্টের আদেশ হয় যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে আপনাদের সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া যাত্রা করিতে পারি। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ে সভ্যগণের যেরূপ মনোযোগ দেখা গিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সেরূপ মনোযোগ দেখা যায় নাই। তাহার প্রমাণ বিশ বৎসরে ইহার সভ্যগণ পাঁচটির অধিক প্রচারক বরণ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের সকলকে আবার ভরণপোষণ করিতে হয় না। যে কতিপয় ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করিতে হয় তাঁহাদিগকেও ভাল করিয়া পালন করিতে পারা যাইতেছে না। প্রচার কার্য্যও তেজের সঙ্গে চলিতেছে না। এই পাঁচটি প্রচারক সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। হৃদয় মনের একতার অভাবে শক্তি জাগিতেছে না। সমাজের দ্বারা প্রচারকরূপে বৃত হইবার জন্যও অধিক লোকের আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং প্রচারক সংখ্যা যে ভবিষ্যতে অধিক বাড়িবে, এরূপ আশা হইতেছে না। যাহারা নিজেরা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিতে পারে না এবং তদুপরি অপরে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিলে উৎসাহদাতা হইতে পারে না, জগদীশ্বর তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ লোক দেন না। যাহারা ত্যাগীপুরুষের আদর করে, তাহাদের মধ্যেই ত্যাগীপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

চতুর্থ—ভবিষ্যতে আমাদের সমুদায় কার্য্য চালাইতে পারেন, এমন লোক দেখিতেছি না এবং এরূপ লোক প্রস্তুত করিবার উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে না। সকল কাজেই লোক Successor প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পায়। আমাদের Successor প্রস্তুত করিবার কোনও চেষ্টা হইতেছে না। আজ যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক দেখা যাইতেছে না। Reserve forceই জনসমাজের প্রকৃত শক্তি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন ইংরাজ জাতির শক্তি কোথায়? আমি বলি এই Reserve forceএ। আজ উপর্যু-

পরি দশজন গবর্ণর জেনারেল হত্যা কর, সেই দশজনের স্থান অধিকার করিবার লোক পশ্চাতে রহিয়াছে ; আজ গ্লাডষ্টোন অন্তর্হিত হউন, কাল কাজ অচল হইবে না ; এখানেই ইংরাজের শক্তি। আমাদের দেশ দুর্ব্বল কোথায়, এখানেই দুর্ব্বল। এক বিদ্যাসাগর, এক কেশবচন্দ্র, এক কৃষ্ণদাস গেলেন, তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিবার কেহ থাকিল না। সেইরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আজ যে শক্তি দেখিতেছেন তাহাতে প্রতারিত হইবেন না। চিন্তা করুন আমরা অন্তর্হিত হইলে কাহারা এই সকল কার্য্যের ভার লইয়া থাকিবে। যদি আমাদের মধ্যে ত্যাগীপুরুষের অভাব হয়, যদি কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে যান, যদি দিন দিন সকলে স্বীয় স্বীয় বৈষয়িক উন্নতি লইয়াই মাতিয়া যান, তবে কাহাকে লইয়া সমাজ চালাইবেন, কাগজে কালি কলমের প্রস্তাব লইয়া কি পরমার্থ সাধিত হইবে ?

পঞ্চম,—ইংলণ্ডের কোয়েকার সম্প্রদায়ের ন্যায় যাঁহারা বাহিরে প্রচার বিষয়ে অমনোযোগী, তাঁহাদের মণ্ডলীভুক্ত পরিবার সকলের বংশবৃদ্ধি দ্বারাও তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতে পারে ও কার্য্য-কলাপ এক প্রকার চলিতে পারে। কিন্তু তাহাহইলে প্রত্যেক পরিবারে যে সকল পুত্র কন্যা জন্মে, তাহাদিগকে স্বীয় ভাবাপন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মগৃহে সেরূপ চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। প্রতিদিন দেখিতেছি ব্রাহ্মগৃহে বালক বালিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, বরং অনেক স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। গৃহে শিক্ষা নাই, অথচ বিদ্যালয়ে গিয়া যাঁহাদের সহিত মিশিতেছে, তাহাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ-বিরোধী, ইহার অনিবার্য্য ফল ব্রাহ্মবিরোধী ভাবের সংক্রামণ। কলিকাতাতে বার তের বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকার জন্য রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় আছে, বিশ বৎসরের উর্দ্ধতন বয়স্কদিগের জন্য ছাত্রসমাজ আছে, বার তের হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কদিগের খবর লইবার কেহ নাই। একবার চিন্তা করুন, বাহিরে বিশেষ প্রচার নাই, ঘরের ছেলেরাও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইতেছে না। ফল কি হইবে তাহা কল্পনার চক্ষে দেখুন।

ষষ্ঠ,—অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবার দারিদ্র্যে বিবিধ চিন্তা ও পরীক্ষার মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত ও সবল করিতে পারে ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতে পারে, এমন কেহ নাই। এই সকল পরিবারকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের এক একটী ক্ষেত্র করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা উচিত, তাহার বন্দোবস্ত নাই।

সপ্তম,—উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বালিকার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহারা কি ভাবাপন্ন হইতেছেন, কিরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইহাঁদের শক্তি সকলকে কিরূপে সমাজের কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়, সে চিন্তা করিবারও উপায় অবলম্বন করিবার কেহ নাই। এই নবশিক্ষা প্রাপ্তা মহিলাগণ আমাদের ভাবী পরিবার সকলকে ও ভাবী সমাজকে অনেক উচ্চ ভূমিতে তুলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত মনোযোগ কর্ত্তব্য।

অষ্টম,—Harwood সাহেব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন এবং আমারও বিশ্বাস যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমন মাদকতা প্রভৃতি আছে,

যাহা কাজে লাগাইতে পারিলে একটী প্রবল শক্তিশালী সমাজ হইতে পারে ও দেশ মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি জাগিতে পারে, কিন্তু কিরূপে যে যে সকল কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহা যেন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। অনেক মালমসলা ত কাজে লাগিতেছে না; আবার যাঁহারা কাজের জন্য একত্র হইতেছেন, তাঁহারাও এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কাজ করিতে পারিতেছেন না। বৃথা বিবাদে, তর্ক বিতর্কে, মন কষাকষিতে তাঁহারা অনেক সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত করিতেছেন। আমি দেখিতেছি, আমরা এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজরূপ কলখানাকে ভাল করিয়া বসাইতে পারিতেছি না, যে শক্তি বস্ত্র প্রস্তুত করিবার বিষয়ে নিযুক্ত হওয়া উচিত, তাহার বার আনা যেন চাকায় চাকায় ঘর্ষণে ব্যয় হইয়া যাইতেছে। আমরা পরস্পরকে সবল না করিয়া দুর্ব্বল করিতেছি।

আমাদের সমাজে নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত থাকাতে আমরা বাহিরে দেখিতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িতেছি না এবং সহস্র মতভেদ সত্বেও অনেক বিষয়ে এক সঙ্গে কাজ করিতেছি, কিন্তু সমবিশ্বাসীগণের মধ্যে হৃদয় মনের যে একতা থাকিলে শক্তি জাগে ও সমাজ মধ্যে বাস করিয়া শান্তি ও আরাম লাভ করিতে পারা যায়, সে হৃদয় মনের একতা আমাদের মধ্যে থাকিতেছে না। আমাদের সংখ্যা অল্প, সেই অল্প সংখ্যক সভ্য আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের দোষ-গুণের বিচার করিতেছেন। দুই চারিজনে কাজ করিতেছেন, আর অপর সকলে দূরে দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতেছেন।

অধিকতর শোচনীয় বিষয় এই যে, এই সকল মতভেদ, বিবাদ বিতর্ক ও হৃদয়ের উদার মধ্যে মায়ের কাজ করিতে পারে এমন কেহ নাই। অর্থাৎ মাতা যেমন সকল সন্তানকে সমান চক্ষে দেখেন, সকলের সহায়তার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেন, ও সকলকে সমান ভাবে বুকের দিকে টানিয়া রাখেন, তেমনি আমাদের সমুদায় Institution গুলিকেও সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন groupকে সমান চক্ষে দেখেন ও সকলকেই বুকে টানেন এমন কেহ নাই। বলিতে গেলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় সেই স্থান অধিকার করা কর্ত্তব্য। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা অপক্ষপাতে তুলাদণ্ড ধরিয়া থাকিবেন, সমুদায় Institution গুলিকে অবিশ্রান্ত পোষণ করিবেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ তাহা ভাঙ্গিয়া দিবেন, যে বিভাগে যিনি নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহাকে আরও দশগুণ উৎসাহিত করিয়া তুলিবেন, সভ্যে সভ্যে বিবাদ ঘটিলে উভয়কে সমান ভাবে নিজ স্নেহ-ছায়াতে রাখিয়া বিচার করিবেন, ইহাই উচিত। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

নবম,—সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ চিন্তার বিষয় যাহা তাহা সর্ব্বশেষে উল্লেখ করিতেছি—আমরা গভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম আমাদের জীবনে ও পরিবারে গাঢ়রূপে প্রবেশ করিতেছে না। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যে তাহার সহস্র দোষ থাকিলেও এই একটা প্রশংসার কথা বলিবার আছে যে She has been a mother of saints—অর্থাৎ তাহাতে প্রগাঢ় ধার্ম্মিক পুরুষ ও নারী অনেক জন্মিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারাপন্ন হইলেও অনেক প্রগাঢ় ধার্ম্মিক পুরুষ ও রমণী উৎপাদন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ফিরিয়া দেখিতেছি, এই

সমাজ এখনও আশানুরূপ প্রগাঢ় ধার্ম্মিক পুরুষ ও নারী উৎপাদন করিতে পারিতেছেন না। আমরা বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, তাহা অপেক্ষা যে ধর্ম্মজীবনের প্রগাঢ়তা অধিক লাভ করিতে পারিয়াছি এরূপ বোধ হয় না। এই বিশ বৎসরে জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্য জ্ঞানে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাস ও নির্ভর, মানবে প্রেম, বিনয়, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে গাঢ়তা লাভ করিয়া সকলের শ্রদ্ধেয় ও বন্দনীয় হইয়াছেন এমন ব্যক্তি অধিক দেখিতেছি না। অপরের কথা বলিতেছি না নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া দুঃখে অভিভূত হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মজীবনের আদর্শ হইতে আমি অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছি। সমাজ মধ্যে প্রেম ও একতা নাই। অধিকাংশ পরিবারে ধর্ম্ম প্রবেশ করিতেছে না, নিজ জীবনে ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা জন্মিতেছে না; অপর দিকে ধর্ম্ম জীবনের ম্লানতা থাকিলে সমাজ মধ্যে যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়, তাহাও ঘটিতেছে; এই সকল দেখিয়া মন সময়ে সময়ে বড়ই বিষণ্ণ হইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যে গুরুতর কাজে হাত দিয়াছি, বুঝিবা আমাদের মত লোকের তাহাতে হাত দেওয়া উচিত ছিল না।

শেষ প্রশ্ন এই—এই সকল অভাব মোচনের উপায় কি? এ সকল অভাব এমন যে আমরা সকলের শক্তিকে সমবেত করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া এক মন এক প্রাণে যদি দশ বৎসর একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম করি, তাহাহইলে কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রণালী যেন এক মন এক প্রাণ হইয়া একাগ্রচিত্তে এক কাজে লাগিবার অনুকূল বোধ হইতেছে না। ইহা বলা বাহুল্য যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যমানতা ও কার্য্যকারিতার প্রধান কারণ ইহার নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী। ইহা না থাকিলে আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদিনে কোথায় যাইতাম। কিন্তু আমার বোধ হয় বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। অগ্রেই বলি ইহা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, যে সমাজে যেরূপ জীবন থাকে, কার্য্য প্রণালী তাহাই প্রকাশ করে। অতএব সমাজের জীবনের উন্নতি বিধান চেষ্টা মুখ্য বাহিরের কার্য্য-প্রণালীর সংশোধন গৌণ। বিগত ১৯ বৎসরে আমাদের অবলম্বিত কার্য্য-প্রণালীর দুইটী প্রধান দোষ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম বর্ত্তমান প্রণালী কার্য্যনির্ব্বাহকদিগের মনে দায়িত্বজ্ঞান উদ্দীপ্ত করিবার অনুকূল নহে। যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ সমগ্র সমাজের সকল বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ নিযুক্ত, বর্ত্তমান প্রণালীর দোষে তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সেই কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন না। "যাহা দশজনের কাজ তাহা কাহারও কাজ নহে"—এই সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যের সত্যতা এখানে দৃষ্ট হইতেছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ সপ্তাহান্তে এক দিন সভাতে উপস্থিত হইয়া, যে কিছু চিঠী পত্র আসে বা অন্য যে কোনও কার্য্য উপস্থিত হয়, যথাজ্ঞান, যথাসাধ্য আপন আপন ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তার উপস্থিত মত একটা বিচার ও ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান তৎপরে যে তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে সমগ্র সমাজের সকল বিভাগের ভদ্রাভদ্র বিষয়ে অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন এরূপ বোধ হয় না। সপ্তাহকাল সকলে নিজ নিজ কাজে

কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন। এই দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবে অতি গুরুতর, গুরুতর প্রশ্ন সকল কমিটীর নিকট উঠে, বহুদিন তাহার মীমাংসা হয় না; অতি প্রয়োজনীয় কাজের প্রস্তাব উপস্থিত হয় যাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্কে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। যদি কোনও কারণে বিবাদ ঘটে সে বিবাদ ভাঙ্গিয়া শান্তি স্থাপন বিষয়ে কেহ আপনাকে দায়ী ভাবেন না, সুতরাং সে বিবাদ থাকিয়াই যায়।

বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর দ্বিতীয় দোষ কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত করিবার সময় তাঁহারা এক ভাবাপন্ন হইয়া কাজ করিতে পারিবেন কি না তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মনোনীত করা হয় না। ইহার ফল এই হয় যে, বৃথা বিবাদ ও কলহে অনেক সময় যায় এবং অনেক ভাল কাজ নষ্ট হইয়া যায়। বিগত ১৯ বৎসরে আমরা এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সঙ্গে তোমার না মিলিলে যে তুমি অসৎ লোক বা আমি অসৎ লোক তাহা নহে; কিন্তু লোক বাছিবার সময় এটা মনে রাখিয়া বাছা উচিত যে, সকলের সঙ্গে সকলের মেলে না। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, দল বাঁধিয়া ভাল করিয়া কাজ করিতে গেলে দুইটী জিনিষের প্রধান প্রয়োজন। প্রথম যাঁহাদের প্রতি কর্য্যের ভার তাঁহাদের উপর দায়িত্ব-জ্ঞানের চাপটা ভাল করিয়া দেওয়া;—দ্বিতীয় এক হৃদয় ও এক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সে কার্য্যের ভার দেওয়া। এই জন্যই দেখা যায় যে প্রত্যেক স্বায়ত্ব-শাসনানুগত দেশে এক এক জন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের ও তাঁহার প্রতি কার্য-নির্ব্বাহক সভা মনোনীত করিবার ভার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঐ প্রধান পুরুষকেও সেই সঙ্গে তাঁহার সহচরদিগকে প্রধানরূপে দেশের ভদ্রাভদ্রের জন্য দায়ী করা হয়। তাঁহারা এবং প্রধানরূপে তিনি মস্তকে গুরুতর কার্য্যভার ও হৃদয়ে প্রবল দায়িত্ব বোধ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মচারিগুলি এক হৃদয় ও এক ভাবাপন্ন হওয়াতে নির্ব্বিবাদে অনেক গুরুতর কাজ হইয়া যায়। এ কথা কেহ বলিলে পারেন যে বিবাদ ও তর্ক বিতর্ককে ভয় করিলে চলিবে কেন? স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদিগের সমাজে সর্ব্বদাই মত ভেদের সম্ভাবনীয়তা। তদুত্তরে বক্তব্য সকল নিয়মতন্ত্রাধীন রাজ্যে দুইটী সভা থাকে, একটী Deliberative অপরটী Executive,—একটী মন্ত্রণা সভা ও অপরটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা। মন্ত্রণা সভাতে policy স্থির হয়, আইন প্রণয়ন হয়; কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাতে কাজ হয়। যাহাদের হস্তে কাজের ভার তাহাদের মধ্যে যথাসাধ্য মত ও ভাবগত একতা থাকা প্রয়োজন। নতুবা Warren Hastingsএর মন্ত্রিসভার ন্যায় কার্য্য অপেক্ষা বিবাদেই অনেক সময় ব্যয় হয়।

পূর্ব্বোক্ত উভয় লক্ষ্যের প্রতি অর্থাৎ কার্য্য-নির্ব্বাহকদিগের দায়িত্ব বোধ ও এক ভাবাপন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব এই—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিবেন। অধ্যক্ষ সভা পাঁচ বৎসরের জন্য সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তা থাকিবেন। সভাপতির প্রতি সেই পাঁচবৎসরের জন্য সমগ্র সমাজের ভদ্রাভদ্র দেখিবার প্রধান ভার অর্পিত হইবে। তিনি সম্ভব হইলে অধ্যক্ষ সভার মধ্য হইতেই

ঐ পাঁচ বৎসরের জন্য একজন সম্পাদক, একজন বা দুইজন সহকারী সম্পাদক,—ও সমাজের যতগুলি Institution থাকিবে ততগুলি কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্য মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগের নাম অধ্যক্ষ সভাতে উপস্থিত করিবেন। বিশেষ কারণ না থাকিলে অধ্যক্ষ সভা ঐ মনোনয়ন পরিবর্ত্তন করিবেন না। অধ্যক্ষ সভা মন্ত্রণা সভার স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া principle ও policy নির্দ্দেশ করিবেন, নিয়মাদি প্রণয়ন করিবেন, কর্ম্মচারিগণের কার্য্য পরীক্ষা ও তাহার দোষ গুণ বিচার করিবেন। তাঁহারা তিন মাস অন্তর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার কার্য্যের রিপোর্ট লইবেন ও সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

কর্ম্মচারি নিয়োগের কাল পাঁচ বৎসর করিবার অভিপ্রায় এই—কালটা দীর্ঘ হইলে দায়িত্বজ্ঞান অধিক চাপিয়া ধরে, কারণ কাহাদের দ্বারা কত কাজ হইল তাহা বিচার করিবার অধিক সুযোগ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কোনও নূতন কার্য্যের সূচনা করিলে তাহা গড়িয়া উঠিতে কিছুকাল বিলম্ব হয়, যাহারা কার্য্যের সূচনা করে তাহাদিগকে সত্বর পরিবর্ত্তন করিলে সে কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। আমরা যখন প্রতি বৎসর কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনের নিয়ম করিয়াছিলাম তখন আমাদের মনে অতিরিক্ত ভয় ছিল। কিন্তু এই ১৯ বৎসরে সে ভয় অপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এখন দেখিতেছি প্রতি বৎসর নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত করা একটা যাতনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; এ নিয়মে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য সে যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এই প্রণালী প্রচলিত করিলে আমাদের মধ্যে party government আসিবে। আমি তাহার কারণ দেখি না। কারণ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেমন দুই দলের দুইটা policy আছে আমাদের মধ্যে সেরূপ নাই, দ্বিতীয়তঃ সে দেশে কর্ম্মচারিপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ একটা poilcy'র জয় নহে, তাহার সঙ্গে অর্থলাভ, কর্ম্ম দেওয়া অনুগত প্রতিপালন শক্তি পাওয়া প্রভৃতির সম্বন্ধ আছে, আমাদের মধ্যে সেরূপ কোনও সুবিধা নাই।

আমি যে প্রণালীর কথা বলিতেছি ইহা অবলম্বন করিলেই যে আমরা স্বার্থপর লোক নিঃস্বার্থ হইয়া যাইব, এবং এক লম্ফে ধর্ম্মজীবনের উন্নত সোপানে উঠিব তাহা মনে করি না, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আরম্ভ হইলে যে সকল অভাবের কথা অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি তাহার অনেক মোচন হইতে পারে, দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত কার্য্য করিয়া মানুষ গড়িতে পারে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও ভগ্নোন্মুখ সমাজে অনেক পরিমাণে শান্তি ও একতা স্থাপিত হইতে পারে এই মাত্র আশা হয়। সংক্ষেপে যে দুই মূল ভাব হৃদয়ে রাখিয়া বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে বলি তাহা এই—Choose proper men and invest them with large powers; conbine the best advantages of constitutional government with the best advantages of personal rule.

অপরাপর নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের মধ্যে প্রচার সম্বন্ধীয় প্রণালীর পরিবর্ত্তন, মফঃস্বল সমাজ সকলের সহিত সখ্যস্থাপন, পরিবারে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা, বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য Theological Class পুনঃস্থাপন ও একদল Successor train up করিবার জন্য Training College স্থাপন

অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। প্রচার-প্রণালীর পরিবর্ত্তন-বিষয়ে প্রধানতঃ বক্তব্য, এক এক জন কি দুই দুই জন প্রচারককে এক এক স্থানে কিছু দীর্ঘ-কালের জন্য স্থাপন করিয়া কতিপয় সমাজের অন্তর্গত মণ্ডলী সকলের বিশেষ ভার তাঁহাদের প্রতি অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা উক্ত প্রদেশে বাহিরের লোকের নিকট যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন বটে, কিন্তু প্রধানতঃ উক্ত মণ্ডলী সকলের অন্তর্গত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এই উভয় কার্য্যের জন্য দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক রাখিতে পারিলে ভালই হয়।

উপসংহারে ব্যগ্রতার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও হিতৈষীদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর উপেক্ষা করিবেন না। সকলে আর একবার প্রাণের সমুদয় শক্তি দিয়া নবভাবে ইহাকে ধরুন। সামান্য তপস্যাতে হইবে না; কঠোর তপস্যাতে প্রবৃত্ত হউন; যাহাতে সমাজ-মধ্যে শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল কার্য্য সবল ও দৃঢ় হয়, পরিবারে পরিবারে ধর্ম্ম প্রবেশ করে ও প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবন গাঢ় হয়, সেরূপ উপায় অবলম্বন করুন। আমার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী পরিত্যাগ করুন, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু কাজে কিছু করুন।"

ব্রহ্ম জগৎ। (১০)

আমরা চিত্ত-শুদ্ধি-লাভের দুই প্রকার সাধনের কথা বলিয়া আসিয়াছি। এই বারে আমরা তৃতীয় প্রকার সাধনের উল্লেখ করিব। ইন্দ্রিয়-বিজয় ও আত্ম-তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা যেরূপে মলিন চিত্ত বিশুদ্ধীভূত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ইহাদের অপেক্ষাও আর একটী বিষয়ে বিশেষরূপে অনুশীলন না করিলে মনের মলিনতা অপনোদিত হয় না। এই বিষয়টীও কম গুরুতর নহে।

মনুষ্য কর্ম্ম করিতেই জন্মলাভ করিয়াছে। কর্ম্ম না করিয়া কোন মনুষ্যই এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। চিৎ ও অচিৎ এই উভয়ের যোগে প্রাণিরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। এই অচিৎই প্রকৃতি বা জড়াংশ বলিয়া কথিত। প্রকৃতি চঞ্চল, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। সর্ব্বদাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে। প্রকৃতি, ক্রিয়াশীল। জড়, একবার গতি প্রাপ্ত হইলে, বিনা বাধায় কদাপি সে গতির বিরাম হয় না। ইহা জড়ের একটী ধর্ম্ম। চিৎ বা পুরুষ বা চেতন, প্রকৃতিতে আরম্ভকালে যে গতি বা ক্রিয়া প্রদান করিয়াছেন, এক দিনের জন্যও সে ক্রিয়ার বিরতি নাই। সুতরাং প্রকৃতি বা জড়েরই পরিণাম ভূত দেহাদিও কদাপি ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন শূন্য (change) হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই বিশাল জড়রাজ্যে সর্ব্বদা ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। তবে নিতান্ত জড়রাজ্যে যেরূপ Motion বা গতিপ্রভাবে এই ক্রিয়া চলিতেছে, প্রাণিরাজ্যে সে ক্রিয়ার একটু বিশেষত্ব আছে। দেহে যদিও ইচ্ছা প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তথাপি দৈহিক-ক্রিয়া সমূহ প্রধানতঃ মনের সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই সংসাধিত হইতেছে। প্রাণিরাজ্যের এইটুকুই বিশেষত্ব। নিতান্ত জড়রাজ্যে Mathematical নিয়মানুসারে যে কার্য্য

সংসাধিত, প্রাণিরাজ্যে তাহাই সুসংযত— মানসিক ইচ্ছায় বা সংকল্পবলে পরিচালিত। ইতিপূর্ব্বেই আমরা ইহা একরূপ প্রমাণিত করিয়া আসিয়াছি। জড়রাজ্যে Motion বা গতিরই প্রভাব বেশী; তথায় Mind বা মন সুষুপ্ত। কিন্তু প্রাণিরাজ্যে গতি কতকটা হতবীর্য্য, মনেরই প্রতাপ সমধিক পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রাণিরাজ্যেই অত্যধিক। এই জন্য প্রাণিরাজ্যের ক্রিয়া-সমূহের প্রণালী কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জন্যই প্রাণিরাজ্যের ক্রিয়া সমধিকভাবে মন দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই বলি, কোথাও কোন পদার্থ ক্রিয়াশূন্য পাওয়া যাইবে না। সদাক্রিয়াশীল প্রকৃতি বা জড় হইতে অভিজাত পদার্থের ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম চলিয়া যাইবে কিরূপে? যাহাকে জড় বলা যাইতেছে, তাহাই ত বিজ্ঞানের ভাষায় গতি বা ক্রিয়ার ঘনীভূত অবস্থা। সুতরাং ক্রিয়াই জড়রূপে বিস্পষ্টীকৃত, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে। যাহা হউক, মনুষ্য, কর্ম্ম ব্যতীত ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। মনুষ্যের সেই ক্রিয়াপুঞ্জ মন দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও সঙ্কল্প পূর্ব্বক ক্রিয়া, মনুষ্য-রাজ্যেই দেখা যায়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনুষ্য, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সংকল্প পূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া থাকে।

কর্ম্মের ফল আছে। যে কর্ম্মই যখন করা যাউক্ না কেন, তখনই তাহার একটী করিয়া ফল (Effect) জন্মিয়া যায়। কর্ম্মের ধর্ম্মই, ফল-উৎপাদন। বিশাল-সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র একটী ঢিল ছুঁড়িলে, তাহাতেও ফল না জন্মিয়া যায় না। পরিবর্ত্তন-মাত্রই ফলপ্রসূ। কর্ম্মের এই ফল, মনুষ্যরাজ্যে পুণ্য ও পাপ নামে অভিহিত। কর্ম্ম না করিয়া মনুষ্য, যখন একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, এবং কৃত-কর্ম্ম মাত্রই যখন তাহার ফল প্রসব করিয়া থাকে, তখন ইহা অতিস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কর্ম্মের প্রতাপ মনুষ্যরাজ্যে অতীব বলশালী। আমরা বলিয়াছি, মনুষ্যরাজ্যের সমুদয় কর্ম্মই মন দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং কর্ম্মের জন্য মনই বিশেষরূপে দায়ী। আবার ইহাও স্থিরতর যে, কর্ম্মনিষ্পাদন মানবের মনের উপর নির্ভর করে বলিয়াই ক্রিয়া করিবার স্বাধীনতা মনুষ্যরাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই, মনুষ্য, স্বয়ং কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী। মন সংকল্পাত্মক। সুতরাং মনুষ্যের ক্রিয়াপুঞ্জও সংকল্প বা বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব বাসনাই কর্ম্মের জননী।

কর্ম্ম যখন বাসনা বা সংকল্প হইতে অভিজাত এবং মনুষ্যের যখন স্বাধীন ইচ্ছা (Free-will) রহিয়াছে, তখন বাসনা বশীভূত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ কর্ম্ম দুই প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে। ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী না হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান। ফলাভিলাষ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান যত করা যায়, অর্থাৎ বাসনার অনুশীলন যতই করিতে থাকা যায়, ততই বাসনা প্রবল হইতে থাকে। অনুশীলনে বৃদ্ধি ও প্রাবল্য ভিন্ন, বাসনা ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কামনা ধ্বংস করিতে হইলে কর্ম্মে তাহার সংস্রব উঠাইয়া দিয়া, কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। Prudence বলে চালিত না হইয়া, Conscience বলে চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম ফল উৎপাদন করিয়া বন্ধের কারণ হইতে পারে না। পরোপকার, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য, মনুষ্যের পক্ষে বিহিত বলিয়া সমাজ

কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট,সেই সমস্ত কার্য্যের,কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরাভিপ্রেত জ্ঞানে, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হিন্দুদর্শন, কর্ম্মকেই বন্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। কর্ম্মই মনুষ্যের সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কারণ। যত দিন কর্ম্মবীজ আছে, তত দিন অজ্ঞানতা আছে। তত দিন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে পারা সহজ নহে,—সমস্ত দর্শনের এই মত। প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ সমস্ত-দর্শনের অভিপ্রেত। কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে, সে কর্ম্ম আত্ম-কক্ষে নিরুদ্ধ না হইয়া, সম্প্রসারিত হইতে থাকে। তখন পর আপন হয়। এইরূপ অনুষ্ঠানের ফলে, কর্ম্ম ক্রমশঃ আত্ম-কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া পরার্থ অনুশীলিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে পরার্থানুষ্ঠিত বা সম্প্রসারিত কর্ম্ম-পুঞ্জ তখন আর বন্ধের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং তখন ক্রমশঃ বাসনাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। এই রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্ত-শুদ্ধির উপায়। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ।" কর্ম্ম সকল ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক, মমতাশূন্য ও নিষ্কামী হইয়া,শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর (গীতা, ৩।৩০)। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আত্মার কোন কর্ম্ম নাই। ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিরই ক্রিয়া বা পরিণাম। নির্লিপ্ত আত্মার তাহাতে কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ নিষ্কাম ভাবে, নির্লিপ্ত আত্মাকে জানিয়া, ঈশ্বরোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে বাসনা নিষ্প্রভ হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে থাকে। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান, চিত্তশুদ্ধির তৃতীয় সাধন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, (১) শমদমাদি উপায়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-সংযম চিত্তশুদ্ধির প্রথম সাধন। (২) শ্রবণ মননাদি উপায় বিশিষ্ট আত্মতত্ত্বাভ্যাস দ্বিতীয় সাধন। (৩) কর্ত্তব্য ভাবিয়া, ফলানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুচরণ চিত্ত-শুদ্ধির তৃতীয় সাধন। এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ হইলে, ক্রমশঃ তাহাতে ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা-রই নাম জ্ঞান সাধন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রত্যহ নিয়ম মত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া জ্ঞান-সাধন করিতে হয়। এইরূপ সাধন করিতে করিতে পরে আপনিই ক্রমশঃ সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। যাহারা নিতান্ত মূঢ়মতি, যাহারা মোক্ষের লালসা রাখে না, তাহারাই ভোগাসক্ত হেতু স্বর্গাদি কামনা করিয়া সকাম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। "মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টীনাং আত্মানাত্মাবিবেকিনাং। রুচয়ে চাধিকাবায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ"। এইরূপ কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত নিকৃষ্ট। মনুষ্যের নানা-রূপ প্রবৃত্তি। যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভে সমাচ্ছন্ন-চিত্ত, তাহারা যদি নিষ্কাম ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া, সকাম-বিধি না পায়, তবে নিরঙ্কুশ ভাবে যথেচ্ছাচারী হইবে,—এই সকল লোকের জন্য সকাম-কর্ম্মের উপদেশ। ইহা মন্দের ভাল। যাহারা মোক্ষের লালসা রাখে না, যাহাদের কামাদি ভোগই ভাল লাগে, এ বিধি তাহা-দেরই জন্য। আর যাহারা একেবারে প্রথমেই মোক্ষসাধনে অসমর্থ, অথচ মোক্ষার্থী এবং যাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা আছে, তাহারা জ্ঞান-সাধনের জন্য নিষ্কামভাবে, ভগ-বানে ফলার্পণ পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ নিষ্কাম-ক্রিয়ার আচরণে জ্ঞান-সাধনের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হয়। কাম্য কর্ম্ম নিতান্ত

নিকৃষ্ট। নিষ্কাম কর্ম্ম তদপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির সোপান-স্বরূপ।

এতদূরে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের যে তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইলাম, ইহার বিরুদ্ধবাদী একদল লোক আছেন। ব্রহ্মসাধনের বিরুদ্ধে তাঁহারা কয়েকটী আপত্তি দর্শাইয়া থাকেন। সেই আপত্তিগুলি কিরূপ, এবং উহাদের কোন মীমাংসা [illegible] কি না, আমরা আগামী বারে তাহা প্র[illegible] করিতে যত্নশীল হইব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

গোপালের মা।

১

শরতের নীলাকাশ-পটে
সন্ধ্যা-ছবি চিত্রিত সুন্দর,
চারিপাশে কনক তারকা
মাঝে মাণিকের শশধর!

২

তারা যেন দেখিছে চাহিয়া,
দূরস্থিত মর-নিকেতনে—
কত খেলা খেলিছে মানব,
কত ঢেউ নশ্বর জীবনে।

৩

"মা" এসেছে সুখদ আশ্বিনে
বঙ্গ-ভূমি আনন্দে ভাসিছে,
শত বাদ্য শত সুখ-গীতি,
শত মুখে ফোয়ারা ছুটিছে!

৪

শুধু—এক কুটীরের দ্বারে
বসিয়া জননী একজন,
জগতের আনন্দ-কল্লোলে
তারি প্রাণে আতঙ্ক-স্বপন।

৫

দূরে তার প্রাণের "গোপাল"—
আজও আসেনি বাড়ী ফিরে,
তাই আজো সে আশ্বিন মাস
আসেনি এ মায়ের কুটীরে!

৬

"গোপাল" সে নয়নের তারা
একমাত্র আঁচলের নিধি,
জননীর প্রীতির সম্বল,
আর সবে ডেকে নেছে বিধি।

৭

সেই ধন দূর পর-বাসে,
মা রয়েছে শূন্য দেহ লয়ে,
আশা শুধু বাঁচায়ে রেখেছে
মনের মতন কথা ক'য়ে।

৭

বাছা সেই দূর দেশ থেকে
লিখেছিল পত্র একখানি,
"বাড়ী যাব পূজার ছুটিতে"
মা প্রণমে "সুবচনী রাণী"

৯

সে পত্র, মা শত চুম্ব দিয়া
প্রতিদিন দেখি পাঁচ বার,
আখরে বা রয়েছে মাখা'ন
মনোরম মাধুরী বাছার!

১০

কুড়াইয়া ঝুনা নারিকেল
সন্দেশ করেছে গুড় দিয়া,
কচি শশা, পাকা চাঁপাকলা,
যতনে মা রেখেছে তুলিয়া।

১১

"বুধীর" তো বাছুর হয়েছে,
এক সের দুধ দেয় গাই—
এত সুখে দারুণ অসুখ
যাদুমণি ঘরে আসে নাই।

১২

দূরে বাজে সপ্তমীর বাঁশী
"উমা এল হিমালয়-রাণী!"
মা ডাকিল সর্ব্বমঙ্গলায়
"বাছারে মা কোলে দাও আনি"

১৩

উঠানের এক পাশে শোভে
ফুল-ভরা শেফালির তরু
আর দিকে লাউ-মাচা-খানি
তার তলে শুয়ে বুধী গরু।

১৪

অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া গাভী
টুপ টুপ শেফালি ঝরিল,
সুধা-মাখা মৃদুল বাতাসে
লাউ-পাতা ঈষৎ দুলিল;

১৫

মা'র প্রাণ উঠিল চমকি
তরাসে নয়নে হাত দিল,
স্বপ্ন নহে—সত্য প্রাণধন,
"মা" বলিয়া অমৃত ঢালিল!

১৬

"বাবা" আর সরিল না কথা
স্নেহ-বুকে সন্তানে টানিয়া,
ভিজিল মা দুটি আঁখি-জলে,
গোপালের গলা জড়াইয়া!

১৭

রাজগৃহে এক দুর্গা-পূজা
কত ধুমে হ'তেছে সাধন,
শত পূজা দীনা মা'র বুকে,
কি নীরবে বহিছে এখন!

শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

রাজা রামমোহন রায়। (৪)

১৮৩০ সনের এপ্রেল মাসের "কলিকাতা মন্থলি জর্নাল" হইতে "সংবাদ কৌমুদীর" এক প্রবন্ধের সংবাদ পাইয়াছি। এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

১। 'বেদি সাহেব ও সতী-দাহ।'

কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

এ জনরব উঠিয়াছে—বেদি সাহেব, সতী আবেদন পত্র লইয়া বিলাত গিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন যে, জেনেরেল পামার-লিখিত সতী দাহ সম্বন্ধে আর এক পত্র, ধর্ম্ম-সভায় প্রেরণ করিয়াছেন। সে পত্র খানি, আজিও কলিকাতায় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বেদি সাহেব লিখিতেছেন, ঐ পত্র-পাঠে হিন্দুরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। এই জনরব সত্য হইলে, সাহেবের পত্রের মর্ম্ম এই দাঁড়ায়,—ইংরাজেরা, সতী-দাহ পুনঃস্থাপনে প্রস্তুত; কিংবা পুনঃস্থাপন-প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। এই জনরবেই আমরা সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছি।

'শাস্ত্রের সম্মতি না লইয়া, কেবল বেদি সাহেবের কথায় নির্ভর করিয়া সহৃদয় ইংলণ্ড বাসীরা, কি এত নির্দ্দয় হইয়া দরিদ্র ভারতের সহস্র সহস্র রমণী সংহারে অনুমোদন করিবেন?—এ কথা তো বিশ্বাসই হয় না। ঈশ্বরের কি এমনই বিধান যে, ইংলণ্ডের সমস্ত লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে? "আমরা কিসে সুখী হইব, ইংরাজেরা সর্ব্বদাই তাহার উপায় বিধান করিয়া আসিতেছেন। পাছে রাস্তায় দস্যুরা

লাঠি দিয়া আমাদিগকে হত্যা করে, এই জন্য পথে পথে প্রহরীর থানা স্থাপিত হইয়াছে। দস্যুদিগের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিচারপতিরা চেষ্টা করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের নিরুপায় অবলাগণ, ইংলণ্ডের এমন কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড-বাসীরা তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অবলাদিগের প্রাণসংহার দণ্ড প্রদান করিবেন? জেনেরেল পামারের পত্র এ-দেশে আসিলে, তাঁহার পত্র-মর্ম্ম অবগত হইয়া বেথি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ রাজমন্ত্রী, প্রধান কর্ম্মচারী বা সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাকে সতীদাহ-প্রার্থনার সম্মতি প্রদানের আশা দিয়াছেন? আমরা উদ্গ্রীব হইয়া পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ঐ ব্যক্তির নাম জানিতে পারিলে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। *—কতিপয় ব্যক্তি।'

সংবাদ-কৌমুদীতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি।

২। প্রতিধ্বনি।

"গুরু। এমত স্থান আছে যে, যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্ব্বত আছে। সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে লাগে। তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহাদের সমসূত্রপাতে যে কএক বার গমনাগমন করে, সেই কএক বার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে, সেখানে তূরী দ্বারা শব্দ করিলে প্রতি শব্দের তিন বার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকট দেশে যে প্রতিধ্বনি হয় সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে সেখানে দশ এগার বার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, এবং ব্রসেল্স নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে সে পোনের বার হয় এবং জর্ম্মণির অন্যস্থানে অন্য হইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পর ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সে হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোন কোন সময়ে এমন বোধ হয় যে, ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন কোন

* "MR. BATHIE AND THE SUTTEE PETITION.

To The Editor of Cowmoodee.

"We hear it noised abroad that Mr. Bathie who proceeded to England with a petition for burning women, has lately sent a letter to Calcutta, in which he says that he had despatched another letter by the *General Palmar* to the Dhurma Subha on the subject. The letter has not yet reached Calcutta, but Mr. Bathie says it is likely to afford much satisfaction to the Hindoos. If this be true, Mr. Bathie's letter will probably convey the information that the English are prepared to re-establish the rite, or have given him hope that they will sanction the custom of burning women. This is sufficient to fill us with astonishment. Can it be that the benevolent inhabitants of England have become so merciless that upon the simple advice of Mr. Bathie without any authority from the Shatras, they will authorize the murder of thousands of women in this poor Country? Can it be in the dispensation of Providence that the minds of the people in England shall have at once changed? They perpetually devising means for rendering us happy. Now remark;—that we may not be murdered with clubs in the public paths, they have appointed an establishment of Chowkedars. What exertions do the Magistrates not make to shield us from the outrages of robbers. May we not therefore enquire, what crime against England the helpless females of this country can have committed that in revenge these weak women sh[...]ld be sentenced to death? When the l[...] by the *General Palmer* arrives, and [...] tents are fairly known, we shall be a[...] to ascertain from Mr. Bathie what minister or public officer or chief [...] have led him to expect that this prayer for the burning of widows can be complied with? When we are acquainted with the name of the individual, we sh[...] offer our own remarks.—Some People.

—*Calcutta Monthly Journal, April, 18[...]*

সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকট হইতে যায়। কোন কোন সময়েতে যেখানে শব্দ কালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য সময়েতে প্রায় শুনা যায় না, এবং যেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্ত্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দ হইতে অনেক প্রতি-ধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল যে, সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়ততা নিশ্চয় করিল। ইতি।"—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ।

৩। অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি।

"চুম্বক মণি একপ্রকার লৌহ। তাহার আশ্চর্য্য যে যে গুণ, তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বক মণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুম্বক মণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে, তবে সে মণি ও লৌহ কিম্বা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্ব্বার পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বক মণিতে স্পৃষ্ট লৌহ-শিক যদি এমত রাখা যায় যে, সে মধ্য দেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতকক্ষণ পরে সে এই মত স্থির হইয়া থাকিবেক যে, এক মুখ উত্তর দিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণ দিকে হইবে। এই তাহার যে দুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বক লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতুক সেই দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বক মণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাব-সিদ্ধ গুণ, তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব, তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ চুম্বক লৌহের মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেলিয়াছিল। তদবধি ক্রমে ক্রমে অত্যল্প পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যদি চুম্বক-লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে সে সমান থেলে, তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে থাকিবে না, কিন্তু এক মুখ ঊর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়।

চুম্বক লৌহ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকে। এই স্বাভাবিক গুণ তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে, তাহার দক্ষিণ মুখ কখনও উত্তরে যায় না ও উত্তর মুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বক-লৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে, সে দুই পরস্পর যদি এই মত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণ মুখ ও আর একটার উত্তর মুখ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে, দুইটার উত্তর মুখ পরস্পর আসন্ন হয়, তবে দুইটাই অপ-দ্রাবক হয়।

চুম্বক মণির কেন্দ্রাভিমুখ্য রূপ যে গুণ, তাহার অন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক। যেহেতুক ইহা দ্বারা নাবিকেরা পথ-হীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকের তারা ভিন্ন কোন পথ-নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহাদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বক মণির দ্বারা তাহাদের পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বক মণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি

চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত, এবং ঐ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীস্থ লোকেরদের যে মহোপকার হইতেছে, সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বক মণি সকল লৌহ ও লৌহ-নির্ম্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বক মণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বক মণির যে আকর্ষণ-শক্তি, সে তাহার সর্ব্বাবয়বে তুল্য নহে; কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণশক্তি; তাহার দুই মুখ হইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণশক্তি ন্যূন। ইহার দ্বারা চুম্বক-মণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বক মণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্ স্থান, তাহা জানা যাইত না।

চুম্বক মণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে যে চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ, তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটী চুম্বক মণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বক মণি যদি পরিমাণে এক শের হয়, তবে দশ শেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বক মণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে, এবং কোন কোন সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণ-শক্তি হানি হয় না। চুম্বক মণি হইতে একাঙ্গুল দূর যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয় তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বক মণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিবয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন। যদি চুম্বক মণির নিকটে কোন লৌহ থাকে, তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎগুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে, এবং এই মত চুম্বক-মণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও চুম্বক-মণির সে শক্তি হ্রস্ব না। যে প্রকরণেতে চুম্বক-মণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্জেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার; অতএব আমারদের এই পর্য্যন্ত নির্ব্বাচ্য যে, চুম্বক মণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে, ঐ লৌহ চুম্বক-মণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী হয়। চুম্বক মণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয়, ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে। যেহেতুক প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্ল্লভ।

চুম্বক মণির গুণ হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্নপূর্ব্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণহানি অবশ্য হয়। চুম্বক মণির উত্তরের মুখ যদি অনেকক্ষণ দক্ষিণ দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয়, এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বক মণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত-গুণ লৌহ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরো উষ্ণ জলে চুম্বক মণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণহানি হয়, এবং অত্যন্ত জ্বলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বক মণি একত্র এমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণমুখ ও অন্যের উত্তর-মুখ নিকটে থাকে, তবে উভয়ের শক্তি হানি হয়।

চুম্বক মণির এই এই আশ্চর্য্য গুণের

প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে,পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে, তাহার আকর্ষণ শক্তিতে চুম্বক মণির দুই মুখ দুই দিকে স্থির থাকে। চুম্বক মণির যে এই দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ, সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। যাহারা বেলুন দ্বারা আকাশে উঠে, তাহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছে, যে উর্দ্ধে যতদূর পর্য্যন্ত উঠা যায়,সেথানেও চুম্বক মণির শক্তি হানি হয় না এবং উত্তর-দক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুম্বক মণি রোমান লোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দুলোক কর্ত্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ উত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না; সে গুণ কেবল গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল, মার্কোপোল নামক এক ব্যক্তি চীনদেশে গিয়াছিল ও সেথানে চুম্বক যন্ত্র দেখিয়া সেথান হইতে চুম্বক মণি ইউরোপে আনিয়াছিল, এই মত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই, যেহেতুক চীনেরা ইউরোপীয় লোক হইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনীয়েরদের হইতে এই বিদ্যা পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকেরদের উপকারার্থে চুম্বক মণি চুম্বক যন্ত্রেতে দেওয়া যায়,তাহার আকার এক খণ্ড কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক্ ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্য স্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায়, পরে চুম্বক মণি স্পৃষ্ট এক সূচীর মত করিয়া ঐ আলে এমত রাখা যায় যে, সে বদ্ধ অথচ অনায়াসে চারিদিকে খেলে, এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে একটা কাঁচ দেওয়া যায়। যখন ঐ চুম্বক সূচি উত্তর মুখে দুলিয়া দুলিয়া কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে স্থির হয়,তখন কোন্ স্থান কোন্ দিগে তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুম্বক যন্ত্র সর্ব্বদা থাকে এবং জাহাজের যে স্থানে অত্যল্প দোলন আছে, ঐ স্থানে চুম্বক যন্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া যাইতে নিশ্চয় করে, তখন এই চুম্বক যন্ত্র দ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ, নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌঁছে।

যাহারা স্বীকার করে যে ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুম্বক যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা বলে যে ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ফ্লাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুম্বক যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হেতুক সেদেশের ধ্বজার স্বরূপ ঐ চুম্বক যন্ত্র হইয়াছে। ইতি।"

৪। মকর মৎস্যের বিবরণ।

"মকর মৎস্য আমারদের জ্ঞান বিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বৃহৎ। তাহার মধ্যে কোন কোন মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষুঃ বড় গরুর চক্ষুর মত এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে,সে চতুর্দ্দিকে,দুই

করিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ভবতী হইয়া অন্য মৎস্যের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর ন্যায় একটী শাবক প্রসব করে, ঐ শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও একাঙ্গুলি পরিমাণ কীট আছে, মকর মৎস্য সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম, উকুনের মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মৎস্যের চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মৎস্য, সে সর্ব্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তুকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূর হইতে অন্য দিকে পলায়, যেহেতুক মকরের আত্ম-রক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাঁকিলা মৎস্য সহজরূপে তাহার আঘাত নিষ্ফল করে। কাঁকিলা মৎস্য উল্লম্ফন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার স-ধার চঞ্চু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে, তৎক্ষণাৎ মকরের ঘায়ের রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহাজন্তু আপনার শত্রুকে আঘাতী করিতে বৃথা চেষ্টা পূর্ব্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আস্ফালন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তোপের শব্দ হইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শত্রু। তাহার অন্য শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে যত সংহার করিতে না পারে, মনুষ্য সম্বৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মৎস্য উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মৎস্যেরা বহু কাল পর্য্যন্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে আসিত এবং তাহারা তীরের নিকটেই প্রায় মারা যাইত; কিন্তু দেন্মার্ক ও হলাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওয়াতে সে মৎস্য ন্যূন হইয়াছে এবং এখন বরফ-ময় ও গভীর জলে সর্ব্বদা থাকে।

এই মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই, ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয় নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য মারিবার কারণ এক জন বর্শাধারী থাকে, দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতকদূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ি অন্তর হয়। মকর মৎস্য দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁহুছে, তবে বর্শাধারী, অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায়, তখন পুচ্ছ উর্দ্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকেরদিগকে জানাইবার কারণ আপনারদের এক দাঁড় নৌকাতে গাড়িয়া দেয়, ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকীদার অন্য অন্য নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

ঐ মকর মৎস্য আপনার উপর অস্ত্রাঘাত হইলে অতিবেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্শাতে বদ্ধ আছে সেই রজ্জু দুই শত বাম

লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে, সে অবাধিতরূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্য এমত বেগে যায় যে নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে; কিন্তু সে মৎস্য দুর্ব্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ দুই শত ব্যাম লম্বা রজ্জু যদি ফুরায়, তবে অন্য কোন নৌকায় রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন কোন সময় এমত হয় যে, ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবশ্যক হয়; কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে মৎস্য অধিকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে; এবং শ্রান্তি প্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্ব্বকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয় বার উপরে উঠে, তখন আর বার জলে প্রকাশ করিতে অপারক হয়, এবং জেলা অস্ত্র দ্বারা নাবিকেরা করিয়া বধ করে; যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মারিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থূল রজ্জু দিয়া বান্ধে, আর এক দিকে উল্টাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছে এক রজ্জু দিয়া বদ্ধ করে, ও তাহার পৃষ্ঠ হইতে পিছলিয়া না পড়ে, এই নিমিত্ত আপন আপন পায়ে লৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চর্ব্বি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল বাহির করিলে ওষ্ঠের রোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্য হইতে আশি পিপা তৈল পাওয়া যায়। মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যে যে বন্য লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয়, এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী পুত্র সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্য যথার্থ প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ি লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে। ইতি।"

৫। বেলুনের বিবরণ।

"তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ পথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়স্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশ যাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

সন ১৭৬৬ সত্তর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে এক পিত্তল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ডদেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হই-প্রত্যাশা করিতে করিতে হঠাৎ জনা গেল

যে ফ্রান্সদেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন্ মঙ্গলফ্যে নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল ও তাঁহারা এই ভাবিলেন যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন। তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল,সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হাত উর্দ্ধে উঠিল। ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেলে সে সাড়ে সাত শত হস্তে উঠে ও যেথানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে ১৭৬৬ সনে অগ্নিধারী বেলুন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত সের ভার লইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে। এই মত এক বেলুন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল, সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে এই দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহুত হইল এবং সেখানে তাঁহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে করিতে শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলুন প্রস্তুত করিলেন; ঐ বেলুনের সহিত এক টুকরা সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রাখিল। এ তিন পশু প্রথম আকাশ যাত্রী হয়। ঐ বেলুন উঠিবার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত উর্দ্ধে উঠিল, এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেথান হইতে উঠিয়াছিল সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে বেলুনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশ পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশ যাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন; তন্নিমিত্ত এক বেলুন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি-স্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য আয়োজন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ বিশ মণ। ১৭৮৩ শালে ১৫ অক্টোবর এই বেলুনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বেলুনের নীচে বসিলেন ও তাহার মধ্যে আগ্নেয় আকাশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিলেন। এই প্রথম বার মনুষ্যবংশ আকাশ গমন করিল। কতকদিন পরে সেই বেলুন এক শত চোয়ান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যথন বেলুন নামিতে লাগিল তথন সাহেব অগ্নিতে জ্বাল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলুন আগ্নেয় আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলুন দুই শত বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের উপরে লোকেরদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়মান হইয়া তেইশ পল থাকিল।

ইহার পূর্ব্বে যত বেলুন হইয়াছিল, সে সকল বেলুন রজ্জু দ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত। ঐ শনে পিলাতর সাহেব এক

আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতেঁ বেলুনে ঊর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ-যাত্রিকেরা বেলুন দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন। তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না, পরে সাম্বিক বেলুন দ্বারা আকাশ গমন শেষ হইল; যেহেতুক ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদ্ঘাত বায়ুতে বেলুন পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ উদ্ঘাত বায়ু তাহাদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উদ্ঘাত বায়ু দ্বারা চার্লস ও রবার্ট এই দুই সাহেব বেলুনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলুন প্রস্তুত করিয়া ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে নল-নির্ম্মিতা সাড়ে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত আয়ত এক নৌকা সংলগ্না করিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে ভার রাখিলেন। ঐ যন্ত্র ঊর্দ্ধে উঠিলে আগ্নেয় আকাশ নির্গত হওয়াতে তাহারা যেমন বেলুন নামিতে দেখিল তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হালকি হইয়া ঐ বেলুন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাহাদের আকাশ গমন কালে তাঁহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলুন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন। কিন্তু আগ্নেয় আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত চার্লস সাহেব দ্বিতীয় বার একাকী ঊর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহার অবরোহণে বেলুনের ভার এক মণ পঁচিশ সের ন্যূন হইল, তাহাতে এক দণ্ডের ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন, সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন। কত ক্ষণ পরে তাঁহার হস্তের অঙ্গুলী শীতেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এত ঊর্দ্ধে পৌহুছিলেন যে সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে বাষ্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার এমত দর্শন হইল যে,মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশ-যাত্রাকালে আপন মিত্রদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বেলুনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন, ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও নামিতে লাগিলেন। কত ক্ষণ পরে তিনি এক মাঠে নামিলেন। তিনি সাত হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।

এই এই পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেলুনে উঠিলেন। তাহাদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতুক তাহাতে অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন মাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ শনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেবট্টি হস্ত বেলুন দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্লস ও রবার্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেলুন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বেলুনের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ

বেলুন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন, যে-হেতুক বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল; কিন্তু তাঁহারা নিঃশব্দে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন। তাহারদের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হইল; কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড় দ্বারা তাহারদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল। কতক উর্দ্ধে উঠিলে তাঁহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া সম্মুখে রাত্রি দেখিয়া নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে, বায়ুর প্রতিকূল গমন দুঃসাধ্য, কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমন মাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেলুন দ্বারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন বেগে উর্দ্ধে গমন করিলেন যে, সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এবং এমত ঘোর বাষ্পেতে আবৃত হইলেন যে, পৃথিবী ও আকাশ তাঁহারদের অদৃশ্য হইল। এই বিপদ্‌কালে এক ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বেলুনকে ঘুরাইল ও উলট পালট করিল ও দিক্‌ বিদিক্‌ ক্ষেপ করিল। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। তাঁহাদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘের অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতোমধ্যে বেলুনের আস্ফালন পলে পলে বাড়িতে লাগিল। অনন্তর নীচে হইতে একটী বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাষ্পের আবরণ হইতে তাহারদিগকে উর্দ্ধে ক্ষেপ করিল, তাহাতে তাঁহারা মেঘরহিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেলুন-মধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপরে তাক্ত রশ্মি এমন লাগিল যে তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে বেলুন ফাটিয়া যাইবেক। এই প্রযুক্ত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেলুনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তাহার দ্বারা আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাঁহারা অতি শীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ বেলুনের ভার ন্যূন করিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্র দ্বারা মরিলেন। তিনি অর্দ্ধপোয়া ক্রোশ উর্দ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে, সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না; কিন্তু ঐ বেলুনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে, সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবামাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ই জুন তারিখে গার্নেরিন্ সাহেব ইংলণ্ডে বেলুনে উঠিলেন, তিনি সকল হইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন আপন ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায়, তবে তাহার অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর হইল ফ্রান্সীয়ের ও জর্ম্মনিরদের মধ্যে এক যুদ্ধকালে ফ্রান্সীয় এক সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ-সৈন্যের গমনাগমন বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলি উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল, কিন্তু তিনি এত

দূরে ছিলেন যে, গুলি তত দূরে পৌছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগে ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিলেন।"

৬। মিথ্যাকথন।

"মিথ্যা বাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়,কারণ মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত; এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কথা এমন ঘৃণার বিষয় যে, অত্যন্ত মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ যাহারা মিথ্যা কহে তাহারদিগের দুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে আপনার দিগের একটী মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্যে তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমা হইতে বয়সে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা কিম্বা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখনো তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে যে, যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচারসময় শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না, বরং সে জন্যে নিগ্রহভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না। দেখ এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

অরিষ্টাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন, তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেক, যে মিথ্যা কহিলে কি হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয় যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। এপোলোনী নামে অন্য এক ব্যক্তি জ্ঞানবান্ কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দাস্যকর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদীরা ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডক্লিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল এবং সে সদ্বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দলোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্ত আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডক্লিসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারি পারিপাট্যেতে সে সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ একদিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডক্লিস ঐ ক্ষতিকারি গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র একজন মালির নিকট গিয়া কহিলেক, যে ওহে ভাই মালি একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি

একবার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই। মাণা কহিলেক, আমি পাগল নহি, অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেক না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেগুক্লিসের পিতার-হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল। পরে মেগুক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ্ সমাচার কহিতে লাগিল, কেননা যদি কেহ আসিয়া উপকার করে। কিন্তু মেগুক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেগুক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে সে স্থানে তাহার পিতা নাই, পশ্চাৎ শুনিল যে, কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া শুশ্রূষা করিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেগুক্লিস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন কোন দিন মেগুক্লিসকে পথি মধ্যে পাইয়া নির্ঘাত মারিত।"

৭। বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস।

"নওসেরও খাঁ নামক পূর্ব্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাঁহার বিচার বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক অনেক পারস্য গ্রন্থ মধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস একজন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে অমুক প্রদেশের কৃষি-ব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত, তদপরাধাপসর্গ স্ব স্ব কর্ম্মকারিদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনারদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে অন্য দ্বারা লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ব্যক্তি আপন স্বামার অনুজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল, তাহার পক্ষে একজন মুসলমান শাস্ত্রের আর্ত্তিবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় হয়, সুতরাং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামিকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্য এক বচন আছে, যে কর্ম্মকার, সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়। এই বচন প্রমাণে সিদ্ধান্তকর্ত্তারা এ নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তকচ্ছেদন হয়, তাহার মস্তকচ্ছেদন করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে, তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণবধের আশঙ্কা দেখাইয়া বাধিত করিয়া কাহারো প্রাণহননে প্রবৃত্ত করেন, তবে সে স্বামী প্রাণহননের উপযুক্ত বটে।"

৮। ইতিহাস।

"অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে, হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন; যে বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশ-কালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবেক; সুতরাং অন্য বাদসাহের

শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল, তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষি লোকদিগকে নিকটে আসিতে দেওয়াতে কি শঙ্কা?"

রাজা রামমোহন রায়ের সম্পাদিত "সংবাদ কৌমুদীর" প্রবন্ধ-শ্রেণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়াস পাওয়ার জন্য উপস্থিত ক্ষেত্র, বড়ই উপযোগী। উপস্থিত সময়, তদ্বিষয়িণী আলোচনার পক্ষে অনুকূলও বটে।

(১) তিনি যে বেতন না লইয়া বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রসঙ্গ করেন, নিজেই তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যিনি উপদেষ্টা, অথচ অপ্রবর্ত্তক—তাঁহার বাক্য, লোকের রুচিকর হয় না। ঐ কথা তিনি বুঝিতেন। সেই কারণেই তিনি কেবল কার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন না;—স্বয়ংই তদ্ব্যাপারের প্রবর্ত্তকও হইতেন। তাঁহার এক বেতনহীন বিদ্যা-মন্দির ছিল। ভূদেব বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্রত্য ছাত্র। (২) বিনামূল্যে দীনহীনদের ডাক্তারি চিকিৎসা করাইতে তিনি কি কম যত্নশীল ছিলেন? এই সূত্রে একটা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ বলিতেছি। তিনি কবিরাজী চিকিৎসার বিপক্ষ কি না – ইহারও আলোচনা করা মন্দ নয়। এখানে না হউক, অন্য ক্ষেত্রে আমরা পরিচয় পাইয়াছি, তিনি স্বদেশীয় চিকিৎসারও ভক্ত ছিলেন। ফলে, প্রকৃত বিষয়ের তিনি গুণ-পক্ষপাতিত্ব, চির-জীবনই প্রদর্শন করিতেন। তাই বলিয়া বৈদেশিক উপকারী দ্রব্য মাত্রে তাঁহার বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষও দৃষ্ট হইত না। ডাক্তারী চিকিৎসাও তাঁহার প্রাণের প্রিয় পদার্থ। (৩) বাঙ্গালীদের ভিতর সমাচার পত্রের পাঠক তখন তেমন আশানুরূপ ছিল না। তাই সংবাদ অবগতি নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে তাঁহাকে প্রযত্নপর হইতে হইয়াছিল। (৪) উত্তরাধিকারিত্বের বয়ঃক্রম-পরিবর্ত্তনে তাঁহার আগ্রহ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করিতে কাহারই কোন বাধা ঘটিবে না—মনে দ্বিধা হইবে না—আইনে, দূর-দর্শনে, প্রগাঢ়-জ্ঞানে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। (৫) দান-শৌণ্ডতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ-গুণ। তাই কৌমুদীর নানাস্থানে নানাভাবে তাহার অবতারণা। (৬) দরিদ্রের দুঃখে হৃদয় গলিত বলিয়াই কি শবদাহের সুব্যবস্থায় তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই? (৭) কোন্ কালে রামমোহন, দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ভাবিয়া—প্রমাদ গণিয়া—তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করিতে বদ্ধকটী হইয়াছিলেন! এক্ষণে শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থাংশ পরে সেই অভাব বিদূরিত করিতে গগনভেদিনী বাণী, রাণীর নিকট পত্রযোগে বা তারযোগে প্রেরিত হইতেছে! (৮) বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ যাদৃশ দেবদেবীদ্বেষী, রামমোহনের মন, তেমন অগুণে অনৌদার্য্য-দোষে পঙ্কিল ছিল না। তাহা হইলে তিনি দেবতাপ্রতিমার বিসর্জ্জনের সময় ইয়ুরোপীয়দিগকে বেগে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেন না—আর, তদর্থে সংবাদ-পত্রের সাহায্য, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত না। কয় জন ব্রাহ্ম এই উদাহরণ-অনুগমন করিয়াছেন বা করিবার সাধ রাখেন? (৯) বৈবাহিক কৌলীন্য-নিয়মের উপর খর-দৃষ্টি-পাত। (১০) তখনকার বাঙ্গালা নাট্যশালার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। (১১) ভবিষ্যৎ ইহাদের তিনি অনেক বিষয়েই পথ প্রদর্শন করিতেন। ত ত প্রাচীন সময়ে আগরাস্থিত তাজ-

মহলের কথা সংবাদপত্রে অবতারণা। (১২) স্বদেশের গুণকীর্ত্তনের অবসর, তাঁহার তীক্ষ্ণ দর্শনকে কদাচিৎ অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহস্থল। সেই জন্যেই পাঁচ বৎসরের শিশু, কোথায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিখিয়া লোককে বিস্ময়ান্বিত করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণের চক্ষুর উপর ধরিতেন। (১৩) একটী বিষয় আমাদের বিবেচ্য। হিন্দুর বৈধব্য-দুঃখ তিনি দ্বিতীয় বিবাহে উন্মোচিত করিতে সচেষ্ট না হইয়া তদুদ্দেশে কি কারণে অন্য পন্থার অনুসরণ করেন! (১৪) অগে স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞান না জন্মিলে, বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অবিধেয়, ইহা তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন।

কি কি উপাদান, রামমোহনের সংবাদ পত্রের উপকরণ,—কি কি বস্তুতে তাঁহার সংবাদ কৌমুদীর অঙ্গ আচ্ছাদিত হওয়ায়, উহা অলঙ্কৃত থাকিত, এক্ষণে এখনে তদ্বর্ণনে ব্যাপৃত হওয়ার অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি "কৌমুদীর" সমবায়ী কারণ। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের ইহা মুখপত্র হইয়া উঠে। চিকিৎসা পেথা যাহাতে সমুন্নত হইয়া লোকের মহোপকার-সাধনে ব্রতী থাকিতে পারে, তৎপক্ষেও কৌমুদীতে আন্দোলন ও অনুশীলনের —আলোচনা ও উদ্দীপনার ত্রুটি হইত না। ফলতঃ নানা-হিতকর ব্যাপার, বিধিমতে উহাতে সমর্থিত হইত। তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থও না থাকিত, এমনও নয়। সংবাদ, প্রেরিত পত্র প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের অস্থি-মজ্জা বলিলেই হয়। সেগুলিও যে উহাতে ছিল না, কে বলিবে? প্রথম শ্রেণীর বার্ত্তাবহে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কৌমুদীতে তাহার অভাব থাকিত, এ কথা এ পর্য্যন্ত প্রচারে কাহারই সাহস কুলায় নাই।

রাজা রামমোহন রায়ই, সংবাদ কৌমুদী-প্রচারের মূলীভূত। তিনিই উহার প্রবর্ত্তক—সম্পাদক, তাহা কাহাকেও জ্ঞাত করিতে কস্মিন্ কালেও তাঁহার স্পৃহা বা প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার নামের ও কার্য্যের কেমন এক এক কুহক ছিল, তাহাতে প্রায় সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিত। সংবাদ কৌমুদীর সুসম্পাদনে সামাজিক সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—মন ভুলিল। সুতরাং আর কোন্ মহান্ জন, এই প্রশংসনীয় বিষয়ে লিপ্ত, তাহার অবধারণে লোকের মতি হইল। লেখার ভঙ্গী, বিচারপ্রণালী, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি দেখিয়াই মানুষের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা বস্তুগত্যা প্রকৃত ব্যাপার হইয়া উঠিল।

রামমোহন—কৌমুদীর জন্মদাতা, আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উহার পালক পিতা। রায় রামমোহন ও বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ এই দুই জন কৌমুদীর জন্মাবধি লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এটি একটি মণি-কাঞ্চন-মিলন। কৌমুদীর এই প্রথমকার এই অদৃষ্ট-লিপি, বিধির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বুঝিবা বিরিঞ্চি, বিরলে বসিয়া নৈপুণ্য সহকারে সে লিপির রচনায় মন দিয়াছিলেন। বিধাতা, কিন্তু অধিক দিন কৌমুদীর ভাগ্যে যুগলের যুগ্ম যত্ন ও সান্ত্বনা সম্ভোগ লেখেন নাই। অল্প কাল পরেই কৌমুদীকে এক সাংঘাতিক আঘাত সহিতে হইল। প্রথম জনের অভিলাষ হইল—কৌমুদী, সহমরণ-বিদ্বেষিণী হন। দ্বিতীয়ের চিত্ত-প্রবৃত্তি, তদ্বিপরীত। সুতরাং কার্য্য-গতিকে ঘটনা-চক্রে উভয়ের মনোবাদ ঘটিল। এই বারই কৌমুদীর প্রমাদ-

ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। প্রথম প্রথম সহমরণ-আন্দোলনে ভবানীচরণকে তত বিচলিত করিতে পারে নাই। অথবা তিনি কৌমুদীর মমতায় মোহান্ধ ছিলেন; তাহার জনাই তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। পরে যতই আন্দোলন-তরঙ্গের বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল,তখনই দুয়ের ছাড়াছাড়ি ঘটিল। বিরহ-বিচ্ছেদের সকরুণ সুর উঠিল। মহা-কোলাহল ও ক্রন্দনের কাতর রোল, গগন ভেদ করিয়া অনন্ত শূন্যে মিশিল। ৪ চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই, পালক পিতা,অসময়ে কৌমুদীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কৌমুদীর অনুজাতা চন্দ্রিকার সৃষ্টি করিয়া তাহারই সম্বর্দ্ধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শুনুন পাঠক, যখন চন্দ্রিকা ভূমিষ্ঠ হইল, তখন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ চলিতেছিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

অনন্ত রামায়ণ। (২)

দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ অযোধ্যার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। পৌরগণ নানা প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু—

"শুনিয়া কুজির বড় দুঃখ মিলি গৈল।
রাম রাজা হৈবে কালি কৈকেইত কৈল॥
শুনিয়া আনন্দ বড় কৈকেইর মনে।
সুবর্ণর হার তাইক দিলা তেতিক্ষণে॥ ২৯০॥
হেন দেখি কুজি পেলাইলেক আচারিয়া।
মোর বাক্য নকরব দুই চক্ষু খায়া॥
সতিনির পুত্রক নথান তক্রি ভাল।
চলে পাইলে সেই তোর হৈবে যমকাল॥ ২৯১॥
এহি মতে নানা বাক্য বুলি বিহড়াইল।
তাইর বুদ্ধি লৈয়া ক্রোধ ঘরত সোমাইল॥
শুনিয়োক সভাসদ দেখা কেম বল।
অসন্তর সঙ্গে নষ্ট সজ্জন সকল॥ ২৯২॥
ত্রিবিধ কৈকেই সন্ত ধন্দু তিনি সন্ত।
অধমর সঙ্গে আতি অধম ভৈলন্ত॥
জানি অসন্তর সঙ্গ করা উপসাম।
মূরুখ অনন্তে কহে বোলা রাম রাম॥ ২৯৩॥"

উদ্ধৃতাংশের শেষভাগে সাধারণের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বাল্মীকীয় রামায়ণে নাই। ইহা অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। *

রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দশরথ সুমন্ত্রকে রথ আনিতে আজ্ঞা দিলেন। রথ আনীত হইল।

"তিনিয়ো পিতৃমাতৃ নমিলন্ত।
তেখনে গৈয়া রথে উঠিলন্ত॥
সুমন্ত্র মন্ত্রে ঘোড়া ওকাইলা।
লগতে অযোধ্যাবাসি চলিলা॥ ৩৬৩॥
সিংহদ্বার চড়াই পাইলন্ত পথ।
পাছত চলি যান্ত দশরথ॥
পুত্রশোকে আর্ত্তরাব করন্ত।
সুমন্ত্র রথ রাখ বোলন্ত॥ ৩৬৪॥
তিলেক থাক রামমুখ চাই।
কিয়সিত্রেনেখ রথ ওকাই॥
শ্রীরামে বোলন্ত রথ ওকায়।
পিতৃর পাখ সিত্রে এক্ক আয়॥ ৩৬৫॥
রামর বাক্য শুনি মন্ত্রিবর।
ওাকিলা * রথ আতি খরতর॥
তেতিক্ষণে রাজা প্রজা চয়াইলা।
তমসা নদীর তিরক পাইলা॥ ৩৬৬॥
রথধ্বজ ধ্বনি দেখিলে মানে।
আছিলেক চাই নসহে প্রাণে॥
মূর্চ্ছা গৈয়া তাতে পড়িলা রাজা।
বেড়িয়া কান্দে বাল্য বৃদ্ধ প্রজা॥ ৩৬৭॥

* অধ্যাত্ম রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২য় অধ্যায়, ৮২, ৮৩ শ্লোক।

* ওাকিলা—হাঁকাইল।

বসিষ্ট প্রমুখ্যে কথি বুঝাইল।
রাজাক গৃহে লাগি উলটিছিল॥
সামন্ত প্রজা জত নিরন্তরে।
রামক বেড়ি রৈল নদী তীরে॥ ১৬৮॥
পথধুলি ভৈল কোমল সেহি ঠাই।
লক্ষ্মণক রামে বুলিলা চাই॥
প্রথমে বনবাস ভৈল আজি।
দিয়োক মোক তৃন সজ্যা সাজি॥ ১৬৯॥
তাহাতে কিচো নিদ্রা করোঁ।
ইতো দুখ মোক কিবা পাবরো॥
লক্ষ্মণে দিলা তৃন সজ্যা পারি।
সিতা সমে তাতে সুইলা মুরারি॥ ১৭০॥
সুমন্ত আদি জত প্রজাগণ।
সোকে দুখে পড়ি রৈলা সিপাস॥
প্রজার দুখ দেখি রঘুনাথে।
রাত্রিতে উঠি গৈলা আন পথে॥১৭১॥
প্রভাতে উঠি দেখে প্রজা জত।
অযোধ্যারভিতি গৈলেক রথ॥
আনন্দে প্রজা নগরক গৈলা।
সে দেখি সোকে কান্দিবাক লৈলা॥১৭২॥" *

রাম সীতার অনুরোধে সুবর্ণ মৃগ ধরিবার জন্য তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শরবিদ্ধ মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "হা লক্ষ্মণ! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সীতা এই আর্ত্তনাদ শ্রবণে রামচন্দ্রের বিপদ আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থ যাইতে অনুরোধ করিলেন।

"লক্ষ্মণে সিতাক পাচে বুলিলা নির্ভয়।
ত্রিভুবনে শ্রীরামর ভয় নাহি কয়॥৫১০॥
হেন শুনি ক্রোধে সিতা বুলিলা বচন।
জানিলোহে পাপি তঞি মহা দুষ্টজন॥
আমাক নির্ভয় দিয়া রামক বঞ্চস।
এহি কার্য্যে পাপ তঞি লগত আছস॥৫১১॥
তঞি জাক আসা কর মঞি তেহ নোহোঁ।
রাম বিনে প্রাণ তিয়াগিবো সত্যে কহোঁ॥
এহি বুলি ক্রন্দন কর্ন্ত দীঘ ব র।
তুমি দুষ্ট কারণে দিসা লক্ষ্মণ কু র॥৫ ২॥
জ...ক ধত্তার বাক্য সিতাক বুলিলা।
গ ঠ জাঞ লয়া রাম পাচে চলি গৈলা॥" *

লক্ষ্মণ পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে রাবণ ভিক্ষুক (তপস্বী) বেশে আসিয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী।
কিবা নাম তোমার কহিয়ো সুলক্ষনি॥৫১৩॥
জনক নন্দনি মঞি নাম মোর সিতা।
দশরথ পুত্র শ্রীরামর বিবাহিতা॥
পিতৃ বাক্য পালি রামে বনে আসিলন্ত।
লক্ষ্মণে সহিত মৃগ মারিবে গৈছন্ত॥৫১৪॥
অ সি লক্ষে ফুলে জলে পুজিবা চরণ।
ক্ষনেক বিলম্ব করিয়োক মহাজন॥
উদ্বিগ্ন মনে সিতো বোলে খর করি।
তপসি নহিকো মঞি জানিলা সুন্দরি॥৫১৫॥
জগত রাবন জাক সুনি আছা কণে।
তাহার সদৃষ বড়া নাহি ত্রিভুবনে॥
হেনয় রাবন আসি ভৈলোঁ তবু পাষ।
রামক তেজিয়া বাঞ্ছ কর মোত আষ॥৫১৬॥
জত পাটেশ্বরি মোর সবে তোর দাসি।
স্নেহি থোজা সেহি দিবো থাকিবোঁ উপাসি॥
মানুষ রামক বাঞ্ছ দুরে পরিহর।
মঞি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর॥৫১৭॥
হেন সুনি ক্রোধে সিতা বুলিলন্ত বানি।
দুষ্ট গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘু প্রাণি॥
নিকৌট গোটর তোর এত মান সাধ।
কুকুর ভাকুলি হৈয়া গঙ্গা স্নানে জাষ॥৫২০॥
রাঘবর ভার্য্যাত তোহোর ভৈল মন।
তিখাল খাণ্ডাত জিহ্বা ঘসয় দুর্জ্জন॥
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক চাষ।
সপুত্রা বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ॥৫২১॥
আনো বহুতর বাক্য বুলিলন্ত আই।
সংক্ষেপ পদত লিখ দিবে মুখ্য আই॥

* অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়। ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৫১—৫৮ শ্লোক।

* অধ্যাত্ম রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ৩০—৩৬ শ্লোক।

শ্রীরাম দেবর কথা শুনা সর্ব্বলোক।
রাম রাম বুলি সবে নিস্তার হয়োক ॥৫২২॥

ঘোষা—এহেকত শুনন্ত জানকি সমস্ত
জগত দুর্ল্লভ রাম।
কৌসল্যা তনয় রাম দয়াময়
তুমি দেব পূর্ণকাম ॥

পদ—সীতার নিষ্ঠুর বাণি শুনি ক্রূর
রাবনা ক্রোধে বোলয়।
তোক বলে ধরি নিবো নিজ পুরি
দেখওঁ কোনে রাখয় ॥
এহি বুলি বেগে ধরি সেহি বেগে
কোলে করি তুলি লৈলা।
চতুর্দ্দিশে চাবে শঙ্কিত স্বভাবে
রথ বাহি বেগে গৈলা ॥৫২৪॥
সিতায়ে দেখিলা বুদ্ধি গৈলা
ঘোর মনে হরি হরি।
স্বামি নাহি কত্ত কোনে রাখিবন্ত
মোক দেই দূর করি ॥
দির্ঘ স্বরে আই কান্দন্তে লৈজাই
স্বামিক গেড়ি পারন্ত।
হে রাম রাম প্রভু আহি রাখো
রাবনা মোক হরন্ত ॥৫২৫॥
হে বাপু লক্ষ্মন শিঘ্রে আসিয়োক
রাখিয়োক মোক বাপ। *
তোমার বচন মই চাড়ি সকড়ি
লভিলোঁ ঘোর সন্তাপ।" †

সীতার অন্বেষণে হনুমানের লঙ্কা গমনের পর হইতে এই গ্রন্থে আর অধ্যাত্ম রামায়ণের ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। অবশিষ্ট ভাগ বাল্মীকীর রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের উত্তরভাগে ভগবদ্ভক্ত কবি ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মত্ব বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে বসিয়া ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হন নাই। এই ভাগে অতি স্বল্প পরিমাণেই ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই আমাদের গ্রন্থকার অতঃপর বাল্মীকীর রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণের উত্তরভাগের অধিকাংশ বাল্মীকীর রামায়ণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

অশোক বনে জনক তনয়া হনুমানকে কয়েকটী অমৃত ফল প্রদান করেন। হনুমান ফলের আস্বাদনে পরম প্রীত হইয়া এতাদৃশ ফল কোথায় পাওয়া যায়, জানকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে,—

"সীতায়ে বোলন্ত জিতো পাবে আছে
তাক্রি খাইবি কেন করি।
অসংখ্য রাক্ষসে আবরি থাকয়
মারিবেক তোক ধরি।
হেন শুনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণর বেশ
ধরিলন্ত হনুমন্তে।
লড়বড় মাথ কাসন্ত দেখিয়া
কতুহলে হাসিলন্তে ॥৭২৬॥
বোলন্ত রাক্ষসে হাটি হাটি ফুরি
ফল পাইবি বহুতর।
নাই একো চিন্তা ফুরি আসা গৈয়া
সমস্তে লঙ্কা নগর ॥
সীতাক নমিয়া তেতিক্ষণে গৈয়া
রাবনর অভ্যন্তরে।
ভিক্ষা করি লয় ভাণ্ডারি বোলয়
লৈয়োক বারি ভিতরে ॥৭২৭॥"

হনুমানের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশধারণ ও রাক্ষসগণের নিকট ফল যাচ্ঞা অধ্যাত্ম রামা-

* "বাপ" ও "বাপু" শব্দ স্নেহদ্যোতক। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ শোকে কাতর হইয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করিবার সময়ও এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন।
১১৭৮, ১১৮০ শ্লোক।

† অধ্যাত্ম রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ৫১—৫২ শ্লোক।

রণে অথবা বাল্মীকীয় রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। ইহা মহানাটক (২৯৫ শ্লোক) হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের শরে রাম লক্ষ্মণ ধরাশায়ী হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাবণ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

"হেন শুনি রাবনে ধরিলা হাত মেলি।
সিরত চুম্বন দিয়া ধন্য ধন্য বুলি ॥৮৬১॥
তাহাক বিস্তর চাটু বলিয়া পঠাইল।
আবে কি করিবো বুলি মনে পরি ভাইল ॥
রাম মরি গৈল বুলি হি উবেড় শাহ (?)
আবেবিতা ভাৰ্য্যা কুবো মনে করো আস ॥৮৬২॥
ত্রিজটাক মাতিয়া আনিলা তেতিখন।
সুনহ ত্রিজটা কর মোহোর বচন ॥
জিকারণে সিতা মোক করে অবমান।
তাহাক মারিলে পুত্রে গৈল যম থান ॥ ৮৬৩
হইলুই মৃত্যাকক দেখায়া আপন।
পুষ্পকত তুলি সিতা নিয়ো এতিখন ॥
রাবণর আজ্ঞায়ে সিতাক তুলি লৈল।
রথবাহি তেতিখনে রণভুমি গৈল ॥ ৮৬৪
পুষ্পকর পরা সিতা দেখি দেখিলন্ত।
রাম লক্ষ্মন দুই পড়িয়া আচন্ত ॥
তেজে তোল বোল শরে নাহিক চেতন।
দেখি সিতা মূর্চ্ছা গৈয়া পরিলা তেখন ॥ ৮৬৫ ॥
কতো বেলি চেতন লভিয়া সিতা আই।
হাকমে বিকলে কান্দে গুণক বর্ণাই ॥
সুধা সর্ব্বজনে কৈত পরেই তোকাই।
রাম রাম বুলি তরা জাতনার দায় ॥ ৮৬৬ ॥
ঘোষা। স্বামি রাম কেত পাইবো চরণ তোমার।
বিয়োগে বিকল জিবন রহে আমার ॥
পদ। হাহা রাম রমন মোহোর মিত্র নাহা।
আমার অন্তরে নাথ পরলোকে জাহা ॥
নবদুৰ্ব্বা পুতলি দেহ অতি সুকুমার।
নেত্র তলি বিচার তনু খাই তনুজার ॥ ৮৬৭ ॥
হেন প্রভু কে বধে মাটিত আচা পড়ি।
হরি-হরি নিদ্রারুবি জিঞ্চ কেন করি ॥
স্বামির লগতে মঞি উৎসর্গিলো প্রাণ।
কিমতে জিবন্তে শান্ত চিন্তো এহি পাল ॥ ৮৬৮ ॥
শাছে মাতিলন্ত সিতা ত্রিজটাক চাই।
কোনো কুলক্ষণ মোর একো অঙ্গে নাই ॥
শুনহ ত্রিজটা কেন ভৈলোহো বিধবা।
ত্রিজটা বোলয় মাব নোহয় যধবা ॥ ৮৬৯ ॥
জিজ্ঞাসিলো তোমার স্বামির কার্য্য লখি।
মৃতকর মুখ হেন নুহি শুকতকি ॥
সরবন্ধে পিড়িত হই আচে দুই ভাই।
এতিখনে উঠিবন্ত নকান্দিবা আই ॥ ৮৭০ ॥
হেন নানা বচন সিতাক বুঝাইলেক।
জান পালটায় পুষ্প খানক গৈলেক ॥" *

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মূর্চ্ছিত সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সংজ্ঞা লাভ করিয়া তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা কুম্ভকর্ণের কর্ণ ধারণ পূর্ব্বক, দন্ত দ্বারা তাঁহার নাসিকা দংশন এবং পাদ দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিলেন। অবশেষে রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাম শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

"স কুম্ভকর্ণোঽথ বিবেশ লঙ্কাং
স্ফুরন্তমাদায় মহা হরীন্দ্রম্।
বিমানচর্য্যা গৃহগোপুরস্থৈঃ
পুষ্পাগ্র্যবর্ষৈ রভিপূজ্যমানঃ ॥ ৮২ ॥
* * *
ততঃ স সংজ্ঞা মুপলভ্য কৃচ্ছ্রাৎ
বলীয়সস্তস্য ভুজান্তরস্থঃ।
অবেক্ষমানঃ পুররাজ মার্গং
বিচিন্তয়ামাস মুহুর্মহাত্মা ॥ ৮৩ ॥
* * *
ততঃ করাগ্রৈঃ সহসা সমেত্য
রাজা হরীণামমরেন্দ্র শত্রোঃ।
খরৈশ্চ কর্ণৌ দশনৈশ্চ নাসাং
দদংশ পাদৈ র্বিদদার পার্শ্বৌ ॥ ৮৬ ॥
যুদ্ধকাণ্ড। ৬৭ সর্গ॥"

* বাল্মীকীয় রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৪৬ সর্গ—৪৬, ৪৭ শ্লোক, ৪৭ সর্গ—৫, ৬, ৭, ১২ শ্লোক। ৪৮ সর্গ—১, ৭, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৩ শ্লোক।

আমাদের গ্রন্থকার ইহাতেই তৃপ্ত হন নাই। তিনি বলেন যে, সুগ্রীব 'নখে দাঁতে' কুম্ভকর্ণের 'নাক কাণ' ছেদন করিয়া লইলেন, এবং রামশিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সকলের সম্মুখে সেই ছিন্ন নাসাকর্ণ স্থাপন করিলেন। তদ্দর্শনে তাহাদের হাসি উথলিয়া উঠিল।

* সিবো কোধে সিলা সংহারিলা।
মুচ্ছা গৈয়া সুগ্রিক্ণা পড়িলা॥
দেখি তাক লঙ্কা লৈয়া জাই।
সুগ্রিক্ষে ছেতন পাছ পাই॥ ৯১৬॥
নখে দাস্তে লৈল নাক কান।
ছেবে গৈল আপনার থান॥
সবাকো আগাক নিয়া থৈল।
দেখি হাসি উথলিয়া গৈল॥ ৯ ৭।

লক্ষণকে বর্জ্জন করিয়া রাম নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। এবং লক্ষণের ন্যায় সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিলেন।

কান্তা উঠি পাছে কৌসল্যা নন্দন।
লক্ষ্মণক নাদেখিয়া করয় ক্রন্দন॥
বোলন্ত তেজিয়া গৈলা লক্ষ্মণ ভৈয়াই।
তোহোর সন্তাপে প্রাণ কিসক নজাই॥ ১১৭৭॥
পিতৃমাতৃ সিতার সোকক সম্বরিলো।
তোহোর সন্তাপে বাপু সমুলি মরিলো॥
পিতৃতো মাতৃতো করি তোত অনুরাগ।
বনবাসে গৈলো তন্তো নেড়িলা হাভাগ॥ ১১৭৮॥
প্রাণতো অধিক মোর লখন ভয়াই।
তোক তেজি মোর জিবনত কার্য্য নাই॥
এহি বুলি মকমকি কান্দে রঘু রাই।
বোলন্ত রাজ্যক লৈয় ভরত ভাঁয়াই॥ ১১৭৯॥
আর নথাকোহো বাপ ইতো নরলোক।
দেবগণে স্বর্গক জাইবাক বোলে মোক॥
সুনিলা বিস্তুর কান্দি বুলিলা ভরতে।
কিসক যাতুক বাক্য বোলাহা ইমতে॥১১৮০॥
তযুপাদপদ্ম এড়ি তিলেকো নিজিবো।
সত্যো সত্যো কৈলো লদা তযু সঙ্গে জাইবো॥
রাঘব স্বর্গক জান্ত সবে বার্ত্তা পাইল।
দণ্ডবতে পড়ি প্রজা করুণা জুরাইল॥ ১১৮১॥
তোমাক তেজিয়া আমি নিজিবো ঈশ্বর।
জথা জাহা তথা জাইবো তবু অনুচর॥
পাত্র মন্ত্রি সবে বোলে তযু সোকে মরোঁ।
নিয়োক লগতে প্রভু চরণত ধরো॥ ১১৮২॥
হেন শুনি সবাকো মাতিলা রঘুনাথে।
পশুপক্ষি জত আছে পিম্পরা পর্য্যন্তে॥
অমাক আশ্রয় করি আছে অজোধ্যাত।
মোর লগে জাইবে জেবে সাজোক সাম্প্রত॥১১৮৩॥
রাঘবর হেন বাক্য শুনি প্রজা যত।
জয়রাম বুলি সবে নাছে আনন্দত॥
ধনধান্য আছে মানে ব্রাহ্মণক দেই।
বস্ত্র অলঙ্কার সবে হরিসে পিন্ধই॥১১৮৪॥

উদ্ধৃত অংশে লক্ষণের শোকে রামচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী বিলাপ রামায়ণ হইতে গৃহীত হয় নাই। রামায়ণে রামচন্দ্রের বিলাপ দৃষ্ট হয়না। ইহা আমাদের গ্রন্থকারের স্বকীয় ভাবুকতা-রই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রী করুণানাথ ভট্টাচার্য্য।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর।

ত্রৈপুরী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে, চন্দ্র-কুল-সম্ভূত যে সমুজ্জ্বল চন্দ্র ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসন আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর। যযা-তির পৌত্র মহারাজ ত্রিপুর হইতে সংখ্যা ধরিলে দেখা যায়, বিজয়মাণিক্য ত্রিপুর সিংহা-সনের ১১০ সংখ্যক ভূপতি। দেবমাণিক্য বাহাদুরের দুই পুত্র মধ্যে বিজয় জ্যেষ্ঠ। চন্তাইর * চক্রান্তমূলে মহারাজ দেবমাণিক্য

* চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই উপাধি

বাহাদুর নিহত হওয়ার পরে, তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র শিশু ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনারূঢ় হইলেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল চারি মাসের অধিক স্থায়ী হইয়াছিল না। ইন্দ্রমাণিক্যের মাতা ও চন্তাইর ষড়যন্ত্রমূলে মহারাজ দেবমাণিক্য বাহাদুর নিহত হইয়াছেন, এই কথা যখন সৈন্যগণের মধ্যে প্রচারিত হইল, তখন তাহারা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে, চন্তাইকে এবং এবং মাতাসহ ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া, ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিল।

ইন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের এবম্বিধ পরলোকগমনের পর ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৩৫ খ্রীঃ) ত্রিপুর-রাজকুল-ধুরন্ধর মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সার্দ্ধত্রিশত বর্ষকাল পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ্যের অবস্থা কত উন্নত ছিল, মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকাল আলোচনা করিলে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইনি বলবীর্য্যশালী, রাজনীতিকুশল আদর্শ ভূপতি ছিলেন। আমরা তাঁহার অপরিসীম বলবিক্রম এবং রাজনৈতিক গাম্ভীর্য্যের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া, অনেক সময় বিস্মিত ও মোহিত হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মবলও যথেষ্ট ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, রাজন্যবর্গের যে সকল গুণ ভূষণ মধ্যে পরিগণিত, ভগবানের কৃপায় মহারাজ বিজয় তাহার একটীতেও বঞ্চিত ছিলেন না।

বিজয়মাণিক্য দৈত্যনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই দৈত্যনারায়ণের বিশেষ পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইনি শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া, উত্তরোত্তর ত্রিপুররাজ্যে এত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, প্রজাসাধারণে তাঁহাকেই রাজার ন্যায় সম্মান ও আদর করিতে লাগিল; দেবভোগ-বিলাসী মহান্তের বিগ্রহের ন্যায়, মহারাজ একটা উপলক্ষ মাত্র রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বিজয়মাণিক্য বুঝিলেন, শ্বশুরকে নিহত করিতে না পারিলে তাঁহার রাজ্যশাসনের পথ কিছুতেই পরিষ্কার হইবার নহে। অতঃপর তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল; রাত্রিযোগে কৌশল ক্রমে অপরিমিত মদ্যপান করাইয়া, নেশাভিভূত দৈত্যনারায়ণকে স্বহস্তে নিধন পূর্ব্বক রাজা আপন রাজ্যশাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইলেন। পিতার ঈদৃশ নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রাজমহিষী নিরতিশয় ব্যথিতা ও কোপিতা হইলেন। এতদুপলক্ষে তিনি নানাবিধ কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় ভর্ত্তার মর্ম্মপীড়া জন্মাইয়াছিলেন বলিয়া, মহারাজ রাজ্ঞীকে নির্ব্বাসিত করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিলেন।

বিজয়মাণিক্য বাহাদুরের বীরত্বকাহিনী অতুলনীয়। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুলফজল তৎপ্রণীত "আইন আকবরী" গ্রন্থে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন * তাহা আলো-

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই চন্তাই মহারাজ ধ্বজমাণিক্য বাহাদুরের পত্নীর (ইন্দ্রমাণিক্যের মাতা) সহিত একমত হইয়া মহারাজ দেবমাণিক্যকে গোপনে বধ করতঃ ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।

* রাজমালার সংগ্রাহক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ "আইন আকবরী" গ্রন্থে লিখিত কথার অনুবাদ এইরূপে লিখিয়াছেন:—

"ভাটি প্রদেশের সহিত সংলগ্ন একটী স্বাধীন রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা)। আর, তাহার অধিপতির নাম বিজয়মাণিক্য। * * * এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক লক্ষ হস্তী আছে; কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।" রাজমালা,—২য় অং, ৬০ পৃঃ।

চনা করিলেই বিজয়মাণিক্যের বলবীর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাঁহার শাসনকালে ত্রিপুররাজ্যের সৈন্যবল ও আয়তন যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইতিহাস আলোচনায় আর কোন সময়েই তদ্রূপ হওয়া জানা যায় নাই।

মহারাজ বিজয় প্রথমতঃ চট্টগ্রাম প্রদেশ অধিকার করেন। এই সময়ে কেবল যে যবন ও মগদিগের সহিত তাঁহার সজ্ঘর্ষণ হইয়াছিল, এমন নহে; যুদ্ধযাত্রা কালে তাঁহার এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজার জীবনবিনাশ ও রাজধানী অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। বীরবর স্বয়ং সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগকে দমন করিলেন। বিদ্রোহীগণের মধ্যে কতকগুলি লোক ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতার * নিকট বলি প্রদানের ব্যবস্থা হইল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে, উড়িষ্যা-বিজেতা সুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম জয়ের অভিপ্রায়ে, সেনাপতি মহম্মদ খাঁয়ের তত্ত্বাবধানে তিন হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুরসৈন্যের সহিত ইহাদের ক্রমান্বয়ে আট মাস কাল সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি হত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উত্তর কালে বিজয়লক্ষ্মী ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইলেন। মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ার পর, যবন সেনাপতি মহম্মদ খাঁ ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে রুদ্ধ হইয়া, ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া নগরে * নীত হইলেন। মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহার মুণ্ড চতুর্দ্দশ দেবতা সমীপে উপঢৌকন প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, মহারাজের রাজ্য-বিস্তারের পিপাসা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল,—তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ছাব্বিশ হাজার পদাতি, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় মহাবীর বিজয় বিপুল বিক্রমে মুসলমানদিগকে জয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবং লক্ষ্যা ও গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তি গ্রাম সমূহ লুঠপাট করাইয়া বিস্তর অর্থ ও কতিপয় যুবতী রমণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রাম প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এবং জয়ন্তিয়াপতিকে আক্রমণ করিয়া মহারাজ বিজয়মাণিক্য অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আবুল ফজল ও রলফ ফিচের মন্তব্য আলোচনায় স্পষ্টই জানিতে পাওয়া যায়, তৎকালে সমগ্র ত্রিপুরা ও নোয়াখালী, চট্টগ্রামের উত্তরাংশ এবং শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ মহারাজ

---

* "চতুর্দ্দশ দেবতা" ত্রিপুর রাজবংশের আদিকুল দেবতা। ত্রিপুর সিংহাসনের ২য় স্থানাধিকারী ভূপতি মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক এই সকল দেবতা সংস্থাপিত হয়। চতুর্দ্দশ দেবতা এইঃ—

"হরোমা হরিমা বাণী কুমার গণপা বিধিঃ।
ক্ষাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥"

শিব, উমা, বিষ্ণু, সরস্বতী, কার্ত্তিকের, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়।

* মহারাজ উদয়মাণিক্য বাহাদুরের সময় রাজধানীর "রাঙ্গামাটিয়া" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, "উদয়পুর" নামকরণ করিয়াছিলেন। তদবধি সেই স্থান উদয়পুর নামেই পরিচিত। আমরা উদয়পুরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সময়ান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বিজয় মাণিক্যের শাসনাধীন ছিল। তদ্ভিন্ন চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ লইয়া মগদিগের সহিত ত্রিপুরাধীপের বিবাদ বিশম্বাদ চলিতেছিল। রাজকুলতিলক বিজয়মাণিক্য বাহাদুরের বাহুবলে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের প্রাচীন বাক্যই তাহার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের পর, মহারাজ বিজয় ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিয়া, জনৈক ব্রাহ্মণকে পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তদনুসারে একটী গ্রামের নাম "পাঁচদোনা" হইয়াছে। এই গ্রাম এখন ঢাকা জেলায়. মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট বটে।

বিজয়মাণিক্য বাহাদুর, ত্রিপুর রাজ্য হইতে প্রবাহিতা একটী নদীর বাঁক কাটাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই নদীর নাম "বিজয়নদী" হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মহাত্মা বিজয় চিরস্মরণীয় হওয়ার উপযুক্ত অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি দান করিবার নিমিত্ত একদিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন! তুলা পুরুষ, দেবতাস্থাপন, ভূমিদান, মঠ নিৰ্ম্মাণ, জলাশয় খনন ইত্যাদি অনেক ধৰ্ম্ম-কার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজনৈতিক কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববৰ্ম্মণ মহোদয় রাজ্যের উত্তর অঞ্চল পরিভ্রমণে যাইয়া, মহারাজের যে লুপ্ত কীৰ্ত্তির উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। অধুনা এই অপূর্ব্ব কীৰ্ত্তির কথা ত্রিপুর রাজ্যের অতি অল্প লোকেই অবগত ছিলেন। রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাস বাবুও এ বিষয়ের কোন রূপ সন্ধান পাইয়াছিলেন না। আমরা সেই অতুলনীয় কীৰ্ত্তি-কাহিনী নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

সিংহপরাক্রম বিজয় মাণিক্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া, জয়ন্তিয়া প্রদেশাধিপতি, ত্রিপুর রাজ্যের পার্ব্বত্য কিরাত প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন। এই কথা মহারাজ বিজয়ের ন্যায় সুচতুর ভূপতির অগোচর থাকিবার বিষয় নহে; তিনি অতি অল্প সময় মধ্যেই জয়ন্তিয়াপতির গুপ্ত ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

জয়ন্তিয়া রাজ্যের সামান্তবর্ত্তী 'সাথাচেপ্' ও 'থাঙ্গাচেপ্' দাফার 'হালাম' সম্প্রদায়ের কুকিগণ সেই সময় নিতান্ত উদ্ধত ও দুর্দ্দম্য ছিল। ইহাদের বাহুবলে, ত্রিপুরার ভূপতিগণের সুখ-সমৃদ্ধি ও রাজসম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুগত ও রাজভক্ত প্রজা হইলেও রাজনীতি কুশল মহারাজ বিজয় এই সময় তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জয়ন্তিয়াপতির কুহকে ভুলিয়া কোন রূপ বিপরীত আচরণ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কুশলবুদ্ধি বিজয় মাণিক্যের এই কার্য্য উদ্ধার করিতে বেশী বিলম্ব হইল না; কৌশলজাল বিস্তার ক্রমে অল্পকাল মধ্যেই কুকিদিগকে বাধ্য করিয়া, চির বশ্যতা বিগর্হিত কোনরূপ কার্য্যে লিপ্ত না-হওয়ার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদিগকে ধাতু

নির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে, বাঙ্গালা অক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যাবলী খোদিত আছে :—

"পূর্ব্বাপোযা ক্রমাদুবন্ত আত্মিয়া,
ইদানীং যদি বৈপরীত্যমাচরন্তি,
তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্যনাশো ভবিষ্যতি, *
পশ্চাদ্দ্যাত্র শার্দ্দূলৌ ॥" †

পার্ব্বত্য প্রজাগণ, সাধারণতঃ সরল ও ধর্ম্মপ্রিয়। তাহাদের আপন আপন কৃত শস্যই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন। এবং সর্ব্বদা অরণ্যে বাস্তব্য করিতে হয় বলিয়া, বনচর হস্তী ও ব্যাঘকে তাহারা প্রবল শত্রু বলিয়া ভয় করে। কুকিগণ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠে, ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট এবং গজ-শার্দ্দুল কর্ত্তৃক অপচয় হওয়ার ভীতিসঙ্কুল অনুজ্ঞা থাকায় তাহারা বংশ-পরম্পরায় অতি সতর্কতার সহিত অদ্যাপি আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছে; এবং উক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতাজ্ঞানে, ভক্তিভরে পূজা করিতেছে। ধন্য মহারাজ বিজয়ের রাজনৈতিক গাম্ভীর্য্য! তিনি এই রূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে, অন্য কোন উপায়ে অরণ্যবাসী হিংস্র স্বভাবাপন্ন অসভ্য কুকী জাতির অন্তরে এবম্বিধ রাজভক্তির বীজ রোপণ ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। তাঁহার এই সুগভীর রাজনীতির নিকট আধুনিক কুটিল নীতি কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে সক্ষম হইবে না।

স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের অনুজ্ঞানুসারে অল্পদিন হইল, এই সকল প্রতিমূর্ত্তি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আনীত হইয়াছিল। সেই সময় আমরা তাহা অবলোকন করিয়াছি। সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষকাল পূর্ব্বের হিন্দু নরপতি রাজনৈতিক গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় দেখিয়া, ভক্তিভরে প্রণিপাত করিলাম। ইচ্ছা হইল, একবার ধরিয়া দেখি; কিন্তু দেবতা স্পর্শ করিলে পাছে কুকিগণ রুষ্ট হয়, এই ভয়ে প্রথমতঃ ধরিতে সাহস হইল না। পরে, ওঝাইর (কুকির পুরোহিত) অনুমতি লইয়া, জুতা ছাড়িয়া, প্রতিমূর্ত্তি দুইটী ধরিয়া দেখিলাম এবং গাত্রলিপি পাঠ করিলাম। লিপির কোন কোন অংশ অস্পষ্ট হওয়ায়, মেগ্‌নিফাইং গ্লাশের সাহায্যে পড়িতে হইয়াছিল। সেকালে কারুকার্য্যে আমাদের দেশ কোন দেশ অপেক্ষাই পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল না, সুতরাং প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন-নৈপুণ্য বিষয়ে বেশী কথা বলা তত প্রয়োজনীয় নহে; তবে, মোটের উপর এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, মূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন সুন্দর ও সুডৌল দেখিয়াছিলাম।

মহারাজ বিজয় ৪৮ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দে, রাজ্য, রাজপরিবার ও প্রজাবর্গকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া, বসন্তরোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার কতিপয় সংখ্যক রাণী তৎসহগামিনী হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয় কত বৎসর বয়ঃক্রমে

* পাঠের প্রথমাবধি "শস্য নাশো ভবি" শব্দ পর্য্যন্ত হস্তি-পৃষ্ঠে এবং অবশিষ্টাংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে।

† পূর্ব্বাপর তোমাদের সহিত আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে। এখন যদি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে, তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট হইবে এবং পশ্চাৎ হস্তী ও ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে।

সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন এবং কত বয়সেই বা স্বর্গারোহণ করিলেন, আমরা তাহার কোনরূপ নিরাকরণ করিতে পারি নাই। মহাত্মার বাল্য-জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হেতু আমরা দুঃখিত আছি। বর্ত্তমান সময়ে তৎপক্ষে কৃতকার্য্য হওয়াও এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং নিতান্ত অতৃপ্ত হৃদয়ে, অসম্পূর্ণ ভাবেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায়, মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা অনন্তকাল অক্ষয়শান্তি উপভোগ করুক, এবং ত্রিপুর সিংহাসনে ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা!

এই প্রবন্ধ লিখন বিষয়ে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালার দ্বারা আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

ধনঞ্জয় ও মেধাতিথি।

ধনঞ্জয়।

মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে ধনঞ্জয় "দশরূপ" নামে বিখ্যাত অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম বিষ্ণু ও ভ্রাতার নাম ধনিক। চারি অধ্যায়ে "দশরূপ" বিভক্ত। ধনিক জ্যেষ্ঠভ্রাতার রচিত "দশরূপের" 'দশরূপাবলোক' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। সুপণ্ডিত উইলসন এবং আনন্দোরাম বড়ুয়া মহোদয় সুন্দর মিশ্রের মত অনুসারে ধনঞ্জয় ও ধনিককে অভিন্ন নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "দশরূপের" শেষ শ্লোক দৃষ্টে, ধনঞ্জয় ও ধনিককে মুঞ্জরাজের সভাসদ বলিয়া অনুমিত হয়।

বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন,
বিদ্বন্মনোরাগনিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশগোষ্ঠী,—
—বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ॥ (৪।৮০)

ধনঞ্জয়ের আশ্রয়দাতা মুঞ্জরাজ ধারা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রমরবংশে আবির্ভূত হন। এই মুঞ্জের ভ্রাতষ্পুত্র ভোজরাজ দেব অতি প্রসিদ্ধ নরপতি ও গ্রন্থকার। ডাক্তার হল সাহেবের মতে মুঞ্জরাজ ৯৭৪-৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করেন। ধনিকের মতে এই মুঞ্জরাজের নামান্তর বাক্পতিরাজ দেব। বাক্পতিরাজ দেবের রচিত এক কবিতা * ধনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে বাক্পতিরাজের কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ধনিক এক স্থলে এই বাকপতিরাজ দেবকে 'উৎপল রাজ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় ও ধনিক উভয়েই মহারাজ মুঞ্জের সভাসদ ও মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ধনিক পণ্ডিতের পুত্র বসন্ত আচার্য্য অহিচ্ছত্র (বর্ত্তমান রামনগর) হইতে ধারানগরে উপনিবিষ্ট হন। ৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বসন্ত আচার্য্য কিঞ্চিৎ ভূমি দান প্রাপ্ত হন। (J. as. B. $\frac{198}{1861}$) এই দুই ধনিক এক ব্যক্তি হইলে, ধনিকের সময় ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

* প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং সসম্ভ্রমবিস্মিতঃ।
ত্রিভুবনগুরু র্ভীত্যা সদ্যো প্রণামপরোঽভবৎ।
নমিতশিরসো গঙ্গালোকে তয়া চরণাহতা,
ববতু ভবত স্ত্র্যক্ষস্যৈতদ্ বিলক্ষমবস্থিতং॥

ধনঞ্জয় ও ধনিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধারা নগরে আবির্ভূত হন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই ধারারাজ মুঞ্জের সভাসদ ছিলেন। মুঞ্জরাজের নামান্তর বাক্‌পতিরাজদেব বা উৎপল রাজদেব। 'দশরূপাবলোকের' আরম্ভে ধনিক লিখিয়াছেন —

"প্রণিপত্য শিবং সাম্বমার্গাং ভরত' তথা।
কিয়ত দশরূপস্য ব্যাখ্যানং ধনিকেন চ" ॥

ধনিক স্বরচিত পঞ্চবিংশতিটী কবিতা 'দশরূপাবলোকের' বিভিন্ন স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪টী কবিতা প্রাকৃত ভাষায়, এবং ২১টী সংস্কৃতে রচিত। 'শারঙ্গধর পদ্ধতি'তে তন্মধ্যে দুইটী এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণে' দুইটী উদ্ধৃত দেখা যায়। 'দশরূপাবলোক' ভিন্ন ধনিক 'কাব্যনির্ণয়' নামে পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যের লক্ষণাদি তাহাতে নির্ণীত হইয়াছে। এই 'কাব্যনির্ণয়ের' ৭টী কবিতা 'দশরূপাবলোকে' উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধনিক ভিন্ন পাণি ও ক্ষৌণীধর মিশ্র "দশরূপের" টীকা প্রণয়ন করেন। রঙ্গনাথ দীক্ষিত ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বরচিত 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের টীকায় 'পাণি-বিরচিত দশরূপটীকার' উল্লেখ করিয়াছেন। রঙ্গনাথ 'নাট্যদর্পণ,' 'নাট্যলোচন' ও 'রূপচিন্তামণি' নামে তিন খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজশেখরের কৃত 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকা'র টীকায় নারায়ণ দীক্ষিত 'নাট্যশেখর', 'হনুমন্নাটকের' টীকায় মোহনদাস মিশ্র 'নাটকাবতার' এবং অমরকোষের টীকায় ভানুজী-দীক্ষিত 'নাটক রত্নকোষ' নামে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কীয় কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, মল্লিনাথ প্রাদুর্ভূত হইয়া 'রঘুবংশাদি কাব্যের টীকা প্রণয়ন করেন। মল্লিনাথ স্বরচিত টীকায় "দশরূপ" ও "কাব্য প্রকাশের" উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথ 'নৃত্যবিলাস' ও 'নৃত্যসর্ব্বস্ব' নামে দুই খানি নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক যে সকল পুস্তকের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, "দশরূপ" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। 'বৃহৎকথা' এবং রাজশেখরের কৃত কর্পূর মঞ্জরী, ও বিদ্ধশালভঞ্জরূপ নাটক ধনঞ্জয়ের পূর্ব্বে রচিত হয়। স্বপ্রণীত 'অভিধান-চিন্তামণির' টীকায় হেমচন্দ্র সূরি দশরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। দশরূপ ও তাহার টীকা 'দশরূপাবলোক' অবলম্বনে সুন্দর মিশ্র ১৫৩৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে) "নাট্যপ্রদীপ" রচনা করেন। সুন্দর মিশ্রের লিখিত 'অভিরামমণি নাটকের' বিষয় ডাক্তর হল উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দর মিশ্র ভ্রমক্রমে ধনঞ্জয় ও ধনিককে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব ও আনন্দীরাম বড়ুয়া মহাশয় এই ভ্রান্ত মত নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন। দশরূপ ও দশরূপাবলোকে যে সকল নাটকাদি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উল্লেখ আবশ্যক। ইহা হইতে ঐ সকল গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তিতা সূচিত হইতেছে। ধনিক রত্নাবলী নাটিকা, বেণীসংহার, মালতীমাধব, বীরচরিত, উত্তরচরিত, ছলিত রাম, মালবিকাগ্নিমিত্র, মুদ্রারাক্ষস, রঘুবংশ, ভর্তৃহরিশতক, মৃচ্ছকটিক, নাগানন্দ, অমরুশতক, প্রসন্নরাঘব, কুমারসম্ভব, মাঘ, অভিজ্ঞান শকুন্তল, কাদম্বরী, পদ্মগুপ্ত, রামায়ণ, উদয়নচরিত, প্রিয়দর্শনা, উদাত্তরাঘব, বিক্রমোর্ব্বশী, পাণ্ডবানন্দ, কর্পূরমঞ্জরী, ত্রিপুরদাহ, কিরাতার্জ্জুনীয়, বিকটনিতম্বা, বৃহৎকথা, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, বাক্‌পতিরাজদেব, রুদ্র, মেঘদূত হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন

রত্নাবলী ও বেণীসংহার হইতে অন্যান্য নাটক ও কাব্য অপেক্ষা অধিক কবিতা উদাহরণ স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

দশরূপাবলোকে' পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দৃষ্টে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই সকল পুস্তক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয়। রুদ্র ও বাক্‌পতিরাজদেব ধনঞ্জয় এবং ধনিকের সমসাময়িক কবি। 'ভোজরাজদেব'নামক প্রবন্ধে আমরা বাক্‌পতিরাজদেবের সময় সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি *। সেই সম্পর্কে এখানে কোন কথার পুনবার উল্লেখ অনাবশ্যক।

মেধাতিথি ভট্ট।

মেধাতিথি ভট্টের পিতার নাম ভট্টবীরস্বামী। তিনি মনুসংহিতার সুবিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রে আপনার আধিপত্য বিশেষরূপে সংস্থাপন করেন। 'মনুভাষ্য' রচনার পূর্ব্বে তিনি "স্মৃতিবিবেক' একখানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'মনুসংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার। তিনি ধারেশ্বর ভোজরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী। রাজা ভোজদেব স্বরচিত মনুভাষ্যে মেধাতিথির উল্লেখ করিয়াছেন। ১০১৫—৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজদেব ধারার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালার" প্রথম ভাগে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। ভোজরাজের পর,গোবিন্দরাজ,কুল্লুকভট্ট,নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ, রাঘবানন্দ, নন্দনাচার্য্য ও ধরণীধর মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। মেধাতিথি এই সমুদয় টীকাকারের অপেক্ষা প্রাচীন। স্বরচিত মনুভাষ্যে তিনি কুমারিল ভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হন। ৭৮৮—৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালার' প্রথমভাগে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, মেধাতিথি খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরায়', হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিতে এবং স্মৃতিচণ্ডিকায় মেধাতিথির "মনুভাষ্য" উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারই দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর "মিতাক্ষরা" রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হেমাদ্রি "চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি"এবং দেবন্ন দেবানন্দ ভট্ট) "স্মৃতিচন্দ্রিকা" প্রণয়ন করেন।

মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া পরাশর স্মৃতির ভাষ্য রচনা করেন। ইহার আরম্ভে তিনি মেধাতিথিকে রাজা শৈব্যের প্রধান অমাত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই শৈব্য কোন্ সময়ে ও কোন্‌দেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ মহারাজ শৈব্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তৈলঙ্গ বা দ্রাবিড় দেশে রাজত্ব করেন।

দক্ষিণাপথের যাবতীয় প্রাচীন স্মৃতিলেখক ও ভাষ্যকার মেধাতিথির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, মেধাতিথি দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন। দক্ষিণাপথ হইতে স্মৃতির ভাষ্যকারদিগের অভ্যুদয় হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে মেধাতিথি দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন। তিনি দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্রাবিড়ী স্মার্ত্তগণের অগ্রণী। দ্রাবিড়ে মেধাতিথির মনুভাষ্য প্রামা-

* 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা," প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য।

নিক গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত রহিয়াছে। মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, দেবন্নভট্ট, বরদারাজ, মাধবাচার্য্য ও প্রতাপরুদ্র দেবের মত দ্রাবিড়ে ও দক্ষিণ ভারতে প্রামাণিক বলিয়া অদ্যাপি আদৃত রহিয়াছে। মেধাতিথির রচিত গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের অনুল্লেখ দৃষ্টে, তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক স্মার্ত্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

দক্ষিণাপথ হইতে মেধাতিথির মনুভাষ্য উত্তর ভারতে আনীত হয়। রাজা মদন পালের আদেশে তাঁহার সভাপণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট উত্তর ভারতে প্রচলিত করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর ভট্ট কাষ্ঠার রাজা মদনপালের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই কাষ্ঠা নগরী যমুনার তীরবর্ত্তী দীঘের সন্নিহিত। বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ডাক্তার জলির মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর ভট্ট বিদ্যমান ছিলেন।

"মান্যা কাপি মনুস্মৃতি স্তদুচিত ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ
সালুপ্তৈব বিধিবশাৎ, কচিদপি প্রাপ্যং ন যৎ পুস্তকং।
ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহরণসুতো দেশান্তরাদাহৃতৈ
জীর্ণোদ্ধারমচীকরৎ তত ইত স্তৎপুস্তকৈ র্লেখিতৈঃ।"
(মনুভাষ্য)।

স্বরচিত মনুভাষ্যে মেধাতিথি তাঁহার পূর্ব্বতন তিন চারি জন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম গ্রহণ করেন নাই। সেই সকল ভাষ্যকারের গ্রন্থ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। অসহায় এই সকল ভাষ্যকারের অন্যতম। অসহায় মনুস্মৃতি ও নারদস্মৃতির দুইখানি ভাষ্য রচনা করেন। ডাক্তর জলির মতে নারদস্মৃতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়। ভাষ্যকার অসহায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরায়, চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের 'বিবাদরত্নাকরে', এবং প্রতাপরুদ্রদেবের 'সরস্বতীবিলাসে' অসহায়ের রচিত ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ডাক্তার বুলার সাহেব অসহায়ের কৃত খণ্ডিত নারদস্মৃতিভাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রাচীন ভাষ্য কল্যাণভট্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়।

"দুষ্টং সহায়বিরচিতং নারদভাষ্যং কুলেখকৈ র্ভ্রষ্টম্।
কল্যাণভট্টেন কিয়ৎ প্রাক্তন ভূদবিশোধ্য পুনঃ॥

স্বরচিত ভাষ্যে মেধাতিথি 'স্মৃতিবিবেকের উল্লেখ করিয়াছেন। মনুভাষ্য রচিত হওয়ার পূর্ব্বে 'স্মৃতিবিবেক' তাঁহার দ্বারা রচিত না হইলে, মেধাতিথি পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করিতেন না। তিনি মনুভাষ্যে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে', জৈমিনীর 'মীমাংসাসূত্র, ও কুমারিলভট্টের ন্যায়মালাবিস্তর' নানাস্থানে উদ্ধৃত ও উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে গৌতম, আপস্তম্ব, বিষ্ণু, যম ও নারদের উল্লেখ করিয়াছেন। মীমাংসাশাস্ত্রীয় বহুতর শব্দ ও মত মেধাতিথির ভাষ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মেধাতিথির ভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ ও স্থানে স্থানে অতি অস্পষ্ট এই উভয় দোষে দূষিত হইলেও মেধাতিথির ভাষ্য প্রাচীনকালের সামাজিক চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন স্মার্ত্তবাদিগের মত সংগৃহীত করিয়াছে। ইহার প্রাচীনত্ব ও বিস্তীর্ণতা ইহাকে অমূল্য গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।

'নবদ্বীপ-মহিমায়' মেধাতিথির জন্মভূমি মিথিলা ও বিশ্বকোষে বঙ্গদেশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিশ্বকোষের মতে ভরদ্বাজ গোত্রজ ব্রাহ্মণকুলে মেধাতিথির জন্ম হয়। মনুভাষ্যের প্রণেতা মেধাতিথি শ্রীহর্ষের পিতা এবং বল্লালী কুলীন উৎসাহ ও গরুড় মুখোপাধ্যায়ের ঊর্দ্ধতন চতুর্দশতম পুরুষ; এই উভয় মতই অতি অমূলক ও অসার বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণবদর্শন। (৭)

৭৩। এতদ্দেশে তজ্জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের (প্রকৃতি পুরুষের) যে যুগল মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া সর্ব্বত্রে আরাধিত হইতে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহাদের উভয়েরই নর্ত্তনশীল মূর্ত্তি। শ্রীরাধা সদৃশ পরিণামিনী মহাভাবময়ী পরমা প্রকৃতির প্রতিকৃতি বলিয়া অনুক্ষণ সদৃশ পরিণাম নিষ্ঠা-অনুক্ষণ বিসদৃশ মলিন বিকৃতির অতীতা থাকিয়াও অনুক্ষণ অপরূপ নৃত্য-সংলিপ্তা। শ্রীরাধার মহাভাবময়ী প্রকৃতির সেই অপরূপ নির্ম্মল নর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণকেও—পুরুষকেও অনুরূপ নর্ত্তনে সংলিপ্তবৎ প্রতীয়মান করিতেছে। সেই জন্য উভয়েরই নর্ত্তনশীল প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয়ে স্বরূপতঃ একাত্মক; এক দেহ, ও একাঙ্গ বলিয়া এরূপ প্রদর্শন ঠিকই হইয়াছে। কাঞ্চন সংসর্গে কাচের, মরকত দ্যুতি পরিধান, অথবা কৌমুদী প্রাবৃত জলাশয়ের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ এইরূপেই ঘটিয়া থাকে। কাচেরও মরকত দ্যুতি নাই, জলাশয়েরও জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নাই, পুরুষেরও কোন নৃত্য বিকৃতি নাই। আত্মা নিত্য সবিষয় বলিয়া—নিত্য তদেকাত্মভাবে প্রকৃতিযুক্ত বলিয়া তদীয় প্রতিবিম্ব এই জগৎ ও তদীয় প্রত্যেক পদার্থ সাকার রূপে প্রতিকৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

৭৪। বিষয়ীর আত্ম-প্রকোষ্ঠে এই স্বরাট্ আত্ম-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি আর অধিক কিছুই নহে; ইহা সৃষ্টির অতীত,—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত বেদান্তের সচ্চিদানন্দ বস্তুকে, কপিলের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বস্তুকে প্রপঞ্চ দেহমধ্যে ব্যবহারিক জ্ঞানে লাভ মাত্র। ইহা সেই সমাধি-সমাহিত "অখণ্ড মণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্" তাহাকে অপূর্ণ ভাবে স্বকীয় ব্যষ্টিকোষের মধ্যে—দেহ খণ্ডের মধ্যে মূর্ত্তীভূত রূপে ব্যবহারিক ভাবে লাভ মাত্র। স্বকীয় স্বরূপগত সমাধির সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া, সমাধীভূত অপরূপ পরানন্দ রাগে সর্ব্বাঙ্গ অনুরঞ্জিত করিয়া নিজেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা মাত্র। কিন্তু এই আত্মবিম্ব কোন ক্রমেই, কোন স্থলেই স্বরাট্ দেহব্যাপী খণ্ড বস্তু নহে। ইহা বিষয়ীর স্বকীয়া অখণ্ডা প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, সমষ্টি-ব্যাপী পরিপূর্ণ অখণ্ড অদ্বিতীয় নিত্য বস্তু। এই জন্য এই ব্যবহারিক বিম্বভূত আত্ম-জ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত অপূর্ণ, পরিচ্ছিন্ন ও আংশিক মাত্র। এখনও ইহা পূর্ণাঙ্গ, অখণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গযুক্ত হয় নাই।

৭৫। বোধ হয় সাংখ্য-সূত্র গ্রথিত করিবার সময় ভগবান্ কপিলদেব এইরূপ কোন স্থানে আসিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট স্থল আছে। স্বকীয় দেহ-তত্ত্বের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব-সমুদ্র-পারে তাঁহার চতুর্ব্বিংশতিতমা অখণ্ডা মূলা প্রকৃতির পর পারে, স্বকীয় দেহ খণ্ডের মধ্যে, ব্যষ্টি-দেহাতীত শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষকে—আত্মাকে স্বরাট্‌ভাবে অনুভব করিয়া, তিনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং দুর্ভাগ্য জীবের প্রতি সমধিক কৃপাপরবশ হইয়া, তাহার ঘোর অজ্ঞানতমঃ ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ-ত্রয় শীঘ্র নাশ করিবার জন্য, তাঁহার ধ্যানাবিষ্কৃত এই অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সাংখ্যতত্ত্ব সুন্দর সূত্রাকারে প্রচার করিলেন। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই তাঁহার পরম উপাদেয় সূত্র-মধ্যে

গ চিহ্নিতা তালিকা—৬৬ সংখ্যাত অংশানুসারে আত্মার বিষয়াংশের ব্যবহারিক বিস্তার।

অপ্রকট প্রকৃতির বা বিষয়াংশের ত্রিবিধ অব্যক্তরূপ।	অপ্রকট মৌলিক অবস্থা	সম্বন্ধ — সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বা বিম্ব	অবিধেয় — বিম্ব বা মূর্ত্তীভূত দেহ	প্রয়োজন — দেহভূত চৈতন্য	প্রয়োজন — চৈতন্যভূত সম্বন্ধ	যাবতীয় সম্বন্ধভুক্ত মুখ্য প্রয়োজন।
স্বরূপ বা পরমা প্রকৃতি বা পরমার্থ সত্তা।	সমাধি।	ব্যষ্টিপরমাত্ম তত্ত্ব সম্পন্নসাধু সমষ্টি সেই সাধুসমষ্টীভূত নিরঞ্জন প্রকট পুরুষ।	নিত্য নিরঞ্জন পরানন্দঘন ভাব দেহ (নন্দনন্দন বা শ্রীগৌরদেহ)	নিত্য নিরঞ্জন চৈতন্য।	মহাভাবময়ী প্রেম ও গুরু লীলা। (ব্রজলীলা)	সর্বকারণ চূড়ামণি শ্রীরাধারমণ ও তাঁহার নিত্য সেবা প্রাপ্তি।
মায়া বা অপরা প্রকৃতি বা মহত্ত্ব সত্তা।	প্রজ্ঞানঘন বা মূর্চ্ছা।	ব্যষ্টি-সচ্চিৎ জীব। সমষ্টি-সচ্চিৎ ঈশ্বর বা বাসুদেব।	স্বরাট কারণাতীত সূক্ষ্ম বৈজিক জীব দেহ। বিঃ কারণাতীত সূক্ষ্মবৈজিক বিশ্বদেহ(বাসুদেব দেহ)	স্বরাট অস্ফুট চৈতন্য। প্রশান্ত স্বতঃস্বতুপ্ত বিরাট চৈতন্য।	অস্ফুট জৈবিকী লীলা। ঐশ্বরিকী লীলা। (মথুরা লীলা)	
		ব্যষ্টি—প্রাজ্ঞ।	স্বরাট কারণ দেহ।	স্বরাট সুষুপ্ত সাত্ত্বিক চৈতন্য	স্বরাট সুষুপ্ত ও সাত্ত্বিক লীলা।	
		সমষ্টি—সঙ্কর্ষণ।	বিরাট কারণ দেহ (বলদেব দেহ)	বিরাট সুষুপ্ত সাত্ত্বিক চৈতন্য।	সুষুপ্ত ও সাত্ত্বিক জীব বৃন্দকে লইয়া ঐশ্বরিকী লীলা। (দ্বারকালীলা অন্ত্যলীলা)	
অবিদ্যা প্রকৃতি বা অহংতত্ত্ব সত্তা।	চেতনোন্মুখ বা প্রবোধ প্রবণ	ব্যষ্টি—তৈজস।	স্বরাট সূক্ষ্মদেহ।	স্বরাট স্বপ্নভূত রাজসিক চৈতন্য।	স্বরাট স্বপ্ন ও রাজসিক লীলা।	
		সমষ্টি—হিরণ্যগর্ভ।	বিরাট সূক্ষ্মদেহ। (প্রদ্যুম্ন দেহ)	বিরাট স্বপ্নভূত রাজসিক চৈতন্য।	রাজসিক ও স্বপ্নাবিষ্ট জীবকে লইয়া ঐশ্বরিকী স্বপ্নলীলা (দ্বারকালীলা—মধ্যলীলা)	
		ব্যষ্টি—বিশ্ব।	স্বরাট স্থূল দেহ।	স্বরাট জাগ্রত তামসিক চৈতন্য।	স্বরাট জাগ্রত তামসিক সৃষ্টিলীলা।	
		সমষ্টি—বৈশ্বানর।	বিরাট স্থূল দেহ। (অনিরুদ্ধ দেহ)	বিরাট জাগ্রত তামসিক চৈতন্য।	জাগ্রত ও তামসিক জীববৃন্দকে লইয়া সৃষ্টিলীলা। (দ্বারকালীলা-আদিলীলা)	

তদতীত তত্ত্ব লাভের বা তদতীত সূক্ষ্মতর সম্পূর্ণতর অনুভবের কোন পরিচয় ও উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। জীবের প্রতি ঐকান্তিক কৃপাজনিত ব্যতিব্যস্ততা নিবন্ধন তিনি তখন গভীরতর তত্ত্ব-দৃষ্টির বা সূক্ষ্মতর অনুভবের আর অপেক্ষা রাখিলেন না। তখনও পর্য্যন্ত যে কিছু সুগভীর সাংখ্যতত্ত্ব বোধগম্য করিয়াছিলেন, জীবের তাপত্রয় শান্তি পক্ষে, সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট জ্ঞানে তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। অথবা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবারও স্থল আছে যে, তদতীত তত্ত্ব জীবের ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয় ও অপ্রাপ্য বলিয়া,—আত্মার অখণ্ডত্ব, অদ্বৈতত্ব, সবিষয়ত্ব বা মহাভাবময়ী প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অভেদত্ব প্রভৃতি জীবের ব্যবহারিক জ্ঞানের স্বতঃই অগম্য ও অলভ্য বিষয় বলিয়া তিনি তাঁহার সূত্র মধ্যে তাহাদিগকে স্থান দান করিতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই বিরত হইয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার সাংখ্যদর্শনে বস্তুতঃ পারমার্থিক জ্ঞানের অনুসরণ সঙ্কল্প সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবহারিক জ্ঞানেরই তথ্যানুসরণে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জ্ঞানে আত্মার ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধিভূত হয়, তাহাকে খণ্ডিতভাবে অসংখ্য অনন্ত বলিয়া গণনা করা স্বতঃই সম্ভব হয়। আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব, অখণ্ডত্ব, একত্ব, এবং সবিষয়ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির তুরীয়ত্ব, আত্মার সঙ্গে তাহার অভিন্নত্ব, তদেকত্ব, নিত্য সাহিত্য, নিত্য সমাধিত্ব ও নিত্য সানন্দত্ব এ সকল বিষয় স্বতঃই ব্যবহারিক জ্ঞানের অগম্য ও অনায়ত্ত হইয়া আছে। আত্মা যখন ব্যষ্টিগত হইয়া স্বকীয় সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু স্বতঃই স্বরাট্ হইলেন; মহর্ষি সেই ব্যষ্টীভূত অধিষ্ঠান হইতেই তত্ত্ব সংখ্যার গণনা আরম্ভ করিলেন। তিনি আত্মাকে সংখ্যাত করিবার সময়, তাহার বিষয়াঙ্গকে,—তাহার নিত্য অপরিণামিনী বা সদৃশ পরিণামি—নিত্য তুরীয় পাদে প্রতিষ্ঠিতা, অর্দ্ধাঙ্গিনী পরমা প্রকৃতিকে ছাড়িয়া, চতুর্ব্বিংশতিতমা মূলা নাম্নী প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম বা নিস্তরঙ্গ অবস্থা স্বীকার করিয়া, তাহাকে অবিলম্বে পুরুষ সান্নিধ্য হেতু সতরঙ্গ বিসদৃশ পরিণামে আনিয়া ফেলিলেন এবং সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত করিলেন। পরে সৃষ্টির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সংখ্যাত করিয়া পুরুষকে খণ্ডিতভাবে প্রত্যেক ব্যষ্টির উপরে—প্রত্যেক তত্ত্বের উপরে সেই প্রকৃতির পারে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি স্বকীয় প্রাকৃত ব্যষ্টিদেহ মধ্যে শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত একজন স্বরাট্ খণ্ডাত্মক পুরুষকে ব্যবহারিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া, সহজেই মানিয়া লইয়া থাকিবেন যে, তাঁহার স্বকীয় প্রাকৃত ব্যষ্টি মধ্যে যেমন একজন শুদ্ধ চিন্ময় স্বরাট্ পুরুষ অনুভূত হইল, তেমনি সমস্ত মানবদেহে, সমস্ত জীব দেহে, সমস্ত ব্যষ্টি স্থাবরাস্থাবর দেহে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্বঘটে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত এক এক জন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ বা আত্মা স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন। তাহাতেই তাঁহার বিরচিত সাংখ্যসূত্রে সৃষ্টীভূতা মূলা নাম্নী প্রতিবিম্বিতা প্রকৃতি অখণ্ডারূপে এক, কিন্তু তাঁহার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষ বা নির্ব্বিষয় আত্মা খণ্ডাত্মকরূপে অসংখ্য অনন্ত। এই সমস্ত চিন্ময় পুরুষ নিত্য মুক্ত স্বভাব হইলেও প্রকৃতির সান্নিধ্যে বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া সৃষ্টি ব্যাপারে আসিয়া ব্যাপৃত এবং নানাবিধ সুখ দুঃখের অধীন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে "ত্রিবিধ দুঃখরত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তিই প্রকৃতি

সান্নিধ্য-প্রাপ্ত পুরুষের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকৃতিকে সাধনাদি দ্বারা স্বকায় সান্নিধ্য হইতে দূর-পরাহত করিতে পারিলে, পুরুষের এই পরম পুরুষার্থ সুসিদ্ধ হয় এবং আত্মা স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাবস্থায় উপনীত হয়। যে কারণেই হউক, ভগবান মহর্ষি তাঁহার অগাধ জ্ঞানার্ণব সাংখ্যসূত্রে, বিষয়ীর আত্ম-প্রকোষ্ঠে, আত্মার আংশিক, ব্যষ্টিভূত, নির্বিষয়, নিত্য প্রকৃতি-সাহিত্য-বর্জ্জিত, অর্দ্ধাঙ্গহীন, আনন্দহীন খণ্ড চিন্মাত্র উপলব্ধীভূত করিয়া তাহাকেই পঞ্চবিংশতিতম সর্ব্বোপরিস্থ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পঞ্চ বিংশতিতম তত্ত্ব-স্বরূপের—এই সর্ব্বতত্ত্বাতীত পুরুষের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব, সানন্দত্ব, অখণ্ডত্ব, বিরাটত্ব, সবিষয়ত্ব, অখণ্ডা আনন্দাত্মিকা প্রকৃতির নিত্য সাহিত্য ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপিত্ব, তৎসঙ্গে তাহার অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অভেদত্ব, ভগবান মহর্ষির সাংখ্য-সূত্রে কিছু মাত্র বিকাশ লাভ করে নাই। ঈদৃশ পরিপূর্ণ বিরাট্ সচ্চিদানন্দাত্মক আত্মার বিষয় সাংখ্য সূত্রে সূচিত না হওয়াতে তন্মধ্যে ভগবানের মহাভাবময়ী প্রেম-লীলার কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বরং বেদান্ত শাস্ত্রে এই ভাগবৎ লীলার আভাস ও ইঙ্গিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লক্ষিত হইয়া থাকে; অন্ততঃ সেই লীলার বিকাশ-পথ বেদান্তে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার রক্ষিত হইয়াছে।

৭৬। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিষয়ীর ভাবাঙ্গ গঠন সম্পূর্ণ হইয়া, অন্তর্দৃষ্টি-রূপে বিকসিত হয়। সেই ভাব দেহাবলম্বনে বিষয়ীর আত্ম চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ভাব-দেহের সম্পূর্ণ গঠন সম্পাদন হইতেই প্রকৃত অন্তর্চ্চৈতন্যোদয়ের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। প্রথমে দণ্ড-চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা হইতে অন্তর্চ্চৈতন্যের প্রগাঢ়তা ও পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, পরে তাহা ক্রমশঃ ভাবঘন, পরানন্দঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহ হইয়া দাঁড়ায়। কপিলের ব্যষ্টীভূত শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য প্রথমটীর বা দ্বিতীয়টীর অনুরূপ হইবে, বোধ হয়, কিন্তু তাহা কদাপি শেষেরটীর অনুরূপ নহে; যদি শেষেরটীর অনুরূপ হইত, তাহা হইলে তিনি পুরুষকে "শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত" অভিধান সঙ্গে "সচ্চিদানন্দঘন" আখ্যায় আখ্যাত করিতেন। এই দণ্ডচেতা, অন্তশ্চেতা, ভাবাঙ্গচেতা বিষয়ীই বা পুরুষই প্রকৃত আত্মচৈতন্য-সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পরমা প্রকৃতির অঙ্গগত তাহার সাক্ষাৎ বিম্ব-স্বরূপ এই অনুপম নিত্য নিরঞ্জন দেহেই স্বরাট্ বিষয়ীর তদায় অভিনব আত্মবুদ্ধির সংস্কার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আনন্দঘন অভিনব স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন হইলে, বিষয়ী পূর্ব্ব সংস্কারগত অভ্যাসের অনুগত হইয়া, ব্যবহারিক জীবভাবের ভূমিতে স্বভাবতঃ দণ্ডায়মান হইয়া, এই অভিনব সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপকে পরম উপাস্য জ্ঞানে ভক্তি ভরে তাঁহার পূজানুরত হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষণিক ভাবের আবির্ভাবে যে অন্তরঙ্গ প্রকাশ পায়—বাহা উন্মীলিত হইবার পরক্ষণেই স্বতঃই নিমীলিত হইয়া যায়—সেই ক্ষণভঙ্গুর স্ফূর্ত্তিতে প্রকৃত আত্মবুদ্ধি বা ইষ্টবুদ্ধি স্থির প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ কিন্তু সচরাচর সেই ক্ষণপ্রভার চকিত বিকাশে স্বতঃই, অন্ততঃ তৎকালে, ইষ্টবুদ্ধির কল্পনা করিয়া, সেই ক্ষণস্ফূর্ত্ত ভাবাত্মক আবির্ভাবকে অন্তরে অনুক্ষণ সাদরে ধারণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবদেহের নিত্যস্থায়ী সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ব্যতীত স্বরাট্ আত্মচৈতন্য অটল আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। বাহিরে কোনরূপ দণ্ড ধারণ করিয়া

কেহ প্রকৃত 'দণ্ডী' উপাধির যোগ্য হয় না, কিন্তু এই দণ্ড চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া সাধকেরা প্রকৃত দণ্ডধারী হইয়া থাকে। এই দণ্ড-চেতা, অন্তশ্চেতা, ভাবাঙ্গ-চেতা বিষয়ীর নিরঞ্জন ভাবাঙ্গভূত আত্ম-চৈতন্য প্রকৃত ভাবে উদিত হইলে, আর কখনও অন্তর্হিত বা নিমীলিত হইতে পারে না। কোন বঙ্গীয় সাধক কবি এই ভাবদেহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"খুঁজে পাওয়া যায় না গোড়া,
অতলে তার ব মেদ পাড়া,
উচ্চপুরী আকাশ ফোঁড়া,
সৃষ্টিছাড়া ভাবের গঠন।"

৭৭। এক্ষণে সদ্গুরু বা সাধুরূপ এবং তজ্জনিত স্বকীয় ভাবাঙ্গরূপ নিরঞ্জন বিষয়-রাজ্য হইতে, বিষয়ীর পূর্ব্বগঠিত ভাবদেহে যথোপযুক্ত, ইন্দ্রিয় গ্রাম সংস্থান হইলে, তাহার সেই নব অভ্যুত্থিত ইন্দ্রিয়পুঞ্জ বাহ্য প্রবুদ্ধ হইলে, তাহার নির্ম্মল পরমাত্ম তত্ত্ব ইষ্ট ভাবে ব্যবহারিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আত্মতত্ত্বের অভ্যুদয়-কালে বিষয়ী আপনার আত্ম-বিম্বকে, স্বরূপ বিম্বকে, ভাবাঙ্গের সাহায্যে খণ্ডাত্মা বা স্বরাট্‌রূপে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এখন এই বিষয়ী সেই পরানন্দঘন নিরঞ্জন স্বরূপকে সর্ব্বঘটে, সর্ব্বভূতে, দৃষ্টীভূত প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে, অখণ্ড বিরাট অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম-রূপে, ব্যবহারিক সন্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

বঙ্গের গৃহস্থলী।

(১)

যথা জননীর কোলে
সুকুমার শিশু দোলে,
বিচিত্র চাঁদের মেলা,
ছেলে মেয়ে করে খেলা,
শূন্য হ'তে হেরি যায়
নামিয়া আসিতে চায়
অসংখ্য তারকা সহ শশী আকাশের!
স্নেহময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের!

(২)

যথা পিতামাতা আর
জায়াপুত্র পরিবার,
ভাইভগ্নী এক ঠাঁই,—
বিচ্ছেদ-বৈষম্য নাই;
প্রিয়বন্ধু পরিজন
সেবিয়া সন্তুষ্ট মন;
প্রত্যহ সঞ্চিত যথা পুণ্য আতিথ্যের!
শান্তিময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের!

(৩)

যথা এক কোণে বসি'
বঙ্গবধূ সুরূপসী
আবক্ষ ঘোমটা দিয়া
আপনাতে মিশাইয়া
ভরিয়া হৃদয়-ডালা
গাঁথে স্বপ্ন-ফুলমালা,
নন্দন-উদ্যানে পশি' সুখ-ভবিষ্যের!
মধুময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের!

(৪)

যথা অতি নিরজনে
মিলিয়া প্রেয়সী সনে
প্রেমিক স্বভাব-কবি
হেরে স্বরগের ছবি,
ধর্ম্ম-অর্থ-তপ-রূপ
দাম্পত্যে দেখিয়া সব
মাহাত্ম্য বুঝিয়া লয় নর-জনমের!
প্রেমময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের!

(৫)

যথা পর-অধীনতা
প্রিয়তর স্বাধীনতা,
সবাই সামর্থ্য মত
স্বধর্ম্ম-সাধনে রত,
সর্ব্বস্ব করিয়া দান
তবু তৃপ্ত নহে প্রাণ ;
নিত্য যথা অনুষ্ঠান নিষ্কাম-ব্রতের !
পুণ্যময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের !

(৬)

যথা মূর্ত্তিমান সাজে
বিশ্বের দেবতা রাজে,
জগতে তুলনা যা'র
কোথা নাহি মিলে আর,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল
ত্রিলোকের তীর্থস্থল,—
ভুবন ভ্রমিয়া যেথা ছুটে আসি ফের !
মোহময় গৃহ সেই গৃহ আমাদের !

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

তমলুকের ইতিহাস। (৩)

এক্ষণে মহাভারতের ঘটনা কোন্ সময়ে হইয়াছিল, দেখা আবশ্যক। ইহা কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় নাই। পঞ্জিকাকারগণের মতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলির্গতাব্দাঃ ৪৯৯৮ বৎসর। তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সময় ৪৯৯৮ বৎসর হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুন-মেদিনী বিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ পাং।
যুধিষ্ঠিরাদেবযুগাববাণবঃ ৩০৪৪
কলশবিধে ১৩৫ হত্রধথাইভূষঃ ১৮০০০
ততোহযুতং ১০০০০ লক্ষচতুষ্টয়ং ৪০০০০০
ক্রমাৎ দরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ।"

"অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় রাজা যথাক্রমে শকাব্দা স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ প্রচলিত ছিল। তৎপরে ক্রমে ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের ১৮০০০ বৎসর, শালিবাহনের ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের, এবং ৮২১ বৎসর বলির শকাব্দ প্রচলিত থাকিবে। বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মত সমর্থন করেন। উক্ত শালিবাহনশকাব্দই বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত। এক্ষণে ইহার মান, ১৮১৯।—সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ হইতে ৪৯৯৮ চারি হাজার নয়শত আটানব্বই বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া ব্যবহার করিতেছি। এবং ;—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্ব্বৎসরাঃ।"
ভাস্করাচার্য্য।

শাকো নন্দযুগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ
কলের্গতাব্দগণো ভবন্তি। মকরন্দ।

ইহার দ্বারা বুঝিতেছি, ৩১৭৯ তিন হাজার একশত উনআশী কলিগতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ। যোগ করিলে কলি প্রবৃত্তির প্রথম বর্ষ হইতে উক্ত ৪৯৯৮ বর্ষই বর্ত্তমান বর্ষ ইহা স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শাক ও কল্যব্দের আরম্ভ এক বর্ষই বলিতে হয়।" (৪৯)

(৪৯) জন্মভূমি—দ্বিতীয়খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

কাশ্মীর-ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে :—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন কুরুপাণ্ডবাঃ॥" (৫০)

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলি প্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া বোধ হয়।

এইখানে আমরা পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম। ইহা দ্বারা পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

"কোন সময়ে মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ কালে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ তারিখে, সোমবার, ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, মহিষী কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন। (কল্যব্দ ৬৫৩, ২৫২৬ শকাব্দ পূর্ব্ব, ২৩৯১ সংবৎপূর্ব্ব, ২৪৪৮ খ্রীঃ পূর্ব্ব) ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই প্রায় এক এক বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিবসেই গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করেন। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন দেবোপম পুত্রগণের লালনপালনজনিত পরমানন্দসন্দোহ উপভোগ করিয়া অবশেষে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ করাল কালকবলে নিপতিত হইলেন। মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তৃচিতা আরোহণ পূর্ব্বক পরলোকে স্বামীসহ সঙ্গতা হন।

অনন্তর সমাতৃক পাণ্ডবগণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরীতে সমাগত হইলেন। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সপ্তদশ দিবস হইল, পাণ্ডু নৃপতি পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর শোকের ইয়ত্তা রহিল না, ভ্রাতৃবিয়োগে তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। পৌরগণ দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতীব শোক-সন্তাপে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বাদশাহান্তে ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ মহাসমারোহে সমাধান করিবা স্বীয় তনয়গণ ও পাণ্ডুনন্দনগণকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রাদিতে সুপারগ হইয়া উঠিলেন। ধনুর্ব্বেদে দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিক্ষা-গুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা রহস্যভেদে, নকুল সহদেব খড়্গযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথে, এবং অর্জ্জুন সমুদায় বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের উপর দুর্যোধনের জাতক্রোধ ছিল, সে শৈশবকাল হইতেই ভীমকে হিংসা করিত। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে, বিশেষতঃ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনী সভায় তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও প্রভাব দর্শনে, প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জানপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা-কলুষিত হৃদয় দুর্য্যো-

(৫০) রাজতরঙ্গিনী প্রথম তরঙ্গ, ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ধনের চিন্তা ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিল না। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি পিতার বিদ্বেষভাব জন্মাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হন নাই। কিন্তু শেষে তাঁহাকে পুত্রের নানাবিধ বাক্যজালে জড়িত ও একান্ত বিমোহিতচিত্ত হইয়া অগত্যা কিয়ৎকালের জন্য বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বাসার্থ অনুমতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশানুসারে মাতৃ সমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থানের কিয়ৎদিবস পূর্ব্বেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীস দেশীয়) মন্ত্রীকে বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনার্থ জতুময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরোচনও প্রভুর আদেশানুরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পাণ্ডবগণের অপেক্ষা করিতেছিল। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা করেন, সেই সময় মহামতি বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিসন্ধি সকল বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া নাগরিকগণের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানা ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান ও পরিচার্য্যাদি করিলে পর পুরোচন তাঁহাদিগকে বিবিধ ভোগবিলাস সম্পন্ন সেই জতুনির্ম্মিত গৃহে বাসার্থ লইয়া গেল। বিদুরোপদিষ্ট পাণ্ডবগণ বিশ্বস্তের ন্যায় পুরোচনের আহ্লাদ সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক সাবহিত চিত্তে একবৎসরকাল সেই ভবনে বাস করিলেন। পরে একদা সমাতৃক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী নিশায় অগ্রে পুরোচন গৃহদ্বার এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক বিদুরপ্রেষিত-খনক-নির্ম্মিত সুরঙ্গ পথে প্রস্থান করত তৎপ্রেরিত যন্ত্রচালিত নৌকায় (বাষ্পীয় নৌকা) গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবল ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নর-শোণিতলোলুপ অসভ্য জনাধিপকে বধ করতঃ তৎ-সহোদরা হিড়িম্বার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া কিছুকাল তাহার সহিত বিহার করিয়া ভ্রাতৃগণ সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা জটাবল্কলধারী হইয়া তপস্বিবেশে একচক্রা (এইক্ষণ রাঢ়দেশে 'এক চাকা') নগরে গমন পূর্ব্বক তথায় এক ব্রাহ্মণ ভবনে কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ নগরে মহাবল ভীম সেই ব্রাহ্মণের উপকারার্থ নর-লোলুপ বক নামক এক অসভ্য নরপতিকে বধ করেন। পরে পাণ্ডবগণ পঞ্চাল দেশে দ্রুপদরাজ-তনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদরাজধানী কাম্পিল্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুন মৎস্যচক্র ভেদ করিয়া যুদ্ধে রাজন্যবর্গকে পরাজয় পূর্ব্বক অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে জননীর আদেশানুসারে পঞ্চ ভ্রাতাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে মহাসুখে বাস করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া বাহুবল দ্বারা অন্যান্য নৃপতিবর্গকে বশীভূত করিয়া

বহুকাল যাবৎ তথায় বাস করেন। পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ দুর্য্যোধন-মায়া মোহিত জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লি) রাজধানী স্থাপন করতঃ তাঁহার বয়সের ৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহা কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আহূত হইয়া হস্তিনায় সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়ায় পণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবর্ষ বনবাসে এবং এক বৎসর বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা বিফলিত হওয়ায় যুদ্ধের উদ্যোগাদি করিতেও প্রায় এক বৎসর কাল গত হয়। পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে (এক্ষণে তাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ) কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। (কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে)।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণ যুদ্ধের সাহায্যার্থে সসৈন্যে সমাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় সুহৃৎপক্ষাবলম্বন করিলে পাণ্ডবদলে সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবদলে একাদশ অক্ষৌহিণী সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধটী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবস হইতে নিরবচ্ছিন্ন অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত চলিয়া ভারতের গৌরব, শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও ধনের সহিত নিঃশেষিত হইয়া যায়। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। উভয় পক্ষের সমুদায় সেনানী ও সৈন্য নিহত হইলে পাণ্ডবদলে সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং কৌরব দলে তিন জন মাত্র (কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

ইংলিস-হোম। (১)

দেবীপ্রসন্ন বাবু,

যদিও অনেকবারই অনুরুদ্ধ হ'লাম, তবুও নিজের স্বাস্থ্য ও অবকাশাভাবে আপনার অনুরোধ এ পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে পারি নাই। আজ মনে করেছি, "ইংলিস-হোমের" সম্বন্ধে দু-এক কথা ব'লব। কিন্তু এ প্রস্তাব আপনার পাঠক-পাঠিকাদিগের কতদূর মনোরম হবে, তা আমি ব'লতে পারি না।

আজ সপ্তাহে দুই হ'ল, আমাদের বাড়ীতে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দম্পতী, অভ্যাগত বন্ধুরূপে আছেন। একদিন প্রাতঃকালে ইঁহাদের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নানা কথোপকথনের মধ্যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বল্লেন,—"It is our home that has made us a great nation."—কথাটি নূতন নয়। হয়ত আরো কয়েকবার ইহার পূর্ব্বে শুনেছি। আপনার পাঠকেরাও হয়ত উক্ত পদের সত্যতা অবগত আছেন। কিন্তু কেন "ইংলিস-হোম" ইংরাজ জাতির

মহত্ত্ব-সাধন করে বিশেষ সহায়, তা পূর্ব্বে বড় একটা ভাবিয়া দেখি নাই। আমাদের উক্ত অভ্যাগত বন্ধু তেমন সুশিক্ষিত নন, মধ্যবিধ ব্যবসায়ী, তবে খুব উদার-চেতা ও প্রশস্তমনা। আশ্চর্য্য, এ দেশের অনেক অল্প শিক্ষিত, অল্প পরিমার্জ্জিত লোক-দের মধ্যেও বেশ উদার মনের, বেশ অপক্ষ-পাত চিন্তাশীলতার, বেশ সামানীতি-পরায়ণ-তার, দিব্য. অসংকীর্ণ মত পোষণের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধ বন্ধুটী একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাই হো'ক, তাঁর ঐ উক্তি শুনে যেন আমার সুপ্ত চিন্তা জাগ্রত হ'ল, এবং চিন্তা চক্ষু উন্মীলন করে ইংলিস-হোমের চতুষ্পার্শ্বে নিরীক্ষণ করতে লাগিলাম। কি বিশেষ বিশেষ কারণে "ইংলিস-হোম" এত শ্রেষ্ঠ, এত উচ্চ ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হ'লাম। হোমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যা দু একটী কারণ চ'খে লাগ্‌ল, তাই নিয়ে লিপি-বদ্ধ কর্‌লাম।

বোধ হয় এ কথা বলা আর আবশ্যক করে না যে. অন্য কারণের মধ্যে ইংরাজের "ঘর" ইংরাজ জাতিকে মহৎ করিবার একটী প্রধান ও মহৎ কারণ—একমাত্র প্রধান কারণ যদিও নয়। যতদিন স্বদেশে ছিলাম, ইংরাজ ঘরের যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, ইংরাজের ঘর যে নানা স্বাস্থ্যকর ভাব ও গুণ সঞ্চারের এক অতি সুপ্রশস্ত ও উর্ব্বর ক্ষেত্র, ইংরাজের ঘর আমাদের নিজের ঘরের চেয়ে যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, ইংরাজ-ঘরের .পরিশুদ্ধ ও প্রমুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিলে স্বতঃই যে শরীর মন ও হৃদয়ের সমবায়ে যুগপৎ উন্নতি সাধন হয়, এত সুন্দররূপে তা আদবেই বুঝিতাম না। হয়ত, ইংরাজ-ঘরের এ প্রশংসা শুনে. আপনার কোন কোন পাঠক লেখকের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিবেন, হয়ত কেহ কেহ মনে করিবেন, লোকটা "দেড়মাস বিলাত গিয়াই সাহেব হয়ে গেছে, দেশের কিছু তাঁর আর ভাল লাগে না।" কিন্তু সহিষ্ণু পাঠক, দণ্ডবিধানের পূর্ব্বে যেন অপক্ষপাত বিচার করেন।

অবশ্য ইংরাজের "ঘর" বল্লে কেউ আর একখানা চার চালওয়ালা সামান্য ঘরের কল্পনা করিবেন না, অথবা স্লেট বা টাইল ঢাকা ঢালু ছাতযুক্ত, তিন চার তালা থেকে সাত আট তালা উচু একখানা ইটের দেয়ালের ঘর; সম্মুখে বড় বড় কাচের জানালা, ভেতরে দেয়ালে কাগজ মারা, তক্তাদির বিভক্ত নানা কুটরি সম্বলিত একটা বৃহৎ ব্যাপারও কারো মনে আঁকবার দরকার নাই। ইংরাজের "ঘর"—ইংরাজের কেন, সকলেরি "ঘর" বলাতে আমরা বুঝি, পিতা, মাতা, পুত্র কন্যার সম্বন্ধ ও একত্র বাস। যেখানে—তা, প্রান্তরেই হোক, আর জনপদেই হোক, নগরেই হোক্, আর মরু-ভূমিতেই হোক্, হর্ম্ম্য-তলেই হোক্.আর পর্ণ-কুটীরেই হোক্—যেখানে একত্রে বাপ, মা, ভাই, বোন বাস করে, তাই তাদের "ঘর"। আমরা ইংরাজের ঘর বলিতে তেম্নি ঘরেরই কথা মনে কর্‌ছি। এখন ঘরে ঢুকলে, আমাদের চ'খে প্রথমেই পিতামাতা ও পুত্র-কন্যার একটা পারস্পরিক-সম্বন্ধের বিশেষত্বের আভাস এম্নি চখে লাগে যে, তা কোন মতেই উপেক্ষিত হবার নয়। আমাদের দেশে জনক-জননী কেবলই জনক-জননী; অনেক স্থলে আর কিছুই যে নন, তা বল্লে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ দেশে জনক-জননী কেবল জনক-জননী নন, তাঁরা ছেলেপিলেদের বাল্য-সখা, ক্রীড়া-সঙ্গী, শিক্ষা-

গুরু ও জীবন-বন্ধু। ইংরাজ জাতীয় জীবনের কোন বিশেষ ও নিগূঢ় ধর্ম্ম বশতঃ কি না, কিম্বা ইংরাজ পারিবারিক-স্বভাবের কোন বিশেষ প্রথা মত কি,—আমরা ঠিক জানিনা; কিন্তু দেখ্‌তে পাই—ইংরাজ পিতামাতাদের স্বকীয় পরিবারের মধ্যে সন্তান সন্ততির নিকট দিবসের অধিকাংশ কাল পূর্ব্বোল্লিখিত বহুরূপীর সাজে সজ্জিত হ'তে হয় ও অভিনয় করতে হয়।

ইংরাজ-ঘরের আদব কায়দার জন্ত এক বাড়ীর ছেলেরা অন্ত বাড়ীর ছেলেদের সহিত সহজে মিশিতে পারে না। এমন কি, পার্শ্বের সংলগ্ন বাড়ীর ছেলেপিলেরা পর্য্যন্ত পরস্পরের সহিত খেলাদেলা কিম্বা মেশামিশি বড় একটা করিতে পায় না। অন্ত ছেলের সহিত মিশিবার ও খেলিবার সুবিধা ও অবসর কেবল স্কুলে ও কলেজে। সুতরাং ইংরাজ-পরিবারের বাপমাকেই শিশুদের ক্রীড়া সহচর হইতে হয়। গৃহে ও বাহিরে কোমল প্রকৃতি ও অপরিগঠিত দেহ মন শিশু সন্তানদের একমাত্র ক্রীড়া-সঙ্গী পিতা ও মাতা। আমরা পথে ঘাটে ঘরে ও বাহিরে সর্ব্বদা এ দৃশ্য দেখ্‌তে পাই। প্রাতঃকাল হ'লেই সকলের নিত্যনৈমিত্তিক ও পারিবারিক কার্য্য সম্পন্ন ক'রে স্নেহময়ী জননী শিশু সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে—যারা নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য তাদের ছোট ঠেলাগাড়ী ক'রে আর যারা হাঁটিতে পারে, তাদের হাঁটিয়ে পথে বেরুলেন। কোন প্রকাণ্ড বাগানে কি মাঠে, যে কোন সাধারণের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে, কিম্বা কোন অদূরস্থ কোন সুন্দর উপত্যকায় কিম্বা কোন ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বেড়াতে গেলেন। যদি নিজের ছেলেপিলের সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে ছেলেরা আপনারা চার চ'খের সাম্নে বিশুদ্ধ হাওয়াতে ও মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকৃতির নানা রমণীয়তার মধ্যে খেলা করে, মা নিজে হয়ত বসে বসে কোন সেলাইয়ের কাজ করেন, কিম্বা বই কাগজ পড়েন। কখন বা ছেলেদের সঙ্গে ঠিক ছোট ছেলের মত নানা খেলা খেলেন। যদি অন্য ছেলে আর না থাকে, মা নিজেই ছেলের সঙ্গে নানা খেলা খেলেন। ছেলেরা অন্ত কারো সঙ্গে মিশিতে পারে না। কেবল সকাল নয়—বৈকালে, সন্ধ্যায় ঐ দৃশ্য। পথে ঘাটে অসংখ্য অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মা'র কিম্বা বাবার এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভাই বোনের সঙ্গে নানা খেলা, দিব্যি মুক্ত ভাবে খেলে। শিশু শরীর ও মনের উন্নতি ও বর্দ্ধনের জন্য ক্রীড়া—বিশুদ্ধ বায়ুতে ক্রীড়া ও পরিভ্রমণ যেমন অত্যাবশ্যক, তেম্নি শিশু সঙ্গও অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশের ন্যায় এদেশে দূর বা নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা একত্রে, বহু ও মিলিত পরিবারে বাস করে না। সুতরাং গৃহে নিজের ভিন্ন অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের শিশুও থাকবার সম্ভাবনা নাই। পিতামাতাকেই সেই অভাব পূর্ণ করতে হয়। ইহাতে তরুণমতি, অপরিবর্দ্ধিত-দেহ শিশু সন্তানেরা কতই না উপকার পায়? বাপমার স্নেহের চক্ষুর সমক্ষে, বাপমার স্নেহ-করুণা-পূর্ণ সঙ্গে শিশু-শরীর মন কেবল যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করে তা নয়; মন্দ সংসর্গের হাত হতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পায়। আর অতি শৈশব হইতে পিতামাতাকেই একমাত্র ক্রীড়া-সহচর জেনে ও দেখে, আমাদের দেশের ছেলেপিলেদের মত বাপ মাকে "জুজুর মত এক ভয়ের সামগ্রী মনে করে না।

কিন্তু তা বলে ইংরাজ বালক বালিকারা কি পিতামাতাকে প্রকৃত সম্মান করিতে জানে না? না, তারা পিতামাতার প্রতি কম শ্রদ্ধা-

বান্ না পিতামাতার অবাধ্য? আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে,সর্ব্বদা রক্তচক্ষু করে না তাকালে, অস্পষ্ট ভাষায় সম্বোধন না করলে, খেলাদেলার বিশেষ প্রতি বাধক না হলে, কর্কশ স্বরে না ধমকালে এবং সময়ে সময়ে শিশু শরীরে হস্ত বা বেত্রসঞ্চালন না ক'রলে ছেলেপিলেদের সম্মান বা শ্রদ্ধা বা ভয় বা ভক্তি আকর্ষণ করা যায় না। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য,সে সম্বন্ধে যাঁরা পিতামাতা হয়েছেন, তাঁদের অপক্ষপাত অভিজ্ঞানের উপরই লেখককে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হ'বে; কেননা, লেখকের অভিজ্ঞান এ সম্বন্ধে এখনও আরম্ভ হয় নাই। তবে ছেলেবেলার কাহিনী আজও মনে পড়ে। পিতামাতাকে যে জুজুর মত এক ভয়ানক সামগ্রী মনে করিতাম, তা আজও দিব্যি মনে হয়। যাইহোক্, ইংরাজ-শিশু কি ইংরাজ বালক বালিকা বা ইংরাজ যুবক যুবতী, আশৈশব পিতামাতাকে জুজুরূপে দেখতে বা মনে করিতে অভ্যস্ত না হলেও কোনমতে বলতে পারি না যে, তারা আমাদের অপেক্ষা পিতামাতার প্রতি কম ভক্তিমান বা তাদের কম বাধ্য। জনক-জননী বা গুরুজনদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শনে যথার্থই ভক্তি ও নিষ্ঠা করিতে ইংরাজ কখনই কোন জাতি অপেক্ষা হীন নয়—ইহা অবাধে ও মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে। আদব কায়দার কড়াকড়ে ইংরাজ ছেলেপিলেরা এম্নি মানুষ হয় যে, একটী চক্ষু টিপুনিতেই সব অবাধ্যপনা ঘুচে যায়। পিতা মাতার অপরিমেয় স্নেহের সুমিষ্ট শাসনে শিষ্টাচার ও সুনীতি পরায়ণতা ইংরাজ বালক বালিকাদের যেন দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে উঠে।

আমাদের দেশের অনেকে হয়ত মনে করেন যে, যদি বাপ মা ছেলেদের সঙ্গে খেলা দেলা করেন, তা'হলে ছেলেরা বে-আদব হয়ে যায়, বাপ-মাকে ভয় করে না। আর বাপ-মার প্রতি ভয়শূন্য হলে সন্তানদের মানসিক উন্নতির স্পৃহ বাধাং হ'তে পারে। আমরা ইহা পূর্ব্বেই বিশ্বাস করিতাম না। তারপর এদেশের লোকদের এ সম্বন্ধে চালচলন দেখে আমাদের সে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছে। আমরা ত প্রায়ই দেখি, ছেলেরা বাপ-মার ঘাড়ে পিঠে চড়ছে, বাপ-মার সাক্ষাতে দৌড়ধাপুড় করছে, বাপ-মার সঙ্গেই নানা রকম খেলাদেলা করছে। বাপ-মা নিজে ছেলেকে খেলা দিচ্চেন; খেলার জন্য খেলার উপযোগী সামগ্রী কিনে আনছেন; ছেলেদের খেলাদেলার জন্য মাঠে, বাগানে নিয়ে যাচ্চেন এবং তাদের সঙ্গে ঠিক ছোট ছেলের মত খেলছেন। ছেলেরাও খেলবার সময় বাপ-মাকে একটুও সঙ্কোচ করে খেলে না। ঠিক সমবয়স্ক ছেলের মত বেশ স্বাধীনভাবে খেলা করে। খেল্তে খেল্তে যদি ছেলে কোন মতে একটু বে-আদবি ভাব দেখায়, একটী কথা, একটী চক্ষুর টিপনি আবশ্যক, বেশী কিছুর দরকার করে না। বিশেষতঃ অন্য সঙ্গে মিশতে পায় না বলে, ছেলেরা বেশী মন্দ ভাব কি দুষ্টপনা ছেলেবেলা শিখতে পারে না। আর শৈশব হ'তেই বাপ-মার সঙ্গ বই, অন্য সঙ্গ না পেয়ে, ছেলেরা বেশ ভাল শিক্ষা ও শিষ্টাচারের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে, মন্দ হবার অবসর পায় না।

ইংরাজ পিতামাতাই আবার আশৈশব সন্তানের শিক্ষাগুরু। খেল্বার সময়ে মা কিম্বা বাপ যেমন ছেলেপিলেদের খেলা দেন, তেম্নি যখন সাময়িক শিক্ষার সময় হয়, তখন বাপ-মাই ছেলের শিক্ষক। সকলেই জানেন,

দণ্ড-তাড়নার ভয়ে শিক্ষার চেয়ে স্নেহের টানে আদরের শাসনে শিক্ষা কেমন সর্ব্বদা সুফল-প্রদ। ইংরাজ বালক বালিকারা অতি অল্প বয়স হতেই বাপ-মার সঙ্গে সর্ব্বদা থেকে অনেক বিষয় শিক্ষা করে। বাস্তবিক, এ দেশের ৮।৯ বৎসরের ছেলেরা এত নানা বিষয় শেখে, এত নানা বিষয়ের খোঁজ রাখে যে, তাদের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কহিলে আশ্চর্য্য হতে হয়। আমি একদিন কোন এক প্রকাণ্ড বাগানে এক সময়ে গাছের তলায় বেঞ্চের উপর বসে বই পড়ছিলাম। খানিক পরে একটী ভদ্র স্ত্রীলোক একটী ঠেলা গাড়ীতে তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই গাছের তলায় বেঞ্চের উপরে এসে বসিলেন। তিনি বেশীক্ষণ বসেন নাই। মিনিট কতক পরেই উঠে গেলেন। কিন্তু যে কয়েক মিনিট বসেছিলেন, ছেলেটী প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। আধ আধ জড়ান কথায় "মা, ওরা কি করছে ?" টেনিস খেলবে কবে, "মা ওটা কি গাছ ? মা বল্লেন কোনটা বাছ ? ছেঃ এই যে বড় গাছটা ? মাঃ অমুক গাছ ধন আমার। ছেঃ ওটা কি গাছ ? কোন্‌টা বাছ ? ছেঃ ঐ যে মাঠের সে পাশে ঝাঁকড়া গাছটা। মা বল্লেন, বাপু আমি হেথা থেকে ; ভাল দেখতে পারছিনা, আর হয় ত নিজেও ওর নাম জানিনা।

আমি কাছে বসেছিলাম। ছেলেটীর অবিশ্রান্ত প্রশ্নমালা শুনে আর ম'র হারের কথা শুনে, আমি আর হাসি রাখ্‌তে পারলাম না। আমার হাসি দেখে, ছেলের কৌতূহলোদ্দীপ্ত মুখখানি গম্ভীর হ'ল। মাকে বল্লে, মা এখানে আর থাক্‌ব না। মা গাড়ী ঠেলে নিয়ে অন্য দিকে গেলেন। আমি দেখতে লাগ্‌লাম, ছোট ছেলেটির ছোট আঙুল ক্রমাগতই গাছ গাছড়ার পানে বাড়াচ্চে এবং মাও সাধ্যানুসারে বাগানের জানা গাছপালা ও ফলের নাম ছেলেকে বলে দিচ্চেন। এই একটী সামান্য ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, এ দেশের ছেলেপিলেরা অশৈশবে বাপ-মার সঙ্গে থেকে বাপ-মার কাছে শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই কত অভিজ্ঞতা লাভ করে। বাস্তবিক এ দেশের বাল্য-শিক্ষার গুণে এবং ইংরাজ-গার্হস্থ্য-জীবনের কল্যাণ-প্রদ ও উন্নতিকর আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়ে অতি অল্প বয়স্ক ইংরাজ-বালক বালিকারাও এত নানা বিষয়ণী অভিজ্ঞানের পরিচয় দেয়, কথাবার্ত্তায় এম্নি পারদর্শিতা দেখায় যে, তাদের প্রশংসা না দিয়ে থাকৃতে পারি না এবং মনে মনে আপনাদের দেশের ছেলেদের কথা ভেবে নিজেদের হীনতা মনে ক'রে না লজ্জিত হ'য়ে থাকৃতে পারি না। এ দেশের ছেলেরা অতি অল্প বয়সেই এম্নি চালাকচোকস, এম্নি আটপিটে হয়ে ওঠে, তার বিশেষে ও একমাত্র কারণ ইংলিস-হোম। ইংরাজ গার্হস্থ্য-জীবন, কেবল ইংরাজ বালক বালিকা কেন, যদি অন্য কোন বিদেশীয় লোকও সৌভাগ্য ক্রমে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বৈদেশিক অতি অল্প কালের মধ্যে আপনার স্বাস্থ্যপ্রদ হাবভাবে শিক্ষা ও সদাচারের গুণে মানুষ করে তোলে। বাস্তবিক ইংলিস্ হোমের এমনই একটা সুন্দর প্রাধান্য আছে।

তারপর, পিতামাতা আবার জীবন-বন্ধু। আমাদের চাণক্য শ্লোকে আছে, ষোড়শ বর্ষ হ'লে পুত্রের সহিত পিতার মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। এই উক্তি থেকে বোঝা-যায়, চাণক্য মানব-চরিত্র কেমন সুন্দররূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইংরাজ-পিতামাতা চাণক্যের উপদেশ না পেলেও বয়স্ক পুত্র-

কন্যার সহিত মিত্রভাবেই ব্যবহার করেন। আমার বোধ হয়, ইংরাজ ছেলেরা বাপ-মার ন্যায় এমন বন্ধু জীবনে কখন পায় না। কেননা, বাপ-মার ন্যায় এমন নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ও পরম হিতৈষী বন্ধু আর কে হ'তে পারে? বিপদে সম্পদে, দুঃখে দারিদ্র্যে, শোকে হর্ষে, সুপথে, কুপথে স্নেহপূর্ণ মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ উপদেশ দিতে, সৎপরামর্শ দিতে পিতামাতার মত এমন কে আছে? ইংরাজ সন্তানেরা অতি বাল্যকাল হতেই পিতামাতার এম্নি অবিচ্ছিন্ন হৃদয়-বন্ধু ও সখা, মিত্র ও সুহৃদ দেখ্‌তে পায় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারও করে। বাপ-মার নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই। অথচ আমাদের দেশে পিতামাতা ও পুত্রকন্যার সম্বন্ধ এক বিশেষ রকমের বলে, আমরা অতি বাল্যকাল হ'তেই পরস্পরের নিকট থেকে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করতে শিখি। বাপ-মার ভয়ে, কি বড় ভাই বোনের ভয়ে, ছোট ছেলেরা কত সময়েই না মিথ্যা ও আত্মগোপন শেখে। ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে ভয়ের শাসন নাই। লুকাইবার বা মিথ্যা বলিবার কোন আবশ্যক নাই। বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা সবই খোলাখুলি কথা কয়; হাসি রহস্য, আমোদ প্রমোদ সবই বাপ-মার কাছে ও সঙ্গে, স্পষ্টভাবে ও নির্দ্দোষ ভাবে ছেলেরা করবে। দোষ দেখ্‌লে, অন্যায় বিবেচিত হ'লে, অতিরিক্ততা ভাবলে, বাপ কিম্বা মা, ভাই কিম্বা বোন তখুনি সাবধান করে দিলেন, সদুপদেশ দিলেন। কারো কাছে কোন কিছু অপ্রকাশ রাখ্‌তে হয় না, রাখিবার জন্য মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় লইতে হয় না।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যদি ছেলেরা বাপ-মার প্রতি বন্ধুভাবে দেখে, তাহলে অনেক অনিষ্টের বীজ আদবেই অঙ্কুরিত হ'তে পায় না। বোধ হয়, পিতামাতার পুত্র কন্যাদের নিকট সম্মান ও ভক্তির আস্পদ হবার ইচ্ছায় তাদের সহিত এম্নি ব্যবহার করেন যে, বাপ-মার সঙ্গে ছেলেপিলের খোলাখুলি কথাবার্ত্তা একবারেই যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে আমরা সমূহ অনিষ্ট-পূর্ণ দূরেই এসে পড়িছি। পিতা পুত্রে, মা ও মেয়ে যদি না অসংকোচে, অবলীলাক্রমে হৃদয়ের নানা ভাব বিনিময় করতে পারেন, তবে আর কে পারবে? অথচ, আমরা জানি, আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা বাপ-মার কাছে "কেঁচো" হয়ে থাকে। ইহা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক, ইহা যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, ইহা যে নিতান্ত অনিষ্ট-হেতু, তা আমি আর বেশী বিশদ করে বলতে পারি না।

ইংলিশ-হোমের পিতামাতা পুত্র কন্যার পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে ইংরাজ-ঘর এত রমণীয় ও সুখের নিদান। এমন মুক্ততা, এমন সরলতা, এমন বিশুদ্ধ হাবভাব, এমন শিষ্টাচার, এমন নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের উচ্ছ্বাস, এমন মাখামাখি, এমন এক-হৃদয়তা পরিবারের মধ্যে দেখি না। বয়স্কা বোন বয়স্ক ভাইয়ের সঙ্গে, প্রাপ্ত-যৌবন সন্তানগণ পিতামাতার সঙ্গে এম্নি সরল ও প্রমুক্ত ভাবে মিশে ও ব্যবহার করে যে, অনেক সময়ে আমাদের দেশের লোকদের অশিক্ষিত চক্ষে সে সব নিতান্ত অমার্জ্জনীয় ব্যবহার বলে প্রতীত হবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা (অল্পদিন হ'ল) আমরা খেলাদেলার পর পার্কে দাঁড়িয়ে সবাই কথা কচ্ছি, অনেকগুলি ইংরাজ যুবক-যুবতী বালক-বালিকা (সবই ভদ্র ঘরের) দাঁড়িয়ে নানা শিষ্টালাপ করছে। তার মধ্যে থেকে একটী ষোড়শী বালিকা (অবশ্য আমাদের দেশে এঁকে কেহ বালিকা বলবেন না; তিনি হয়ত সে বয়সে বালিকার মাতা হয়েছেন) বল্লেন, "দেখুন, আমি সম্প্রতি অমুক যায়গায় বেড়াতে গিছলুম; তা সেখান থেকে ফিরে এসে অবধি আমার এম্নি স্ফূর্ত্তি হয়েছে যে, আমার কেবল দু হাত তুলে নাচ্‌তে ইচ্ছে করছে"। এই বলে আমাদের সবার সামে একবার নেচে নিলেন। তারপর তাঁর পিতা মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য বাগানে এলেন। পিতাকে দেখেই মেয়ে ছুটে গিয়ে চুম্বন করলেন (এ দেশের এই রীতি; বাপমাকে ওইরূপ করেই ছেলেমেয়েরা অভিবাদন করে)

এবং বাপের হাত ধরে আমাদের সবার সামে এসেই বাপকে বল্লেন, "Father, your daughter feels very happy to-day, does not know why"—এই বলেই দিব্বি সুচঙ্গে দুই হাত বিস্তার করে মেয়ে খানিকটা নাচলেন। বাপ বেয়াদবি হচ্চে কি বেয়াড়াপনা হচ্চে বলে কিছুই বল্লেন না। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই কোন মেয়ে ও রকম করিতে ত কখনই সাহস করবেনা। আর যদিই বা কখন কেহ করে, ভূতে পেয়েছে বলে ওঝা এনে তাকে ঝাড়াবে, নয় ত যদি মনে করে, মেয়ে জেনেশুনেই ও রকম বেয়াদবি করেছে,তাহলে তেমন মেয়ের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাকে বনবাসিনী ক'রে দেবে। কেননা, যে মেয়ে বাপের সামে অন্য দশজনের সাক্ষাতে প্রকাশ্য পার্কে ও রকম লাফালাফি করতে পারে, সে মেয়ে কুলের কলঙ্ক!! সেদিন আরও একটী দৃশ্য চ'খের সামে পড়েছিল। সেটীও না বলে থাকতে পারলামনা। বোন (চৌদ্দ পনর বছর বয়স হবে) বাগানে খেলতে এসেছিলেন, তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে বাপ আর বড় ভাই সন্ধ্যার পর বাগানে এসেছেন। খেলা শেষ হয়ে গেলে বোনটী টেনিসের জুতো খুলে অন্য বুট পরছেন। এমন সময়ে বড় ভাই বোনের একপাটি জুতো নিয়ে ছুট দিলেন। এই আর কি,ভাই বোনে ঘোড়দৌড় পার্কের মধ্যে—সবার সাক্ষাতে, বাপেরও সাক্ষাতে। ছুটতে আর না পেরে, ভাই যে তার জুতো দিচ্চেনা, এই বলে মেয়ে বাপের নিকট নালিশ ক'রছে, ভাই নালিশের ভয় না করে, চাঁদের আলোতে হাতি খুলে, বোনের জুতো পাটী মাথার উপর নিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গীতে বোনের আগু আগু ছুটতে লাগল। খানিকক্ষণ এম্নি রহস্যের পর, আবার বোনটীর পায়ে জুতো পরিয়ে দিলে। আমাদের দেশে হলে, পিতা ছেলেকে কি করতেন? পাঠক, যদি আপনি পিতা হন, ইহার উত্তর দিন।

ছেলেরা বাপমার সাক্ষাতে বাপমার সঙ্গে এম্নি সব নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতে পায় বলে শৈশব পিতামাতাকে ক্রীড়ার সহচর, শিক্ষাগুরু ও পরম বন্ধুরূপে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয় বলে, ইংরাজের 'ঘর' ইংরাজের কাছে অতীব আদরের সামগ্রী। আর এমন আদর ও যত্নে, স্নেহে ও মমতায়, সরলতায় ও বিশুদ্ধতায়, অসংকোচ ব্যবহারে ও প্রমুক্ততায় লালিত পালিত হয়ে, ইংরাজ-সন্তানগণ নিজ 'ঘরের' সঙ্গে কতই না সুন্দর সুন্দর স্মৃতির বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে। পিতামাতার সুশিক্ষায় ও সুসঙ্গে অতি বাল্যকাল হইতেই ইংরাজ-শিশুর কোমল শরীরের ও সুকুমার মনের সৌষ্ঠব সাধন হয়, স্বাস্থ্যজনক বিকাশ হয় শিষ্টাচার, সদালাপ, চরিত্র গঠন, নানা বিষয়ণী অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রাণের অনিবার্য্য টানে, স্নেহের ঐকান্তিক আবেগে, হৃদয়ের একাগ্রতায় পিতামাতা সন্তানের উন্নতি কল্পে যেমন স্বাভাবিক চেষ্টা ও যত্ন ক'রবেন, সংসারে এমন আর কে ক'রবে? আমাদের দেশে পিতামাতা অনেকস্থলে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ভার অপরের হস্তে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হন। এজন্য কত যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তা আমি বিশেষ ক'রে আর কি ব'লব। এদেশে ছেলেদের উন্নতির ভার বাপমার হাতেই থাকে। শৈশব হতেই পিতামাতার নিজের স্নেহের ও আগ্রহের হস্তে ছেলের মনকে ও শরীরকে গঠন করেন; একটু খুঁত বা দোষ শিশুর কোমল প্রকৃতিকে স্পর্শ করিতে পারে না। মন্দ সংসর্গের কু-বাতাস ছেলেদের গায়ে লাগতে পায় না। ভাবুন দেখি, এরকম অবস্থায় ঘরের ছেলেরা যে সতেজ শরীর, মন সুস্থ ও বিশুদ্ধ হাবভাব, সমুন্নত ও উদার হৃদয়বিশিষ্ট হ'য়ে প্রকৃত মানুষের মত হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

ক্রমশঃ

শ্রীপতি রায়।

অনূদিত গ্রন্থ।

প্রতিভা যাহা, তাহা স্বতঃ ধর্ম্মপরায়ণা, কেননা, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সর্ব্বদেশীয় প্রতিভা সকল সময়ে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন এবং যেখানেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে, সেখানেই সমাজ উন্নত হইয়াছে। সুতরাং যেখানে সমাজের হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে ধর্ম্ম নরকাভিমুখে যাইতেছে। ভারতবর্ষ এই শেষোক্ত শোকাভিনয়ের রঙ্গস্থল—ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের চক্রান্তে বহুদিন হইতে এখানকার সমাজ ধর্ম্মচ্যুত, কেননা এখানকার সমাজ বহুদিন হইতে হীনবস্থ।

বৃটিশ শাসনের শান্তিময় ক্রোড়ে আসিলে, আপনাদের হীনাবস্থার বিষয় চিন্তা ও অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব মনে উদিত হইল যে, যখন আমরা হীনবস্থ, তখন আমরা বীতধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। যে সকল লোকের মনে এতাদৃশ দেশহিতকরী চিন্তা উদিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নামই প্রসিদ্ধ। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র-দ্বার অবরুদ্ধ রাখিয়া, খেলনক যেমন রুদ্ধ-দ্বার-গৃহে রঙ্গিলপটে গয়া কাশী বৃন্দাবন প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করে, সেইরূপ, ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে রঙ্গিল ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। যাহাতে সমাজে একতা ও সমতা এবং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মে সমান অধিকার জন্মে এবং ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত হইয়া যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মভিত্তি স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, যে বংশে তাঁহার জন্ম, সেই ব্রাহ্মণ বংশ অনেক দিন হইতে বর্ণভেদের কূটনীতি অবলম্বন করিয়া কেবল যে অন্যান্য হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মচ্যুত ও হীনবস্থ করিয়াছে, এমত নহে; জাতি সাধারণের হীনতার সহিত আপনারাও হীন ও পাপে লিপ্ত হইতেছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্রাহ্মণ-বংশ হইতেই কোন ব্যক্তির প্রাণপাতের প্রয়োজন। রাজা রামমোহন তজ্জন্য উন্মুক্ত হইলেন।

এই উদ্যোগের প্রারম্ভেই তাঁহার দৃষ্টি ক্ষত্র-প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভারতের প্রভুশক্তিশালী ক্ষত্রজাতির স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত যে অমূল্য রত্ন জগৎকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যাহার ইঙ্গিতক্রমে ভারতগৌরব দর্শনশাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে, সেই উপনিষৎ গ্রন্থগুলির অনুবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশ করাই তাঁহার প্রথম চিন্তা হইল। তিনি অকুতোভয়ে ও প্রভূত পরিশ্রমে অনেক উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, জননী বঙ্গভাষা তৎসঙ্গে যেন নৃত্য করিতে করিতে শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে রাজার জীবন-লীলা শেষ হইল, অন্য কোন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ তাহাতে যোগ দেন নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কেহই উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে যোগ দেওয়ার মূল্য বুঝিলেন না। বরঞ্চ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ-

প্রাধান্য ও বর্ণভেদ রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আপন আপন শক্তিকে স্বার্থের সহচরী করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রতিভা রাজা রামমোহন রায়কে সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহারা সেই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গের কায়স্থ সন্তান। সত্যের সংগ্রামে ইঁহারা কোন দিনও পরাঙ্মুখ নন। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সত্য যাহার পক্ষে, ক্ষত্র তাহার পক্ষে। দীর্ঘকাল হইতে শাস্ত্র-দ্বার রুদ্ধ থাকাতে সাধারণের ধর্ম্ম ক্রমে দাসত্বে পরিণত হইয়া যে অসত্য ও অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানে কি ক্ষত্র-ধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থগণ পরাঙ্মুখ হইতে পারেন? বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু মহেশচন্দ্র পাল অচিরে মহাভারত, পুরাণ ও উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি অনুদিত করিয়া দিয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে বলিলেন। সত্য বটে, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসুর সুলভ পুরাণ প্রচারে শাস্ত্রীয় উপকথার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু এই পুরাণ গ্রন্থগুলি তদপেক্ষা অধিকতর উপকথাময়ী কথকতার মূলোচ্ছেদ করিতে যত সমর্থ হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই সমর্থ হয় নাই। ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে, কে না জানে, গ্রামে গ্রামে কথক ব্রাহ্মণেরা সপ্তাহব্যাপী, পক্ষব্যাপী, মাসব্যাপী, ত্রিমাসব্যাপী বা ষণ্মাসব্যাপী কথকতা আরম্ভ করিয়া যেমন একদিকে হিন্দুর অর্থ শোষণ করিতেন, তেমন অপরদিকে সুর লয় তাল মানের সহিত কৌশলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া স্বাধীন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া দিতেন। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ, যোগেন্দ্রনাথের সুলভ পুরাণ ও শাস্ত্রানুবাদের পরে এই মিষ্টভাষিণী অথচ সর্ব্বনাশিনী কথকতা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ জন্য জাতি লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারে বঙ্গের কায়স্থ ও তদনুরূপ মধ্যবর্ত্তী হিন্দুগণ শাস্ত্রগ্রন্থ অনুদিত করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রকৃত উপকরণ সঞ্চয়ে দীর্ঘকালব্যাপী যত্ন করিয়া আসিতেছেন। ইহার এক মহাফল অবশ্যম্ভাবী। এই ফল নিকটবর্ত্তী করার মানসে এক মহা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, প্রতাপচন্দ্র রায়, মহেশচন্দ্র পাল, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি অনুবাদকগণ হিন্দুকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল হিন্দুর সত্য ধর্ম্মানুসন্ধানের জন্য আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়? কোথায় হিন্দু ধর্ম্মের মূল? কোথায় সে পবিত্র উৎস, যাহা হইতে এই বিপুল হিন্দুধর্ম্ম-সমুদ্র সমুদ্ভূত হইয়াছে? সেই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ—সেই প্রকৃত সত্য হিন্দুধর্ম্ম হস্তে লইয়া পরিশ্রমের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত। দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার বংশ যাহাতে ব্রতী ছিলেন, তিনি তাহা উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বেদ-সংহিতা অর্থাৎ ঋগ্বেদ অনুদিত করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মেতিহাস লিখিয়া দিয়া এবং পরিশেষে সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ ও তদনুবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুর যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহার সমুদায় তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। হিন্দু আর চাহিবে কি?

কোন অনুদিত গ্রন্থের সমালোচনা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু পাঠক মধ্যে

বর্ত্তী সম্প্রদায়ের এই শতাব্দীব্যাপী যত্নের প্রতি লক্ষ্য করেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে নিম্নস্তরের হিন্দুগণও ক্রমশঃ অনূদিত গ্রন্থ হইতে লাভবান হইতেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ এই অনুবাদ কার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন, ফলে তাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন মধ্যবর্ত্তী হিন্দুরা বিপুল হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সুতরাং সকল শ্রেণীর হিন্দুরই এই অনুবাদ গ্রন্থের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির মূলগ্রন্থ সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত হওয়ায় এত বিপুল ও স্থানে স্থানে এত বিরুদ্ধমতাবলম্বী যে, জাতীয় উন্নতির সহায়তার জন্য ইহার অত্যল্প অংশই আবশ্যক। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের "হিন্দুশাস্ত্র" এইরূপ অত্যাবশ্যক সার সংগ্রহ বটে, কিন্তু তাহা সমাজে ব্যবহৃত এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে, এই জাতীয় পরিশ্রমের, এই অনুবাদ কার্য্যের সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না। এজন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জন্য যে যে পন্থা অবলম্বনীয়, তন্মধ্যে বর্ণনির্ব্বিশেষে বাঙ্গলাভাষায় হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান এক অতি প্রয়োজনীয় পন্থা। (১) দুর্গোৎসবের সময় বাঙ্গালায় অনূদিত চণ্ডী, শ্রাদ্ধের সময় অনূদিত গীতা পাঠ হইলে এবং গৃহস্থ স্বয়ং ইহা পাঠ করিলে, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলে অধিকতর ভক্তিময় হন কিনা, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পঞ্চোপচারে বা ষোড়শোপচারে যে সকল পূজাপদ্ধতির নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে যাহা রক্ষণীয়, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় ও বর্ণ নির্ব্বিশেষের মুখে পঠিত হইলে জাতি লাভমান হয় কিনা, ধর্ম্ম ক্রমে উন্নত ভিত্তি অবলম্বন করে কিনা, বিবেচনা করা কি উচিত নহে? আমাদের সাহিত্য-পরিষদ অনেক গণ্য মান্য হিন্দুর মিলন বটে, কিন্তু তাঁহারা পাঠশালার পাঠ্য পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে জাতীয় ধর্ম্মকার্য্যে যাহাতে বাঙ্গলা ভাষা বেশী ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিলে বোধ হয় জাতি তাঁহাদের নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতে পারে।

এই সম্বন্ধে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থের এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের এই জাতীয় পরিশ্রম সফল করিবার জন্য তাঁহাদেরই অগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কৃষ্ণানন্দ ও বিবেকানন্দ এই অনূদিত গ্রন্থের ফল মাত্র। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে ধর্ম্মোপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতেছেন বা ছিলেন, সে রূপ ভাবে গৃহস্থের করা প্রয়োজনীয় নহে। কায়স্থ গৃহস্থ দেবার্চ্চন, দশবিধ সংস্কার, পার্ব্বণ ও যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যে স্বয়ং অনূদিত মন্ত্র ও অনূদিত গ্রন্থের ব্যবহার করিতে কেন কালবিলম্ব করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, এই কার্য্যগুলি কি প্রকার শোচনীয় ভাবে এখন তাঁহাদের গৃহে সম্পন্ন হয়? যে পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহারা বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা চাকরী ও অন্য ব্যবসায়ে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় লিপ্ত হইতেছেন, শুধু গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য যাঁহারা অবশিষ্ট, তাঁহারা অপকৃষ্ট হইতে অপকৃষ্টতার শ্রেণীতে নিমজ্জিত হইতেছে। ইহার অর্থ এই, হিন্দুগণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অন্তঃসার-শূন্য ছায়াভূতাবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হীনাবস্থার সংশোধন যদি অনূদিত গ্রন্থের উদ্দেশ্য না হয়, তবে উহা এক শ্রেণী বাতুলের কার্য্যই হইয়াছে বলিতে হইবে।

(১) নব্যভারত ১২শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ২৫০ পৃঃ।

ইংরেজ শাসনের সময়ে আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংশোধন করার যেরূপ অবসর পাইয়াছি, এরূপ অবসর আর আমাদের হইবে না। সুতরাং কালবিলম্ব ব্যতিরেকে কাজে হস্ত দেওয়া প্রয়োজন। কায়স্থগণ এই বিষয়ে সত্বর সাহসী হইবেন, আশা করা যায়, কেন না, কায়স্থগণই এবিষয়ে স্থায়ী যত্ন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজশাসনে যদি এ দেশের ধর্ম্মদাসত্ব উঠিয়া যায় এবং এই উপলক্ষে যদি কায়স্থের কিছু বীরত্বও প্রকাশ পায়, তবে উভয়ের পূর্ব্ব গৌরব বজায় থাকে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম। (৩)

"খ্রীষ্টান" বলিলে আমরা সংধারণতঃ খ্রীষ্টোপাসক নামক সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই আমরা 'খ্রীষ্টান' নামে বুঝিয়া থাকি। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বলিলে যিশুর ধর্ম্মই অমাদের স্মরণ হয়; সাধারণতঃ খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই অর্থ। কিন্তু জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া, আধ্যাত্মিক নয়নে, যখন এই শব্দের গুহ্য (Esoteric) অর্থের অনুসন্ধান করি, তখন ইহার অন্য অর্থ প্রাপ্ত হই। পারস্য-সাহিত্যের সেই অমর কাব্যকারের জগৎ-প্রসিদ্ধ শ্লোকটী তুলিয়া আবার বলিতেছি।

"চশম্ কুশা বাসদং দিদায়ে মানী বেয়ার।"

হে অন্ধ মানব! কুসংস্কার ও ভ্রমবিশ্বাস ছাড়িয়া দিব্যচক্ষুর সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত অর্থ সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে সুকঠিন অথবা অসম্ভব হইবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম—The religion of Christ or Christianity itself—খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বলিয়া সংসারে উন্নতি লাভ করে নাই, একথা পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি; খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অন্য নাম পরিবর্ত্তন! কথাটা কিছু বুঝিলে কি? কথাটা শুনিয়া অনেকে হয়ত ইহাকে প্রহেলিকা বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এস্থলে কোনও ভারতবর্ষীয় লেখকের বিরচিত কোনও প্রবন্ধ হইতে একটু ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, বোধ হয়, এই ইংরাজী টুকু পড়িলে শিক্ষিত পাঠক মহাশয় "পরিবর্ত্তন" শব্দটার কিছু আভাষ পাইতে পারেন। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

"When we open the eyes of our understanding, when our *inner man* awakes, and we look deep into the esoteric mean ing of the term Christianity not with our corporeal, but with our spiritual eyes, we find that something else is concentrated in the focus of Christianity, we find an altogether different (and secret) though not altogether new meaning of the term The esoteric and true meaning of Christianity is **Change** a thorough change-wholesale change marvellous change. If Christianity is not **Change,** then I do not know what it is. Christ Himself is **Change,** christianity itself is **Change.**"

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য খ্রীষ্টানের বাইবেল হইতেই একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। এই অপরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অতুল; পৃথিবীর কোথাও এ দৃষ্টান্ত আর নাই। ধর্ম্ম-সাহিত্যাকাশে এই দৃষ্টান্ত অত্যুজ্জ্বলতম নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের কাছে অপর সকল নক্ষত্র হারি মানে। পুরাণে, কোরাণে, বেদে বা বৌদ্ধ-গ্রন্থে, বাবা নানকের গ্রন্থে অথবা দাদুর দোঁহায়, জৈনের ধর্ম্মশাস্ত্রে বা অগ্নি-উপাসকের জেন্দাবস্তায় কোথাও এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। এই দৃষ্টান্তটা পড়িবার যোগ্য; এই দৃষ্টান্ত স্মরণ ও চিন্তার বিষয়।

এই দৃষ্টান্তাপেক্ষা অধিকতর মহামূল্যবান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে দেখি নাই।

সম্রাট অগস্টস (Augustus) নামক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির শাসনকালে টার্টশ (Tarsus) নামক নগরে সল (Saul) নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। (১) এই সল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মহাশত্রু ছিলেন। এই ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বদা এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিত। যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত বা বিস্তৃত না হয়, তজ্জন্য এই ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছিল। অসংখ্য খ্রীষ্টোপাসক ইহার হস্তে নিহত, অপমানিত, বিকলাঙ্গ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাহাকে প্রস্তর ছুড়িয়া, কাহাকে অগ্নি দ্বারা দাহ করিয়া, কাহাকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া, কাহাকে জীবন্ত ভাবে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া, খ্রীষ্টান-বিরোধী সল খ্রীষ্টোপাসকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। খ্রীষ্টোপাসনার বিরুদ্ধে এই ব্যক্তি রীতিমত "উঠিয়া পড়িয়া" কোমর বাঁধিয়াছিল। খ্রীষ্টানকুল নিহত করা তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য ও প্রধান আনন্দ ছিল; খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেওয়া এবং খ্রীষ্টানের চিহ্ন পর্য্যন্ত না রাখা ইহার প্রতিজ্ঞা ছিল। সল সামান্য লোক ছিলেন না; একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত সওদাগরের পুত্র। ধন ধান্যে ইহার প্রাসাদ পরিপূর্ণ ছিল। সল নিজে মহা বিদ্বান, সাতটা ভাষায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত, উচ্চ দরের লেখক, মহা তার্কিক, নিতান্ত প্রতাপী পুরুষ এবং অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় বক্তৃতা শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য যুক্তি সুন্দর মূর্ত্তি স্বদেশবৎসলতা, স্বধর্ম্মপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণে তিনি আসিয়া মহাদেশে এক মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে আসিয়ায় খ্রীষ্টানের নানা বৈরী ছিল, সুতরাং সলের খ্রীষ্ট বিদ্বেষিতা দেখিয়া সলের অনুচরের সংখ্যা খুব বাড়িয়া উঠিল। সম্রাট নিরো অথবা শাসনকর্ত্তা প্লীনি (Pliny the Junior) অসংখ্য খ্রীষ্টানদিগকে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মহীরুহের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারেন নাই; মূলে কুঠারাঘাত করা সলের (অর্থাৎ পলের) মূল উদ্দেশ্য ছিল। শারীরিক বলে, ধনবলে, যুক্তি ও বিদ্যাবলে, বাগ্মীতা ও চতুরতা বলে, প্রভুত্ব ও পরাক্রমের সাহায্যে, সল বাস্তবিক বড়ই বিক্রমী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সলের পরিণাম কি হইয়াছিল, একবার দেখা উচিত।

একদা এই পল (সল) দামাসকাস (Damascus) নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা, খ্রীষ্টীয় মতের বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত করা, এই নগরে সমবেত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে গ্রেপ্তার করিয়া রাজার নিকটে শাস্তিদান করা এবং খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে নিহত করা তাঁহার দামেসকাস নগরে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল। দেশের ধর্ম্মাধিকার (High priest) এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আইন মত পলকে পরোয়ানা দিয়াছিলেন, ঐ পরোয়ানা বলে দেশের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব সমাজে পলের "অধি-

* বাইবেলান্তর্গত New Testament অংশের The acts of the apostles ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোক হইতে ২৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠকর।——লেখক।

(১) এই সল পরিণামে সাধু পল (St. Paul) নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হয়েন। নিউটেষ্টামেণ্টে ইহার চতুর্দ্দশ পত্র (epistles) পড়িলে পলের পরিচয় পাইবেন।—লেখক।

কার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পরোয়ানা সম্রাটের পরোয়ানা তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে; ঐ দেশের নিয়মানুসারে ধর্ম্মাধিকার (High priest) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে সম্রাট হইতেও অধিকতর ক্ষমতা-সম্পন্ন। খ্রীষ্ট-বিরোধী পল মহাদম্ভের সহিত সদলে দামাসকস নগরে যাইতে যাইতে নগরের কিয়দ্দূরে দেখিলেন, আকাশের চারিদিকে এক অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় আলোকের দিব্য শোভা জন্মিয়াছে, এই আলোক দেখিয়াই পলের গতি বন্ধ হইল। পল শুনিলেন, কেহ যেন বলিতেছে "Saul (সল!)" পলের রোমাঞ্চ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আবার শুনা গেল—(সল!) এবারে এই শব্দ শুনিয়াই পলের কম্পিত শরীর ভূমিতে পতিত হইল। এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় আলোকের মধ্য হইতে আবার যেন পলের পরিচিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—

"সল্! সল্! টী মে ডিয়ো কিস্?" (১)

অর্থাৎ তুমি কেন আমার পিছে পড়িয়াছ? অথবা "আমার বিরুদ্ধে কেন চেষ্টা করিতেছ? পল জিজ্ঞাসা করিল—

"আইপেন্ ডে টিশ্ আই, কিউরিয়স্।"

(Who art thou, Lord?)

অর্থাৎ "আপনি কে প্রভু?" পলের এই প্রশ্নটীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রীক কিউরিয়স্ শব্দের অর্থ—

"A Lord, possessors of, and having power over."—*Vide* S. G. Green's 'Handbook to the Grammar of the Greek Testament,' Revised edition, page 462. (Vocabulary) অর্থাৎ কিউরিয়স্ অর্থে "মালিক অধিকারী প্রভুত্বশালী" ইত্যাদি বুঝায়। পল বুঝিয়াছিলেন, ইহা কাহার স্বর! তিনি জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান করিলেন না, এই স্বর কোনও মিত্র বা শত্রুর কিনা; ইহা কোনও পশু, পক্ষী, মানব বা দানবের স্বর কিনা, তাহা তিনি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সমর্থ না হইলে "কিউরিয়স্" উপাধিতে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিকে অভিহিত করিলেন কেন? সুশিক্ষিত পল জানিলেন, ইহা রাক্ষস বা দৈত্যের স্বর নহে, ইহা পশু বা পক্ষীর স্বর নহে, ইহা মানব বা দানবের স্বর নহে; ইহা মনুষ্যাতীত কোনও মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর। পলের আবার রোমাঞ্চ হইল, পলের পরিবর্ত্তন ঘটিল। পল আর সে খ্রীষ্ট-বিরোধী পল নাই। এই স্থানে একজন লেখকের একটু ইংরাজী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"The word *Kurios* here testifies to the fact that Saul (otherwise called Paul) with his keen insight and superior intellectual culture, was able to understand that it was not the voice of giant like bimself, it was not the voice of giant like one of the Zam Zammunings of the Old Testament, nor of a huge animal like the leviathan, nor was it the voice of an apparition like that of Hamlet, the father of the prince of Denmark, but that it was the voice of one who was in the beginning **one** and is always **one** and shall continue to be **one** without body, parts or passions; that it was the voice of the **Word** of God that was made flesh and blood for the salvation of the whole world. Saul changed; there was no more lying down on the earth of the anti-Christian and fanatic Paul; there was the lying down the servant of Christ. The two words *Saul, Saul*, changed the whole man: every inch of the man underwent a thorough change; his heart, soul and mind, his ideas of christianity, his views of christian religion, his superisti tions and prejudices against Christ—everything underwent a change."

পল বুঝিয়াছিলেন, ইহা মহামতি যিশুর কণ্ঠস্বর; অমনি সেই পাপাত্মার সর্ব্বশরীর প্রেমে ও প্রীতিতে পূর্ণ হইল, সেই আকাশালোকে শিশুর স্বর্গীয় জ্যোতি সম্মুখে দেখিয়া, চুম্বক সম্মুখে লৌহ যেমন আকর্ষিত হয়, পলের

(২) এই কয়েকটী কথা মূল গ্রীক বাইবেল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; ইংরাজি অনুবাদ Saul! Saul! Why persecutest thou me?

চিত্ত তেমনি আকর্ষিত হইল। সে প্রেম ও শান্তির অবতারকে সম্মুখে পাইলে, অশান্তি ও অপ্রেম কি আর থাকিতে পারে? পল তাহাতেই বুঝিয়াছিল, এই স্বরকর্ত্তা 'প্রভু' (Kurios), তাহাতেই প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। চিত্তের আরও দৃঢ়তা জন্য পল যখন জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কে প্রভু?' যিশু উত্তর দিলেন—

"I am Jesus whom thou persecutest."
[ইংরাজী বাইবেল।]

অর্থাৎ "তুমি যাহার পাছে পড়িয়াছ, আমিই সেই যিশু।" যিশুর এই উত্তরে আমরা যিশুর চরিত্রের একটু নমুনা পাইতেছি। অত্যাচারিত ব্যক্তি যখন অত্যাচারীকে আপনার সম্মুখে দেখে, তখন অপমান, নির্যাতন অথবা প্রতিহিংসার সুবিধা পাইলে, প্রায়ই সে সুবিধা ছাড়ে না। এখানে দেখ, মহামতি যিশু আপনার মহাবৈরীকে সম্মুখে পাইয়া শাণিত তরবারী দ্বারা বশীভূত করিলেন না; আত্মময় যিশু আত্মিক বল দ্বারা, প্রেমের অবতার প্রেমের দ্বারা, কঠোর-হৃদয় সলের হৃদয় গলাইয়া দিলেন; সল প্রেমে গদগদ হইল। সুকণ্ঠে, প্রেমের ভাষায়, যিশু বলিলেন "সল! সল! কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ; যাহার দরিদ্র উপাসকদিগকে নির্য্যাতন করিতেছ, আমি সেই দরিদ্রতর হইতে দরিদ্রতম যিশু।" মূল গ্রীক বাইবেল পড়িলে এই ভাব পাওয়া যায়। বল দেখি, কি বিনয়! কেমন নম্রতা! কেমন সরলতা! বলদেখি, খ্রীষ্ট কি প্রেমের পূর্ণতরী নহে? এই ঘটনার মধ্যে প্রেমের অবতারকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা কর। আবার পল বলিল, "প্রভু! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন?" প্রভু বলিলেন, ওঠ্ নগরে যা, সেখানে যাহা কিছু করিতে বলা হইবে, তাহা করিস্।"

[Arise, and go unto the city, and it shall be told thee what thou must do."—*English New Testament.*]

এখানে আমরা যিশুর কোমল স্বর দেখিতেছি না; ভৃত্যের প্রতি প্রভুর প্রভুত্বপূর্ণ যে স্বর, সেই স্বরে যেন যিশু আজ্ঞা করিতেছেন কারণটা বুঝা উচিত। কোনও লেখক লিখিয়াছেন —

"This tone is a commanding tone, and the tone and the language are both nicely appropriate here. Saul is now no more Saul the anti-Christ, he is changed, he is now a servant of Jesus, he has already unconditionally surrendered himself to Christ and accepted Him as his *Lord* The Lord has already taken possession of Saul's heart and become absolute **Master** of that man, and hence the imperative language is now used by the **Master** to his servant.'

পল এখানে খ্রীষ্টে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, যিশু এখন তাঁহার প্রভু, পল এখন যিশুর ভৃত্য, সুতরাং ভৃত্যের প্রতি প্রভু আজ্ঞা করিতেছেন বলিয়া ভাষার ও স্বরের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি।

যাহা হউক, এই জগদ্বিখ্যাত খ্রীষ্টবিরোধী পল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মহাপোষক হইয়া উঠিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের প্রচার, বিস্তৃতি ও সংরক্ষণ জন্য দেহ,মন ও আত্মাকে উৎসর্গ করিলেন। ক্রমে ইনি এত বড় প্রচারক হইয়া উঠেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এতদপেক্ষা অধিকতর গৌরবশালী প্রচারক আর জন্মে নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রথমে প্রথমে ইনি যে ক্ষতি করিয়াছিলেন, পরে তাহার সহস্রগুণ অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে (New Testamentগ্রন্থে) পলের নাম ও কীর্ত্তি সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; পলের চরিত্র জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষের চরিত্র বলিয়া বর্ণিত আছে; ইনি ক্রমে (সেন্ট্) সাধু পল বলিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন। পলের 'যশ-কুসুমের সুগন্ধে অনেক মানব-ভ্রমর যিশুর মনোহর

উদ্যানে বাস করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। পলের চরিত্র আদর্শ চরিত্র। পলের নামে অসংখ্য বিদ্যালয়, দেবমন্দির এবং রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; পলের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির পদতলে পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটেরা স্বর্ণ মুকুট রাখিয়া সভক্তি পূজা করিতেছে। পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে পলের নামে জয়ডঙ্কা বাজে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় পলের জীবনচরিত প্রকাশিত। পলের খ্রীষ্টীয়-জীবন-সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী মহাপুরুষের জীবনের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পরোপকার, জ্ঞান প্রচার, বিদ্যার চর্চ্চা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতিতে পল অদ্বিতীয় ছিলেন। পলের তুল্য খ্রীষ্টোপাসক জগতে বিরল; পলের তুল্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক ও পোষক পৃথিবীতে আর কেহ হয় নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন !! খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পলের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের অপূর্ব্ব ইতিহাস ভিন্ন আর যদি কোনও ইতিহাস না থাকিত, তাহা হইলেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি প্রমাণ করিবার জন্য কষ্ট করিতে হইত না। কেবল এই একটা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন শক্তির পূর্ণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, হিন্দুর বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে এমন আর একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ কি ? কোরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া হদিষ সরিফ পর্য্যন্ত, মুসলমানের কোনও গ্রন্থে এমন আর একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ কি ? সত্যকথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে, "না" বলিতে হয়। এই স্থানে আর একটু ইংরাজি রচনা উদ্ধৃত করিবার জন্য পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"It has been shown rather an instance has been given which helps to prove that Christianity works a thorough, a wholesale, a marvellous change in a man. It makes the whole man a new man, this is the utmost beauty, the utmost pride of Christianity. A religion that does not and can not change a sinner and bring him unto repentance and make him thirsty for the water of everlasting life, a religion which cannot make a change in the man who embraces it, a religion which cannot change a sinner and make him a *Washed man*, is no religion at all; call it a grand philosophy, call it an abstruse science, call it an art, call it a mechanism, I have no objection to that; but, pray, most humbly and respectfully I pray, do not call it a" **Religion** in any sense of the term. Religion is something which reconciles a lost or fallen man to his **Maker** and without change of a sinful heart this is impossible. Christianity is a religion —The Religion—because it works change, thorough change, wholesale change, marvellous change."

এই পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অনন্যসাধারণ জয়লাভের ও কৃতকারিতার মূলীভূত কারণ। শুনা যায়, অহল্যা পাষাণ হইয়াছিল, রামের পদস্পর্শে মানুষরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। "মানুষরূপে পরিবর্ত্তিত হইল" যদি একথা বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা এই, পাষাণের পাষাণ-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কি ? অহল্যা, অভিশাপে পাষাণ হইয়াছিল, উদ্ধার হইয়াও পাষাণ হৃদয়ে জীবন কাটাইয়াছিল। চৈতন্যের প্রেমে মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল শুনিয়াছি, কিন্তু জানা উচিত Faith is justified by works of righteousness. উদ্ধারের পরেই জগাই মাধাই অদৃশ্য !! আর জগাই মাধাইয়ের একটা কথাও শুনি নাই, একটা কার্য্যও দেখি নাই। ভক্তের কার্য্য কি লুকাইয়া থাকে ? খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা বাইবেলের পংক্তিতে পংক্তিতে পরিচয় পাইবে। আমি সহস্র দৃষ্টান্ত দিয়া, সহস্র অকাট্য প্রমাণ দিয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণ

করিতে পারি। বাংলা ভয়ে করিব না; বাইবেল না পড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিও না। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ভক্তিমান Martyrs দিগের অত্যাশ্চর্য্য জীবনোৎসর্গ দেখিয়া শত সহস্র খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী খ্রিষ্টোপাসক হইয়া পড়িয়াছে। "Church history" পড়িয়াছ কি? "Thirty nine articles of the Christians" পড়িয়াছ কি? পেণ্টেকস্ট্ (Pentecost) উৎসবের সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ রাখ কি? এক দিনে তিন সহস্র খ্রীষ্ট-বিরোধী ও খ্রীষ্টান বৈরীর সরল হৃদয়ে খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ!!

> "On the day of Pentecost, we see that three thousand souls were converted on one day and at the same time. No history, no literary work, no sacred book of the farther East could even imagine such an ideal marvellous change of sinful hearts"

লেখক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন:—

> "Three thousand men permanently raised from death in sin to a life of holiness; Three thousand new made saints enabled day by day to walk in the fear of God. Three thousand weak and sinful by nature, maintaining a life in the body marked with godliness and purity. This spectacle of Pentecost speaks in deepest tones to the heart. Here we see in practical demonstration, human beings redeemed our nature recovered from sin—not in a solitary convert, but in hundreds and thousands of men with ordinary hearts, wants and employments."

জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি পাইবার জন্য, রাম বা কৃষ্ণের নিকট কেহ পশ্চাত্তাপিত হইয়া আসিয়াছিল কি? পাপ ও পাপের পরিত্রাণ (sin and salvation) এই দুইটী কথার মীমাংসা, রাম বা কৃষ্ণ করিয়াছেন কি? রাম ও কৃষ্ণের শক্তিতে কোনও মহাপাপীর উদ্ধার, পরিত্রাণ, মুক্তি ও পূর্ণ সংশোধন হইয়াছিল কি? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মহম্মদ, রাম, কৃষ্ণ অথবা জিহুদেবের নিকটে কোনও পাপী পশ্চাত্তাপিত (Repentant or penetant) হইয়া পাপোদ্ধার জন্য সরল হৃদয়ে আসিয়াছিল? অবতার বলিয়া ইঁহারা এক সময়ে গণ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিসের অবতার? প্রেমের বা শাস্তির?

পাঠক মহাশয়! আপনার দৃষ্টি আমি এক্ষণে আর একদিকে লইয়া যাইতেছি। ভারতের সাঁওতাল, গোন্দ, ভীল, খসিয়া, গারো, হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, পরিয়া প্রভৃতিকে দেখিয়াছ কি? ইহারাই ভারতের আদিবাসী; ইহাদেরই হাত হইতে আমাদের আর্য্য পিতামহেরা ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ভারতের হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতিরা যে দুর্গা কালী গণেশ ইত্যাদির পূজা করে, ব্রাহ্মণেরা সেই সকল মূর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকে। উভয়েরই হিন্দু ধর্ম্ম এক, উভয়েই সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহারা সে কালে যেমন অসভ্য, বর্ব্বর, পতিত এবং অকর্ম্মণ্য ছিল, একালেও ঠিক তেমনি রহিয়াছে। ত্রিসহস্র বর্ষের ভীল বা দ্বি সহস্র বর্ষের হাড়ী, তখনও যেমন, এখনও তেমনি!! হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাবে কোনও উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে কি? চীনে, জাপানে, তিব্বতে দুই সহস্রাধিক বর্ষকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছে, চীনের সেই conservatism, তিব্বতের সেই Inflexible superistition এবং জাপানবাসীর সেই What is not budhistic is hellish ভাব ঘুচিয়াছে কি? খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের প্রদীপ এই সকল দেশে ও জাতিতে অতি অল্পদিন অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্ষ হইতে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোকের প্রভাবে, ভীল, গারো, সাঁওতাল, পরিয়া, হাড়ী, ডোমের সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ সংসাধিত হইয়াছে ও

হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখ কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে ইহাদের অনেকে এখন পাণ্ডিত্যে দিগ্‌গজ, সমাজের নেতা, ধনে কুবের, উচ্চপদে আরূঢ় এবং আধ্যাত্মিক বলে মহা-বলবান। ইহাদের অনেকে এখন ভারতের ভূষণ! ইহাদের অনেকে এখন মানব সমাজের মহোপকারী অঙ্গ। হিন্দুর প্রভাবে দশ সহস্র বর্ষেও পতিত শূদ্রের উদ্ধার নাই। চীনের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়াছে, তির্ব্বতের কুসংস্কার ঘুচিতেছে এবং সেই অজ্ঞাত অসভ্য জাপান খ্রীষ্টধর্ম্মবলে এখন পৃথিবীতে "Rising sun of the east" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সত্য কথায় বলিতে হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্ম পরেশ পাথর, ইহা চুম্বক প্রস্তর, ইহা আলি বাবার Open seasame!! সহস্র বর্ষে অন্য যাহা পারে নাই, শতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহা সফল করে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই অসাধারণ—এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করিবার শক্তিই ইহার উন্নতি, বিস্তৃতি, এবং জয় লাভের মূল কারণ।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

দার্শনিক মতভেদ। (৬)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে শ্রুতির প্রমাণানুসারে দেখাইয়াছি, অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতের "অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান" কারণ। এ কথা কত দূর লৌকিক যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয়। আমাদের মীমাংসকগণ (জৈমিনি, ব্যাস, প্রভৃতি) শুদ্ধ শ্রুতি বাক্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া মীমাংসা করেন নাই, সেই মীমাংসা সকল লৌকিক যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত করিয়াছেন।

শ্রুতিতে সগুণ (conditioned) ও নির্গুণ (unconditioned) ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মই নিরাকার, নির্বিশেষ, অরূপ, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, এবং শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। সগুণ ব্রহ্ম সাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং নানা ঐশ্বর্য্যময় হইয়া নানা রূপে ব্যক্ত। এই সাকার ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ। এক রূপে তিনি অমূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম সাকার, অন্য রূপে তিনি মূর্ত্ত ও স্থূল সাকার। অমূর্ত্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং মূর্ত্ত ব্রহ্মই জীব * নামে অভিহিত। তাঁহার এই সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপই তাঁহার উপাদান কারণ। এক্ষণে কথা এই, যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও নিরাকার, তিনি আবার সগুণ, সবিকার ও সাকার হইলেন কি রূপে? একবার বলিতেছ তিনি নির্গুণ; আবার বলিতেছ—সগুণ, এ কথা কি যুক্তিসঙ্গত? যদি হয়, বেদান্ত তাহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। বেদান্তের সেই মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে, শ্রুতি যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম বেদান্ত দর্শনে কিরূপ নির্ণীত হইয়াছে, সংক্ষেপে, অগ্রে তাহাই বলিতেছি।

আচার্য্য শঙ্কর, তাঁহার শারীরিক ভাষ্যের এক স্থানে বলেন :—

"দ্বিরূপংহি ব্রহ্মাবগম্যতে। নামরূপবিকারভেদো-পাধি-বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্।"

১।১।১১ ব্রহ্মসূত্রেরভাষ্য।

"শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম অভিহিত হইতে দেখা যায়—এক সগুণ, আর এক নির্গুণ। যাহা সগুণ, তাহা নামরূপ বিকারভেদ-উপাধি বিশিষ্ট, যাহা তদ্বিপরীত তাহাই নির্গুণ।"

---

* বেদান্তে জীব শব্দ তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল সৃষ্ট পদার্থেই ব্যবহৃত হয়। এক ব্রহ্ম-উপাদানে সকলই সৃষ্ট, সুতরাং সকল মূর্ত্ত পদার্থই জীব। এবং তন্নিহিত আত্মাই জীবাত্মা। ১।৩।৩০ ব্রহ্মসূত্রের শারীরিক ভাষ্য দেখ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে, আচার্য্য অগ্রে সগুণ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, তিনি নাম রূপাত্মক উপাধি-বিশিষ্ট। অগ্রে সগুণ ব্রহ্ম কি, বলিয়া নির্গুণ যে তাহারই বিপরীত, তাহাই বলিয়াছেন। কারণ, নির্গুণের বাক্যার্থই তাই। শ্রুতিও নির্গুণকে সেই রূপ নিষেধপর বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। আমাদের যে সামান্য জ্ঞান, তাহা এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের রূপ ও গুণ-জ্ঞান মাত্র। সেই রূপ ও গুণ-জ্ঞান সমস্তই সীমা-বিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। সেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে আমাদের মানসপুর পরিপূর্ণ। সেই জ্ঞানালোকপূর্ণ মানসচক্ষে আমরা তদ্বিপরীত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিনা। সেই জ্ঞানের বিপরীত যাহা, তাহাই অবশ্য নির্গুণ হইতেছে। সুতরাং, তাহা মানসিক জ্ঞানের—ইহা নহে, উহা নহে,—এরূপ কথায় বলিতে হয়। শ্রুতি তাই সেই নির্গুণকে "নেতি নেতি" বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি কি জাগতিক কোন পদার্থ-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে চাও—ইহা ব্রহ্ম; শ্রুতি বলিলেন, না—"নেতি"। তবে যদি সে পদার্থকে ছাড়িয়া দিয়া তুমি পদার্থন্তরকে বল—ব্রহ্ম উহা; সে কথায় ও শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম উহাও নহেন—"নেতি।" শ্রুতি এই রূপ দুই বার "নেতি" বলিয়া জাগতিক সমস্ত জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলেন। দুইবার এই "নেতি নেতি" বলিবার অন্য কারণও আছে।

২। আমাদের মানসপুর যে প্রকার রূপ ও নামাত্মক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, আমাদের বাক্যেও তাহাই প্রকাশিত হয়। বাক্য কখন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাত্মক কথা ভিন্ন অন্য কথা জানে না। কারণ, যাহা মনে নাই, তাহা বাক্যে আসিতে পারে না। তাই, যাহা নির্গুণ, তাহা বাক্য-মনের অগোচর। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, তাহাকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য সুতরাং দুই বার "নেতি নেতি" বলিতে হয় *। যিনি শ্রুতিতে "আবাঙমনসগোচর" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বাস্কলী বাহ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করান।" তখন তাঁহার উত্তরে বাহ্ব কেবল নিরুত্তর হইয়াছিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলে আবার নিরুত্তর হইলেন। তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্ব বলিলেন, আমি ব্রহ্ম কি, তাহা ত তোমাকে বলিয়াছি, যিনি বাক্য-মনের অগোচর, তিনি কোন বাক্যে প্রকাশিত হয়েন না বলিয়া আমি তিরুত্তরতা দ্বারা তোমার কথার উত্তর দিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না—"এই আত্মা উপশান্ত।" তিনি নির্ব্বিশেষতা হেতু বাক্যপথের অতীত। সুতরাং কি কথায় তাঁহাকে বুঝাইব।

৩। নির্গুণকে এইরূপ সগুণ হইতে পৃথক করিয়া বেদান্ত তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন, সেই নির্গুণকে প্রতিপাদন করিবার জন্যই জগতের এই স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ। সেই সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মের অমূর্ত্ত এবং স্থূল রূপ ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। নির্গুণ সেই দ্বিবিধ রূপেরও অতীত। তিনি মূর্ত্ত নহেন, অমূর্ত্তও

* এই "নেতি নেতি"-শ্রুতি ব্রহ্মাস্তিত্বের অভাব বলেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মপ্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। শঙ্কর বলেন:—অতঃ প্রতিপাদনপ্রক্রিয়া যেষা—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—ইতি-শারীরিকভাষ্য—৩।২।২২।

নহেন। তাই দুইবার "নেতি 'নেতি" বাক্যে তিনি অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে আছে :—

"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।" ৩।২।২২

"যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপ্য (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্ম তদরিক্ত—সেই হেতু স্থির হয়, পরমার্থ কল্পে তাঁহার রূপাদি নাই। পরমার্থকল্পে তিনি কেবল সৎস্বরূপে বিদ্যমান।"

যিনি এই মূর্ত্ত জগতের অতীত হইয়া কেবল সৎস্বরূপে বিদ্যমান, তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবার জন্যই ব্রহ্মের এই জগৎ-রচনা। এই জগৎ দিয়াই তাঁহাকে জানিতে হয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল --Phenomenal তাহার অতীত অপরিবর্ত্তনীয়—Absolute তাঁহাকে জানিতে হইলে অগ্রে জগৎ কি, তাহা জানিতে হয়। যখন এই জগতের অনিত্যতা অন্তরে সম্যগ্‌রূপে স্থাপিত হয়, তখন ব্রহ্ম নিত্য সৎরূপে প্রতিপন্ন হন। অগ্রে অনাত্মজ্ঞান (Non-Ego), তৎপরে আত্মজ্ঞান Egoism। সেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিবার জন্য অগ্রে তাঁহার সগুণ রূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। এই সগুণ ব্রহ্মই ব্রহ্মের তটস্থ Approachable লক্ষণ। তাই এই জগতের অনিত্য পদার্থ দিয়া সেই নিত্য বস্তুকে বর্ণন করিয়া ব্রহ্মসূত্র প্রারম্ভেই বলিলেন :—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

"এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়, যাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।"

তৃতীয় সূত্রও তদ্রূপ তটস্থ সমীপস্থ লক্ষণ :—

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।"

বেদান্ত শাস্ত্র যাঁহাকে প্রচার করিতেছে, এবং যিনি সমুদায় শাস্ত্রের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। অগ্রে এই সগুণ ব্রহ্মকে জানিলে তবে নির্গুণকে জানা যাইতে পারিবে বলিয়া আর্য্য-ধর্ম্মে নিম্নাধিকারির নিমিত্ত মূর্ত্তিপূজা ব্যবস্থিত হইয়াছে। প্রথমে স্থূলমূর্ত্তি দিয়া ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বোধগম্য * হইলে তাহার সূক্ষ্ম শক্তিময়রূপে মন নিয়োজিত হয়। সেই সূক্ষ্ম মানসিক সাকার পূজায়ও তাঁহার সূক্ষ্মরূপের সমাবেশ থাকে। ক্রমে উপাসক সেই সূক্ষ্ম রূপেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রতিষেধ দেখিতে থাকেন। যাঁহার ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মাণ্ডময়, তিনিই বিরাট ব্রহ্ম বটেন, কিন্তু তিনি কি সেই ঐশ্বর্য্যরূপী হইয়া নিঃশেষ? তিনি যে সেই ঐশ্বর্য্যেরও পর-পারে। তখন উপাসক তাঁহার ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিও পরিহার করিতে সাধনা করেন। তৎপরে তিনি ধ্যানে ও নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে ব্রহ্মের নির্গুণ সত্ত্বে উপনীত হইয়া তাঁহার স্বরূপ অনুভব করেন। আর্য্যশাস্ত্রে ও আর্য্য ধর্ম্মে এই উপাসনা-পদ্ধতি নিয়োজিত। নিয়োজিত কেন? তদ্দ্বারাই ব্রহ্ম নিরূপিত এবং স্বরূপে সাক্ষাৎকৃত (Realised) হয়েন। তাই, ব্রহ্মসূত্র অগ্রে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ দিলেন, তৎপরে তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিরও প্রতিষেধ করিয়া বলিলেন—ব্রহ্ম তদতিরিক্ত বস্তু। তিনি রূপ-নামের অতিরিক্ত সত্ত্ব। তিনি কেবল সৎস্বরূপ।

বেদান্তে ব্রহ্ম প্রতিপাদনের এই যুক্তি। এই যুক্তি শুদ্ধ অনুমান মাত্র নহে। সেই অনুমান প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সিদ্ধ—Realised। এই প্রত্যক্ষে রূপ-নাম তিরোহিত হইয়া কেবল নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র সাক্ষাৎকৃত হন। শুদ্ধ অনুমান-যুক্তিতে সেই নির্গুণ নিত্য সত্ত্ব

* "দেবসুন্দরী"তে আমি এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

(The Absolute) কি রূপে প্রতিপাদিত হন, পণ্ডিত Herbert Spencer তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তির সার মর্ম্ম এই :—

"Observe in the first place, that every one of the arguments by which the relativity of our knowledge is demonstrated, distinctly postulates the positive existence of something beyond the relative. To say that we cannot know the Absolute is, by implication, to affirm that there *is* an Absolute. In the very denial of our power to learn what the Absolute is, there lies hidden the assumption that *it is* and the making of this assumption proves that the Absolute has been present to the mind, not as a nothing, but as a *Something*.
First Principles P. 88

স্পেন্সার সমুদায় অন্তর্বিজ্ঞান ও বাহ্যবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন দ্বারা এই অজ্ঞেয় পরম তত্ত্বের অনুমানে উপনীত হইয়াছেন। একথা আমরা বৈশাখের "নব্যভারতে" আলোচনা করিয়াছি। তিনি সমগ্র বিজ্ঞান রাজ্য আলোড়ন করিয়া যে অনুমানে উপনীত, তাহা ভেদজ্ঞানীর চরম সিদ্ধান্ত বটে, কিন্তু তাহা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অনুমান লইয়া বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভ। যাহা ভেদজ্ঞানী পণ্ডিত এবং স্পেন্সারের শেষ সিদ্ধান্ত, তাহা বেদান্তের সূত্রপাত। স্পেন্সার যে তত্ত্ব সমুদায় বাহ্য বিজ্ঞান রাজ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বেদান্ত তাহা এক সূত্রেই (জন্মাদ্যস্যযতঃ) সন্নিবেশিত করিয়া আত্ম পদার্থের সহিত অনাত্মের প্রভেদ দেখাইয়া নিত্য আত্ম পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলেন। পরসূত্রে (শাস্ত্রযোনিত্বাৎ) সেই অনুমানের অপর প্রমাণও দিলেন। এই দুই সূত্রে বাহ্য এবং অন্তর্বিজ্ঞানে ব্রহ্মের অনুমান সিদ্ধ হইল।

তথাপি তাহা ভেদজ্ঞানী পণ্ডিতের অনুমান মাত্র রহিয়া গেল। যাহা অনুমান মাত্র, তাহা ত তর্কদ্বারা বিচলিত হইতে পারে। অসাধারণ বুদ্ধিমান পণ্ডিত কুতর্ক দ্বারা সকল অনুমানই খণ্ডন করিতে পারেন। এজন্য ব্রহ্মতত্ত্বের অনুমানকে সকল তর্কের অতীত করিবার জন্য বাদরায়ণ পরসূত্র করিলেন :—

"তত্তু সমন্বয়াৎ।"*

বেদজ্ঞ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বেদ বাক্যের সমন্বয়ে সেই ব্রহ্ম তত্ত্বের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্ব কেবল অনুমান নহে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ। সেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সমুদায় বেদবাক্যের সমন্বয় সাধন করাই উত্তর-মীমাংসার কার্য্য। সেই মীমাংসা শাস্ত্রের এক স্থলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব যুক্তি বলে কেমন স্থাপিত হইয়াছে, দেখুন :—

"অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।"—২।৩।৯

'ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ, কেবল সৎ, সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি অসম্ভব। যাহা কেবল, নিত্য, এক রূপ তাহার উৎপত্তি যুক্তি-সিদ্ধ নহে।'

যুক্তিসিদ্ধ নহে কেন? শঙ্কর তাহা বলিতেছেন :—

(১) ব্রহ্ম কেবল সৎ ও অস্তিত্ব স্বরূপ (The Unconditioned Principle Of Existence) যাহা কেবল সৎ, অন্য কেবল সৎ হইতে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। যদি বল সম্ভব, তবে সেই কেবল সৎ আবার কোন্ সৎ হইতে উৎপন্ন? তাহা আবার অন্য কোন্ সৎ হইতে উৎপন্ন? সুতরাং কেবল সতের উৎপত্তি কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটে।

---

* এই সূত্রের "তু" শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব সূত্রের আপত্তি এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। একথা কেন বলি? না, বেদান্তের সমুদায় বাক্যসমন্বয় দেখিয়া।

(২) এক কেবল-সৎ অন্য কেবল-সৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণ, উভয়ই এক বস্তু। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাই ত উহাই; সে জন্য উৎপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। যাহা একই বস্তু এবং যাহা উৎপন্ন হয় নাই তাহা চিরকালই এক আছে। সুতরাং তাহা অনাদি ও নিত্য।

(৩) তবে এই মাত্র সম্ভব যে, কেবল-সৎ হইতে বিশেষ-সৎ উৎপন্ন হইতে পারে—যেমন কেবল-মৃত্তিকা, বা মৃত্তিকা জাতি বা মৃত্তিকা-সামান্য হইতে ঘট-বিশেষ সমুদ্ভূত হইতে পারে। কেবল-সৎ বিভিন্ন আকারে আকারিত হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সৎ হইতে কেবল সতের উৎপত্তি অসম্ভব; যেমন ঘট বিশেষ হইতে মৃত্তিকা-সামান্যের উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং সৎ-সামান্য বা ব্রহ্ম হইতে এই সদ্বিশেষ-সম্পন্ন বিচিত্র জগতের উৎপত্তি সম্ভব; কিন্তু সদ্বিশেষ জগৎ হইতে সৎ-সামান্য, ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব।

(৪) সদ্বিশেষ হইতে কেবল সতের উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, কেবল-অসৎ বা অত্যন্তাভাব হইতে তেমনি অসম্ভব। যাহা নিজেই কিছু নহে, অত্যন্ত-অভাব, তাহা কিরূপে কিছুর উৎপত্তি-কারণ হইবে? শ্রুতি তাই বলিয়াছেনঃ—

"কথমসতঃ সজ্জায়েত।"

কিরূপে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইবে? যে বৌদ্ধাধিকরণে সর্ব্বশূন্যবাদ প্রখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে মূলেই সতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহার আবার উৎপত্তি কি? এজন্য সর্ব্বশূন্যবাদ সদ্বাদের বিরোধী নহে। যদি শূন্যবাদী বলেন, নানা প্রমাণ-সিদ্ধ জগৎ প্রপঞ্চ আদৌ নাই, কিছুই নাই, সমস্তই শূন্য, ইহার মূলও শূন্য, তবে সে প্রতিজ্ঞা অসিদ্ধ। বাধ (Contradiction) দেখাইতে না পারিলে, অবশ্য যাহা প্রকাশ পায়, তাহা নাই এমত নহে, কিন্তু তাহা আছে, এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ সামান্য তত্ত্ব অবাধিত থাকিবে। যদি অভাব হইতে ভাবের (সতের) উৎপত্তি অঙ্গীকার কর, তবে বল, বিনা চেষ্টায় তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে, বিনা কর্ষণে শস্যোৎপত্তি এবং বিনা সূত্রে বস্ত্রলাভ সম্ভব—এইরূপ তত্ত্বও স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব, অভাব ভাবের কারণ, এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই সমস্ত যুক্তি-বলে দেখা যাইতেছে, কেবল সতের উৎপত্তি অসম্ভব। যাহার উৎপত্তি অসম্ভব, তাহা নিত্যকাল বর্ত্তমান।

বেদান্ত এইরূপে কেবল-সৎ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সকল প্রমাণই নিষেধমুখ (Negative) সেই নির্গুণের স্বরূপ লক্ষণও বেদান্তে দৃষ্ট হয়। এই স্বরূপতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্মের বিধিমুখ (Positive) লক্ষণ। কিন্তু আমাদের সামান্য জ্ঞানে তাহাও নিষেধমুখ। কেবল যাঁহারা জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারাই তাহাদিগকে বিধিমুখ প্রমাণরূপে স্থির করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা যোগবলে যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সম্যক জ্ঞানে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বস্তুজ্ঞান ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ। সে প্রত্যক্ষের তুলনায় আমাদের ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মাত্র। কারণ, সে প্রত্যক্ষে প্রকৃত বস্তুজ্ঞান প্রভাসিত, আমাদের বহির্ব্বিষয়ক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে বস্তুজ্ঞানের সম্পর্ক মাত্র নাই, সমস্তই বস্তুর সম্বন্ধজ্ঞান। ব্যাসের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষগণ বেদান্ত-বাক্যের মীমাংসায় নির্গুণ ব্রহ্মের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ত্রিবিধ অমৃত (যাহা

জন্মমৃত্যুর বশীভূত নহে৷ বা নিত্য ভাব দেখিতে পাই। ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এই পরমার্থ সৎ যাহা লৌকিক সৎ নহে৷ কিন্তু নির্গুণ। যাহা সগুণত্ব বর্জ্জিত, যাহা জন্ম মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশের বশীভূত নহে, তাহাই কেবল-ও পরমার্থ সৎ। সুতরাং সেই সৎ নির্গুণ। তৎপরে চিতের কথা।

"এই চিৎও নির্গুণ চিৎ, কেবল-চিৎ। কেবল-সৎ যে কেবল-চিৎ হইবেন,তাহা অসম্ভব নহে। কেবল চিৎ—জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, মনের মন—"জ্ঞানস্য জ্ঞানম্, প্রাণস্য প্রাণম্ মনসামনঃ"। যাহা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক বহির্বিষয়ক জ্ঞান, তাহা সান্ত, পরিমিত ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়তই হইতেছে। শিশুর, তরুণবয়স্কের, যুবার এবং বৃদ্ধের জ্ঞানে বিস্তর প্রভেদ। যাহা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মন (Mind) সগুণ ও জড়ধর্ম্মী। কিন্তু যাহা সেই জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, তাহা পরিবর্ত্তনশীল ও পরিমিত নহে। এজন্য তাহা সগুণ, জড়ধর্ম্মী বা অনিত্য নহে। যাহা নিত্য চৈতন্য, তাহাই চিৎস্বরূপ ও নির্গুণ।

আনন্দময় কি? যাহা নিত্য চৈতন্য, তাহাই আনন্দময়। এ আনন্দ মনুষ্যের বা অন্য জীবের সবিকার ও পরিচ্ছিন্ন সুখ নহে, —যাহা পরক্ষণে হয়, তত নিরানন্দে পরিণত হইল। এ আনন্দ নির্ব্বিকার, অপরিচ্ছিন্ন ও অপরিমিত সুখ। সেই নিত্য সুখের কণাই জীবের আনন্দাভাস মাত্র। যে সুখ অনন্ত, যাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেই সুখই নিত্য সুখ। আমাদের সুখের বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে। সুখের বিচ্ছেদই দুঃখ। কিন্তু সর্ব্বসুখদাতার সুখের কখন বিচ্ছেদ হয় না। নিত্যচিৎ সেই নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ। নিত্যচিৎ নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ না হইলে কিরূপে পরিপূর্ণ হইবেন? যে নির্গুণ পরমাত্মা মন্ত্রবেদে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্যাখ্যাত্মক ব্রাহ্মণ-বেদে "আনন্দময়" রূপে প্রথিত হইয়াছেন। তাই ব্রহ্মসূত্র মীমাংসা করিলেনঃ—

"মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে।" -১।১।১৫

অতএব, এই ত্রিবিৎ তত্ত্ব—সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম। এই ত্রিবৃৎ নির্গুণ তত্ত্বই ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ। * যিনি সৎ ও চিদানন্দ স্বরূপ, তিনি অপরিমেয় হওয়াতে অনন্ত। কারণ, কোন রূপ বা আকারের সীমায় তিনি পরিমেয় নহেন। যিনি অনন্ত চিৎ স্বরূপ,তিনি অনন্তজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ সমস্তই নির্ব্বিশেষ রূপে জানেন, এবং যিনি সমস্তই নির্ব্বিশেষ রূপে জানেন, তিনি বেশেষ রূপেও জানেন; কারণ, বিশেষ সামান্যেরই আংশিক জ্ঞান। যিনি বিশেষজ্ঞ,তিনি সর্ব্ববিৎ। এজন্য বেদে,তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ রূপে অভিহিত। যিনি সর্ব্বজ্ঞ,তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যিনি নির্গুণ, তিনি নির্ব্বিকার। কারণ, বিকার গুণেরই ধর্ম্ম। নির্ব্বিকার বলিয়া নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ। তিনি এই সমস্ত হইয়া বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। তিনি অপাণি, অবাক্, অরূপ; তিনি অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, বৃহৎ নহেন। সমস্ত নিষেধক শব্দ, নির্গুণ ব্রহ্মের অভিধান।

---

* সেদান্তের এই ত্রিবৎ তত্ত্ব -(Doctrine of Trinity)। এই ত্রিবৃৎ তত্ত্ব ঠিক এই আকারে না হউক অন্যান্য আকারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ১৩০৩ আশ্বিনের নব্যভারতে "ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম" নামক প্রস্তাবে তাহা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, সেই ভৃগু, তিত্তির প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া এইরূপ ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হার্বার্ট স্পেনসারের যাহা অনুমান মাত্র,তাহা সেই ঋষিগণের নিকট অনুমান মাত্র নহে, তাহা তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যক্ষ ব্যতীত বস্তুজ্ঞানের অন্য প্রমাণ নাই। শুধু স্পেন্সর কেন, সমস্ত ভেদ-জ্ঞানির নিকট নির্গুণ সত্ব কেবল অনুমান-মূলক। ঋষিরা বলিয়াছিলেন, অনিশ্চিত ও সংশায়াত্মক অনুমানের উপর পরম ব্রহ্মতত্ত্বকে রাখিলে চলে না। কারণ, তর্ক ও অনুমান বুদ্ধি-প্রভব। তজ্জন্য যুক্তি ও অনুমান নানা জনের নানা প্রকার বুদ্ধি প্রভাবে নানারূপ হয় * কিন্তু প্রত্যক্ষ সম্যক্‌জ্ঞান কস্মিন্‌কালে বিভিন্ন হইবার যো নাই। সম্যক্ জ্ঞান হয় না, বলিতে পার না; কেন না পিতার উপদেশে শ্বেতকেতু ও ভৃগুর হইয়াছিল, এবং গুরুর উপদেশে ও পথ-প্রদর্শনে সহস্র বেদজ্ঞ ঋষির হইয়াছিল। যে রূপে তাহা জন্মে, সেই উপায় সকল সেই ঋষিরাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানের উপায় স্বরূপ—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বেদান্তবচন প্রভৃতির বিধান করিয়া গিয়াছেন। তুমি সংশয় কর, গুরুর উপদেশ অনুসারে সেই পথাবলম্বী হও, সম্যক্‌জ্ঞানে উপনীত হইবে।

তবেই দেখা যাইতেছে, ভেদ-জ্ঞানীর নির্গুণবাদ এবং আমাদের বেদজ্ঞ ঋষিগণের ব্রহ্মবাদ স্বতন্ত্র যুক্তির ফল। এক জনের জ্ঞান কেবল অনুমান-সিদ্ধ, অন্যজনের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ—Realisation। যদি বল, ঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়া কি বিশেষ জ্ঞান দিয়াছেন? তৎপক্ষে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্দ্দেশ-যোগ্য নহে; তাহাকে অন্য-জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় মাত্র। মনে কর, তুমি চিনি আস্বাদন করিয়াছ, কি অরণ্য মৃগ দেখিয়াছ; তাহা হইলে কি তুমি পরকে বুঝাইয়া বলিতে পার যে,চিনির আস্বাদন ঠিক এইরূপ? অন্য আস্বাদনের সহিত চিনির আস্বাদন পৃথক মাত্র করিতে পার, অন্য জীবের সহিত গবয়ের পৃথকত্ব দেখাইতে পার। কিন্তু ঠিক তাহা তাহা কি? তাহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন বোধগম্য নহে। তদ্রূপ, ব্রহ্মজ্ঞান। প্রত্যক্ষ, প্রমাণ মাত্র; যে প্রমাণের উপর আর প্রমাণ নাই। বস্তুর প্রত্যক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই ব্রহ্মজ্ঞান সাধন কালে প্রথমে প্রতীকোপাসনা (প্রতীক = আলম্বন, যেমন শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতীক) করিতে হয়। সেই প্রতীকোপাসনায় কেহ কেহ নামোপাসনা করেন, কেহবা রূপোপাসনা করেন, কেহবা আদিত্যাদি অন্য প্রতীক গ্রহণ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথমে স্থূল প্রতীক গ্রহণ করিতে হয়, চিত্ত সেই প্রতীক-ধ্যানে একাগ্র হইলে,স্থূল প্রতীক ক্রমে সূক্ষ্মজ্ঞানে আইসে। শালগ্রামে বিষ্ণুর অভেদ জ্ঞান জন্মিলে কেবল বিষ্ণুই উপলব্ধ হন, শিলা-জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়। ক্রমে চিত্ত বিষ্ণুর (বা বিরাটের) সূক্ষ্মরূপে তন্ময় হইলে সেই সূক্ষ্মরূপও অদৃশ্য হয়। বিরাটের ব্রহ্মাণ্ড-দেহ হিরণ্য-গর্ভে লীন হয়। তখন সমুদায় প্রতীক বা রূপ অন্তর্হিত হয়। যখন চিত্ত হইতে রূপ ও নাম একেবারে তিরোহিত হয়, তখন নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপন্ন ও সাক্ষাৎকৃত হন। অতএব,দেখা যাইতেছে, অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের যে প্রমাণ, আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রে সেই প্রমাণ-সমস্তই অনুষ্ঠান-মূলক।

* শারীরিক ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্র—২।১।১১ দেখ।

তাহা কেবল যুক্তি বা অনুমান উপরে স্থাপিত নহে। তাই এ প্রস্তাবে পরে দৃষ্ট হইবে, বেদান্ত যে যুক্তি দিয়াছেন, সে সমুদায় এই প্রত্যক্ষ-মূলক যুক্তি। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হইলে চিত্তে আর রূপজ্ঞান বা কোন প্রকার অবয়ব-জ্ঞান থাকে না। অপরোক্ষানুভূতিতে রূপ ও নাম তিরোহিত হয়। তাহা আপনা আপনি খসিয়া যায়। সুতরাং এই অবয়ব-জ্ঞান পরমার্থ কল্পে মিথ্যা। যাহা থাকে না, তাহা মিথ্যা নয় ত কি? ব্রহ্মজ্ঞানী তাই তাহাকে মায়া বলিয়াছেন। যাহা প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান বা মায়া, সেই অজ্ঞান যে একেবারে নাই, এমত কথা বলা যায় না। যত দিন ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান, ততদিন তাহা বর্ত্তমান। পরমার্থ-কল্পে তাহা নাই। কেবল তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না, এ বিশ্বের বিরাট রূপ মায়াময়। বেদান্ত এই মায়াবাদের উপর তাহার সমুদায় যুক্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতেছে। বেদান্তীর যুক্তিবলে যাহা নির্গুণ সত্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টির উপাদান হইয়া কিরূপে আবার সগুণ হইতে পারেন? একথা কত দূর যুক্তিমূলীয় তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

পূর্ব্ব-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে, বেদান্তীর সৃষ্টিবাদের সহিত অন্য দার্শনিকের সৃষ্টি-বাদের প্রভেদ এই, বেদান্তী যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই বলেন, তখন, সুতরাং সেই অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে "অভিন্ন নিমিত্তোপাদান" কারণ। সেই উপাদান কারণের প্রতি যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় প্রধান কোটিই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব মধ্যে গৃহীত হইতে পারে।

(১) ব্রহ্মই যদি উপাদান-কারণ হইতেন, তবে তাঁহার সহিত জগৎ-লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু জগতের লক্ষণ ও ব্রহ্মের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিরোধী। জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। সমানে অসমানে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব সম্ভাবিত নহে। কেহ বলিবে না, স্বর্ণ হইতে শরাব উৎপন্ন, অথবা মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ বলয় উৎপন্ন। স্বর্ণই বলয়ের উপাদান এবং মৃত্তিকাই শরাবের উপাদান হইতে পারে; তদ্বিপরীত ঘটে না। তদ্রূপ অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের উপাদান কিরূপে চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারে? চেতনের অচেতন হওয়া এবং অচেতনের চেতন হওয়া উভয়ই অশক্য।

(২) ব্রহ্ম নিরবয়ব, জগৎ সাবয়ব। এই দুই লক্ষণও সমান নহে। ব্রহ্ম যদি পৃথিব্যাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলেও বুঝা যাইত তাঁহার একাংশে জগৎ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ বজায় ও অবিকৃত আছে; সুতরাং তাঁহার অবশিষ্টাংশে তাঁহার ব্রহ্মত্ব বজায় আছে। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সাবয়ব নহেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তিনি জগৎ রূপে পরিণত হইলে পর আর তাঁহার ব্রহ্মত্ব কিছুই নাই। সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূল থাকে না। সুতরাং এক্ষণে জগৎই আছে, ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্মকে যদি নিরবয়ব বল, তবে বলিতে হইবে, তাঁহার পরিণাম বা বিকার সম্ভবে না। যদি সম্ভব হয়, ত সমস্তই পরিণত হইয়া এক নূতন দ্রব্য (জগৎ) সঞ্জাত হইয়াছে। এই দ্রব্য (জগৎ) সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বে তাহা ছিল না।

(৩) নির্গুণ সত্ত এক, এ জগৎ নানা রূপ ও বিচিত্র। নানারূপ জাগতিক পদার্থকে তুমি এক ব্রহ্মময় কিরূপে বলিবে?

বেদান্ত দর্শনে এই সকল আপত্তির যে প্রকার খণ্ডন হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

(১) আপত্তির খণ্ডন এই রূপঃ—

জগৎকে ব্রহ্মবিলক্ষণ দেখিয়া যাঁহারা বলেন, জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, তাঁহারা কি বলিতে চান, জগতের সমস্তটাই ব্রহ্মবিলক্ষণ ? না তাহার একাংশ ব্রহ্ম-বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্ম-প্রভব নহে। অথবা চৈতন্য নাই বলিয়া তাহা ব্রহ্ম-প্রভব নহে ? জগতের যে সমস্ত-টাই ব্রহ্মবিলক্ষণ এ কথা সপ্রমাণ হয় না। কেননা, জগৎ চেতনাচেতন-মিশ্রিত। যদি বল, জগতের জড়ত্ব ব্রহ্মলক্ষণের অসদৃশ, সেই জন্য জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে। সে কথাও বলিতে পার না, কারণ, সে অংশে জগৎ ব্রহ্মের সত্তাংশে সমান। আকাশাদি সমস্ত জগৎই ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান। যদি বল জড়জগতে চেতনার অভাব, সেই জন্য তাহা ব্রহ্মপ্রভব নহে। বেদান্তী বলেন, এ কথার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, যাহা উভয়েরই সম্মত, তাহাই দৃষ্টান্ত রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। তুমি প্রতিবাদী, তোমার পক্ষ সমর্থনার্থ যে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিবে যে, এই দৃষ্টান্তে জগতের চেতনত্ব প্রমাণ হয় না, আমি বলিব, সে দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য। কারণ, আমি যখন জড়ত্বই স্বীকার করিনা, তখন তোমার জড়ের দৃষ্টান্ত আমার সম্মত নহে, আমার সম্মত নহে বলিয়া তাহা দৃষ্টান্তরূপে গ্রাহ্য নহে। সুতরাং আমি স্বীকার করি না যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের অচেতনত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। যদি বল, আমরা জগৎকে ব্রহ্মের উপাদান কারণ বলিয়া জড় ও চেতনে এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিতে যে ভেদাভেদ তাহা উঠাইয়া দিতেছি; তাহাও নহে। কারণ, আমরাও জড় চেতন ও প্রকৃতি-বিকৃতি স্বীকার করিয়া থাকি। আমরাও বলি, জড় ও চেতনে-প্রকৃতি ও বিকৃতিতে যে বিভেদ তাহা চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষের যতদিন ভেদজ্ঞান বজায় থাকে, যতদিন না ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ততদিন সমস্ত ভেদাভেদ সত্য। কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের নিরোধ হইলেই ভেদ-ব্যবহার সমস্তই মিথ্যা। *

আর যে বলিলে, সমান না হইলে সমানের উৎপত্তি হয় না, এ কথা সকল স্থানে খাটে না। গোময় লোকপ্রসিদ্ধ অচেতন, কিন্তু তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি সচেতন। মনুষ্য চেতন কিন্তু তাহার কেশ ও নখাদি অচেতন। যদি বল, বৃশ্চিকাদিতে যে শরীর আছে, তাহা অচেতন, গোময়ের সঙ্গে সমান এবং মনুষ্যের যে শরীর আছে তাহা নখাদির ন্যায় অচেতন। সে কথা বলিলে আমরাও বলিব, সমস্ত জগৎ যে একেবারে ব্রহ্মবিলক্ষণ এ কথা সপ্রমাণ হয় না। কেন সপ্রমাণ হয়না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তদনুসারে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে, সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও আছে। সে জন্য ব্রহ্মের সহিত আকাশাদির প্রকৃতি বিকৃতি-ভাব সংরক্ষিত হইবে। *

বলিয়াছিলে, ব্রহ্ম শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; যিনি নির্গুণ, তিনি অসংসারী উদাসীন পুরুষ ও মুক্ত-স্বভাব; উদাসীন বলিয়া তিনি নির্লেপ ও অপাপবিদ্ধ এবং শুদ্ধ। শুদ্ধ, অসংসারী, নির্গুণ সত্তা কিরূপে অশুদ্ধ, অচেতন, জগৎকার্য্যের কারণ হইতে পারেন ? জগতের এ সমস্ত দোষ বিরুদ্ধ বটে; কিন্তু একই .আত্মায় তাহাদের সদ্ভাব অসম্ভব নহে। যেহেতু, বিরুদ্ধ গুণ সকল মিথ্যা।

* শারীরিক ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৬।

বিরুদ্ধ গুণ সকল তোমারই মিথ্যাদৃষ্টি-প্রভাবে উৎপন্ন। তোমার মিথ্যাদৃষ্টি বিনষ্ট হইলেই অভেদজ্ঞানে সকলই এক-স্বভাব বলিয়া গণ্য হয়।

(২) আপত্তির বিচার করা যাইতেছে। বলিয়াছিলে, ব্রহ্ম নিরয়ব ও নির্ব্বিকার, জগৎ সাবয়ব ও সবিকার। জগৎ সাবয়ব বলিয়া তাহার আকার, রূপ, নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিশ্ব এক পরিণাম হইতে অন্য পরিণামে আসিতেছে এবং তাহার নানা বিকার ঘটিতেছে। যিনি নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার, তাঁহার পরিণাম যুক্তিসিদ্ধ নহে। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হইবেন? যদি হন, তবে তাহার সমস্তই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নাই। এখন শুদ্ধ জগৎ আছে, ব্রহ্ম নাই।

বাস্তবিক, শ্রুতি ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয় রূপেই বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রুতি আবার বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু জগৎ ব্যতিরেকেও তিনি নিত্য, নিরঞ্জন, ও নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মের সমস্তটাই বিকৃত হইয়া জগতের উপাদান কারণ হয় নাই। তাঁহার একাংশ মাত্র জগতের সহিত সংসৃষ্ট, অপর ত্রিপাদে তিনি যেমন নির্গুণ সত্তা, তেমনই আছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতেও ব্রহ্ম বৃহত্তর। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আছে:—

"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

"এই সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদ মাত্র, তাঁহার অপর ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ।"

এই সূক্তেই প্রকাশিত যে, তিনি এক পাদ দ্বারা সমস্ত চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার অপর ত্রিপাদ এ সংসার হইতে উচ্চে অবস্থান করিতেছে। এই এক পাদেই তিনি সংসারী, সাকার, পরিণামী এবং যাহা কিছু বলিতে চাও, সে সমস্তই তুমি বলিতে পার। ব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়া আবার একাংশে সাবয়ব,—একথা বুঝিতে পারা গেল না। একাংশে তিনি স্বরূপে থাকিয়া নিরবয়ব রহিয়াছেন, অপরাংশে সাবয়ব হইলেন, একথা বলিলে তাহার স্বরূপের ভেদ স্বীকার করিতে হয়।

আমরা বলি, তাঁহার ভেদ স্বীকার করিতে হয় না। তোমার ভেদ-জ্ঞানই দোষার্হ। সেই ভেদজ্ঞান, প্রকৃতির জ্ঞান, প্রকৃতি সততই ক্রিয়াশীলা এবং সগুণা। সেই সগুণ প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম বস্তুর ভেদ করা যায় না। যে স্থলে গুণ বা ক্রিয়ার কথা বলা হয়, সে স্থলে যুক্তি দ্বারা কোন কথা প্রমাণ করিতে হইলে, বিকল্প-কোটি গ্রহণ করিতে পার। বিকল্প আশ্রয় করিয়া বলিতে পার, হয় তাহা এইরূপ ক্রিয়া বা গুণ, না হয় তাহা সেরূপ নহে। তৎপরে তর্ক দ্বারা সেই বিকল্পের খণ্ডন হইলেই তোমার যুক্তি সম্পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে ক্রিয়া নাই, গুণও নাই, সে স্থলে বিকল্প খাটে না। সে স্থলে বলিতে পার না,—হয় তাহা নিরবয়ব, না হয় তাহা সাবয়ব, বলিয়া সে যুক্তির খণ্ডন করিতে পার না। যে স্থলে বস্তু সম্বন্ধের কথা, সেখানে হয় ব্রহ্ম বস্তু নয়, না হয় ব্রহ্ম বস্তু, তদ্ভিন্ন অন্য বিকল্প খাটে না। ব্রহ্মই যে এক মাত্র বস্তু, অন্য কিছু বস্তু নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বস্তু জ্ঞানে তোমার গুণ-বিষয়ক বা ক্রিয়া-বিষয়ক বিকল্প খাটে না। তোমার বিকল্প গুণ-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা বস্তু-বিরোধী হইতে পারে না। যে বিষয় শ্রুতিবাক্যে প্রামাণ্য, তাহা আমাদের ভেদ-জ্ঞানে বিরুদ্ধ প্রতীতি হইলেও শ্রুতির প্রামাণ্যে তাহা দোষাবহ নহে।

আমরা কি ভেদজ্ঞান স্বীকার করি না? নিশ্চয় করি। যতদিন না ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের নিরোধ হয়, ততদিন ভেদজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানে ভেদব্যবহার নাই। তোমার নয়ন-দোষে তুমি দ্বিচন্দ্র, ত্রিচন্দ্র দেখিতে পার, তা বলিয়া কি চন্দ্রকে দুই বা তিন বলিতে হইবে? চন্দ্র সেই এক। তোমার নয়ন-দোষেই মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে। তদ্রূপ কল্পিত এবং অনির্ব্বাচনীয় মায়িক জ্ঞানে ব্রহ্ম পরিণামী হইতেছেন, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানে তিনি পরিণামরূপ ব্যবহারের অতীত। তবে যে-শ্রুতিতে তিনি সামান্য জ্ঞানীর বোধার্থ সগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেই শ্রুতি বাক্যের সহিত তাঁহার নিরবয়বত্ব বোধক শ্রুতি-তাৎপর্য্যের বিরোধ ঘটিবে কেন? সেই সগুণ শ্রুতিবাক্যদ্বারা অজ্ঞানীকে ব্রহ্মাত্ম ভাবে লইয়া যাওয়াই শ্রুতির অভিপ্রেত। যে যুক্তি দ্বারা তাহাতে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, আমাদের পক্ষে (অদ্বৈতবাদীর পক্ষে) ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ বাদে কোন দোষ হয় না।*

এক্ষণে (৩) আপত্তির কথা। সেই নির্গুণসত্ত্ব যে পাদদ্বারা পরিণামী জগৎরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই পাদদ্বারাই তিনি অগণ্য অংশে বিভক্ত হইয়া এই বিচিত্রতাময় জগৎরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। সেই পাদেই তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। কিরূপে তাহা নিমিত্ত ও উপাদানে পরিণত হইল, তাহা এই প্রস্তাবের বৈদান্তিক সৃষ্টিবাদের বিষয়। তাহা পরে বিবৃত হইবে। এক্ষণে এই পর্যান্ত বলা উচিত, সেই ব্রহ্মপাদ পূর্ণশক্তি সম্পন্ন হইয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়াছেন। যাহা পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন, তাহা সেই শক্তির স্বভাব বশতঃই আপনা আপনি অগণ্য মূর্ত্তিতে ও বিচিত্র রূপে বিভক্ত হইয়া এই জগৎপূর্ণ করিয়াছেন। দুগ্ধ ও জল যেমন স্বতঃই দধিরূপে ও হিমানী রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মোপাদান স্বশক্তি-প্রভাবে নানা আকারে আকারিত হইয়াছে। যদি বল, দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাতে উষ্মা ও আতঞ্চন (দম্বল বা দধিবীজ) রূপ বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। সেই বাহ্য সহায়তা কি? বেদান্তী বলেন, দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায়। দুগ্ধ নিজে দধি না হইলে কেহ কি বলপূর্ব্বক তাহাকে দধি করিতে পারে? উষ্মা ও আতঞ্চন কি বায়ু বা আকাশকে দধি করিতে পারে? ব্রহ্ম পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন, সেই শক্তি পূরণের জন্য শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই সহায়তা আবশ্যক করে না; শক্তিই শক্তির সহায়তা করে। যিনি অনন্ত শক্তি, তাঁহার আর অভাব কি? সেই হেতু সেই শক্তি-প্রভাবেই জগতের এই বিচিত্র রূপের আবির্ভাব ঘটে। সেই চেতনোপাদানের অল্পাধিক-পরিমাণ বিকাশে এত বিচিত্রতা ঘটিয়াছে। কোন রূপে সেই চেতনার বিকাশ নাই, কোন রূপে অল্পই বিকাশ, কোন রূপে তদধিক—কোন রূপে সুখের বিকাশ নাই, কোন রূপে আনন্দের অল্পমাত্রায় বিকাশ, কোন রূপে তদধিক—এই প্রকারে অসংখ্য বিচিত্র রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণশক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি কথিত হইয়াছেঃ—

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ॥"

যেহেতু, তিনি পূর্ণশক্তি, সেই হেতু এক।

* শারীক ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্র—২।১।২৭

ব্রহ্মই উপাদান হইলেও সেই পূর্ণশক্তিসম্পন্ন উপাদান কারণ স্বাভাবিকী শক্তিরূপে নানা আকার ও বিচিত্র রূপে পরিণত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

যাহা বিনা প্রয়োজনে, বিনা উদ্দেশ্যে, কেবল মাত্র স্বাভাবিকীশক্তি প্রভাবে সৃষ্ট ও আবির্ভূত, তাহাকেই লীলা বলে। এই বিশ্ব ও সংসার ঈশ্বরের লীলা মাত্র। এই লীলা শ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগের ন্যায় অনায়াসে ও বিনা চেষ্টায় অনুস্যূত হইয়াছে। ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি আছে, সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। তাহাই সমস্ত জগৎ যোনি। তিনি সৃষ্টি করেন কেন? চুপ্ করিয়া না থাকেন কেন? স্বভাবরূপ কারণই সে প্রশ্নের উত্তর।

যদি বল, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই যদি উপাদান হইলেন এবং সেই উপাদান স্বশক্তি প্রভাবে বিভিন্ন আকারে আকারিত হইয়াছে, তবে আর নিমিত্ত-কারণের আবশ্যকতা কি না। উপাদান নিজেই জ্ঞান সম্পন্ন, তাহার অতি-স্বতন্ত্র জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ত্তার আবশ্যকতা কি?

একথার উত্তরে আমরা বলি, কার্য্যদ্রব্য বা উপাদান থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং ক্রিয়া-প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। তিনি নিজেই কামনা করিলেন এবং নিজেই উপাদান রূপে মায়ার সৃষ্টি করাতে তাঁহার কর্তৃত্ব। কার্য্য আছে বটে, কিন্তু কার্য্যাকারে নাই, সেই কার্য্যাকারে আনাতেই তাঁহার কর্তৃত্ব। সেই কর্তৃত্ব প্রভাবেই তিনি মায়াবলে নিজেই জগৎ রূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি "অভিন্ন-নিমিত্তোপাদন" কারণ, তাহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এক সঙ্গেই কার্য্য করিয়া জগৎ গড়িয়াছে; এবং এক সঙ্গে কার্য্য করিয়া ব্রহ্মরূপে চিরদিন অবস্থিত আছে। যখন মায়া কল্পিত রূপ, তখন কেবল নির্গুণ সৎই বিদ্যমান। যদি কার্য্যকারণ স্বীকার কর, তবে তিনি সর্ব্ব-কারণ রূপেই বিদ্যমান। যে হেতু, কার্য্য সেই কারণেই লীন ছিল, তিনি নিমিত্ত-কারণ হইয়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ গড়িয়াছেন। সেই কারণই সৎ। সেই অক্ষর ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ রূপে জগৎ-প্রপঞ্চে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

অতএব, আমাদের মতে, অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা নামরূপ ব্যবহার-যোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়ার নামই সৃষ্টি, সুতরাং তাহা অপরমার্থ। যদিও শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু সেই শ্রুতির এমত তাৎপর্য্য নহে যে, সে সৃষ্টি সত্য। সৃষ্টিশ্রুতি সকল পরমার্থবিষয়িণী নহে, কেবল ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্য-সমূহের উদ্দেশ্য। *

অদ্বৈত বেদান্তবাদে তবে ব্রহ্মের সগুণত্ব কল্পিত মায়া মাত্র। যাহা কল্পিত, তাহার সহিত নির্গুণবাদের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। বেদান্ত আরও বলিতেছেন, এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ যে মিথ্যা তাহারই জ্ঞান দিবার জন্য শ্রুতিতে সৃষ্টিবাক্য সমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। আমাদের সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে সেই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অলীকত্ব কেমন প্রতিপন্ন, হার্বার্ট স্পেন্সর তাহা অতি বিশদরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সৃষ্টিবাদই সঙ্গত বোধ হয় না। ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন :—

"In the first place, it is clear, that by self existence we especially mean an existence independent of any other —not produced by any other. The assertion of self existence is simply an indirect denial of creation In thus excluding the idea of any antecedent cause, we necessarily exclude the idea of a beginning; for

* শারীরিক ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র।২।১।৩৩।

to admit the idea of a beginning—to admit that there was a time when the existence had not commenced—is to admit that its commencement was determined by something or was caused which is a contradiction Self existence therefore necessarily means existence without a beginning, and to form a conception of self existence, is to form a conception of existence without a beginning

তাই বটে। বেদান্ত ও সাংখ্যমতে শুধু কি ব্রহ্ম অনাদি? সংসারও অনাদি। কেবল বেদান্তই বলিয়াছেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর যাহা আছে, তাহা মায়া মাত্র,—কল্পিত রূপ। সুতরাং এক ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন মায়াময় জগৎও সৃষ্টি কল্পিত মাত্র,—একথার সহিত সেই অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কোন অসঙ্গতি ঘটে নাই। যাহা কিছু অসঙ্গতি, তাহা হার্বার্ট স্পেন্সরের ভেদজ্ঞানেই সম্ভব। পরমার্থ বটে। কোন অসঙ্গতি নাই।

ভেদজ্ঞানে সমস্ত সৃষ্টি কল্পনাই অসঙ্গত। তাই হার্বার্টস্পেন্সর সাংখ্য পরিণামবাদ সম্বন্ধেও অসঙ্গতি দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"The hypothesis of self creation which practically amounts to what is called Pantheism, is similarly incapable of being represented in thought Certain phenomena, such as precipitation of invisible vapour into cloud aid us in forming a symbolic conception of a self evolved universe

*　　*　　*　　*

"Really to conceive self creation is to conceive potential existence passing into actual existence by some inherent necessity, which we cannot do We cannot form any idea of a potential existence of the universe as distinguished from its actual existence"

আর নৈয়ায়িকের সৃষ্টিবাদই বা কি?

"There remains to be examined the commonly received or theistic hypothesis—creation by external agency Alike in the rudest creeds and in the cosmogony long current among ourselves it is assumed that the genesis of the heavens and the Earth is effected some what after the manner in which a workman shapes a piece of furniture."

ভেদজ্ঞানীরও কাছে সমস্ত সৃষ্টিবাদ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ এইরূপ অসঙ্গত। বেদান্ত দর্শন দেখাইয়াছেন, তাহা কাল্পনিক। সমস্ত সৃষ্টিবাদের কাল্পনিকতা প্রতীত হইলেই মানব নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে মন নিয়োজিত করে। ব্রহ্মতত্ত্বে মন নিয়োজিত হইলেই যে ব্রহ্ম দর্শন হয়, এমত নহে। তাহার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি ও সাধনচতুষ্টয় নিয়োজিত হইয়াছে। সাংখ্য পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞানেও এই পথ। অগ্রে জ্ঞেয় (The Knowable) প্রকৃতিকে জান, জানিলে তোমার পুরুষের (The Unknowable) উপলব্ধি হইবে। উপলব্ধি হইলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পুরুষার্থ সিদ্ধি করিতে হইবে। যখন মানব আত্ম পদার্থ হইতে অনাত্ম পদার্থের প্রভিন্নতা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন, তখন তিনি [illegible] হয়েন। সেই অধিকারীর নিকট সগুণ নির্গুণের ভেদাভেদ সহায়রূপে [illegible] তিরোহিত হইতে পারে, এ প্রস্তাবে তাহারই স্থাপন করা হইয়াছে। সেই ভেদাভেদ তিরোহিত হইলে সগুণ ও নির্গুণবাদে আর কোন দোষাশ্রয় করে না। সুতরাং কল্পিত সগুণভেদ ব্রহ্মের নির্গুণত্বে সদোষ নহে।

নির্গুণ কিরূপে সগুণ হয়, একথা আমাদের সামান্য জ্ঞানে উপলব্ধ নহে বলিয়া বেদান্ত তাহা প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন, বিধিমুখ (Positive যুক্তি দিতে না পারিয়া নিষেধমুখ (Negative যুক্তি দিয়াছেন। তুমি বলিতেছ, নির্গুণ ও নিরবয়ব কিরূপে সগুণ ও সাবয়ব হইল, একথা বুঝিতে পারা যায় না। বেদান্ত বলিতেছেন, তুমি কথাটা উলটাইয়া বলিতেছ, বলিতেছ—নিরবয়ব কিরূপে সাবয়ব হইল? বেদান্ত বলিতেছেন, তুমি

যে সাবয়ব জ্ঞান করিতেছ, উহাই ভ্রান্তি। তোমার অবয়ব জ্ঞান যদি কাল্পনিক ও মিথ্যা হয়, তবে তুমি কিরূপে বলিতে পার, নিরবয়ব সাবয়ব হইল? যাহা নিরবয়ব তাহা নিরবয়বই আছে। তোমার জ্ঞান-শক্তি এমনি যে, সেই জ্ঞানশক্তি প্রভাবে তুমি অবয়ব কল্পনা করিতেছ। তোমার অবয়ব কল্পনাই মিথ্যাদৃষ্টি ও মায়া। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

শ্বেতাশ্বতর ৪র্থ অধ্যায়।

প্রকৃতি মায়া, মহেশ্বর মায়াময় পুরুষ। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমপুরুষের মায়াময় অবয়ব দ্বারা অশেষ ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই মায়াবশতঃ পরমেশ্বরের অবয়বাদি কল্পিত হইয়া থাকে। সেই মায়ার অবসান হইলেই কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না।

ঐ আমাদের মানসিক জ্ঞানের প্রকৃতি-বিচারে একথা আরও বিশদ হইয়া আইসে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের মানস-মন্দির ইন্দ্রিয়গণের অর্জ্জিতজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সেই জ্ঞানের সংস্কার সকল তাহাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান কেবল কার্য্যের জ্ঞান বা শক্তির যোগ্যতাযোগ্যতার জ্ঞান মাত্র—দ্রব্যসমূহ পরস্পরের সম্বন্ধে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ, বা কিরূপ কর্ম্ম করিতেছে, তাহারই জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানে কি বস্তু নিরূপণ হয়? বস্তুজ্ঞান ত সম্বন্ধজ্ঞান নহে। সেই সম্বন্ধ যাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ সেই ধর্ম্মীর বা বিশেষ্যের জ্ঞানই বস্তুজ্ঞান। সুতরাং এই দ্বিবিধ জ্ঞানের অবশ্য ভেদাভেদ ঘটিবে। একবিধ জ্ঞান জগতের জ্ঞান, অন্যবিধ জ্ঞান জগতাতীত। যাহা জগতের জ্ঞান, তাহা স্থূল বা অণু, সীমা বিশিষ্ট বা অংশ পরিমাণ জ্ঞান। এ জ্ঞান এই জন্য পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণ বিশিষ্ট জ্ঞান। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। যিনি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান দিয়া ব্রহ্মচিৎ হইতে যাইবেন, তিনি সুতরাং অনন্তকে তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন করিয়া আনিবেন। সেই অনন্তকে জানিতে হইলে এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবরণ মুক্ত করা উচিত। এ জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানা যাইবে না। এ জ্ঞান অপসারিত হইলে তবে সে জ্ঞান প্রতিভাসিত হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, 'তিনি কি প্রকারে অরূপ, অবর্ণ, পরিশুদ্ধ সত্ত্ব, তিনি সেই সৎস্বরূপে চিদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় অনন্ত পরমাত্মা। তাই শ্রুতি মানুষকে এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচতুষ্পাদ, তাঁহার চতুষ্পাদের মধ্যে একপাদ মাত্র বিশ্ব যাতায়াত করিতেছে, তাঁহার অপর ত্রিপাদ অমৃত। এই কার্য্য-কারণাত্মক ভূত জগৎ, এই সগুণ ঈশ্বররূপী ব্রহ্মাণ্ড, নির্গুণ ব্রহ্মের একপাদ মাত্র। অপর ত্রিপাদে তিনি নির্গুণসত্ত্বা, সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং এই কার্য্যকারণাত্মক সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎবিকাশ হইতে তিনি স্বতন্ত্র, নির্লেপ ও বৃহত্তর। বৃহত্তর বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্ম; তিনি সেই পরব্রহ্ম রূপে অনন্ত পরমাত্মা। অতএব, শ্রুতি যেমন তাঁহাকে নির্গুণ, নিরবয়ব বলিয়াছেন, সেই শ্রুতি আবার তাঁহাকে সগুণ ও ধর্ম্মী বলাতে কোন দোষ বা বাধ সম্ভবে না। যাহা আপাততঃ বাধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমাদের সামান্য বা মানসিক জ্ঞানজাত অসঙ্গতি রূপেই বাধ বলিয়াই প্রতীত হয়। ব্যাস ব্রহ্মসূত্রেও বলিয়াছেন, সামান্য মানবের জ্ঞানার্থ ব্রহ্মের পাদ-কল্পনা, নহিলে বাস্তবিক ব্রহ্মের অংশ নাই। মানুষের জ্ঞান অংশাংশে

পরিমিত; সেই পরিমিত জ্ঞানের বোধগম্য করাইবার জন্য ঋগ্বেদে তাঁহার চতুষ্পাদ কল্পিত হইয়াছে। তাই বেদান্তে আছে :—

"বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।"—৩।২।৩৩

"ব্রহ্মের এই পাদবিভাগ পরিমাণ বুঝাইবার জন্য নহে, তাহা বস্তু-প্রতিপাদকও নহে; তাহা কেবল সুবোধার্থ জানিবে। জীবের উপাসনার নিমিত্ত পাদ কল্পনা।"—

স্মৃতিতেও ঐ কথা বিশ্বরূপধারী নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন :—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"॥

তুমি যে আমাকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, উহা মায়া। উহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ মায়িকরূপধারী না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বৌদ্ধ-দর্শন।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ।

বৌদ্ধেরা মনুষ্যকে কয়েকটী স্কন্ধের বা ধর্ম্মের সমষ্টি বলিয়া অনুমান করে। কোন স্কন্ধের স্থায়িত্ব বা সত্তা নাই, সকলেই ক্ষণ-বিধ্বংসী, সুতরাং ইহাদের কাহাকেও ব্যক্তিত্ব বা আত্মত্ব আরোপ করা যাইতে পারে না। ইহাদের কাহারও পুনর্জ্জন্মের বা জন্মান্তরে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে পুনর্জ্জন্ম কাহার হয়? জন্মান্তরে কে পরিচালিত হয়?

কর্ম্মফলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়—এ কথাটা কতক বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বৌদ্ধমত নহে। বৌদ্ধেরা বলে কর্ম্মের জন্মান্তর লাভ হয়। অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য আত্মা নাই, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্কন্ধের জন্মান্তর হয় না—অথচ কর্ম্মের জন্মান্তর হয় বুঝা বড় কঠিন। এই কর্ম্মকে যদি চরিত্র বল কিছু বুঝা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে ও বিবর্ত্তবাদে বলে, পূর্ব্ব পুরুষের চরিত্র সন্তান জন্মে দেখা দেয়। বিবর্ত্তবাদীর মত বৌদ্ধের মত নহে। বৌদ্ধ বলেন, জীবের চরিত্রের পুনর্জ্জন্ম হয়। মনুষ্যে অমরত্ব আরোপ করিলে স্বর্গে এই চরিত্র ভিন্ন আর কাহার অভ্যুদয় সূচিত হয়? দেহ—সে কিছু স্বর্গে যায় না। স্বর্গে আত্মার বিকাশ দেখা যায়। চরিত্রে ভিন্ন আর কিসে আত্মার বিকাশ হয়? লোকে বন্ধুর দেহ ও বন্ধুর চরিত্র চিনে। দেহ যখন স্বর্গে যায় না, স্বর্গে বন্ধুকে চিনিতে হইলে চরিত্র দেখিয়াই চিনিতে হইবে। হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রভেদ এই যে, হিন্দু চরিত্রের অন্তরালে একটী আত্মা স্বীকার করে, বৌদ্ধ সে আত্মা স্বীকার করে না।

কর্ম্মের দুই অর্থ—কার্য্য ও কার্য্য-জনিত চরিত্রের ব্যাবৃত্তি বিকৃতি বা পরিণতি। বৌদ্ধ বলেন, কার্য্য জনিত চরিত্রের ব্যাবৃত্তি ইহ-জীবনে সমাপ্ত হয় না, পর জীবনেও চলিয়া থাকে—জীবনে জীবনে অনন্ত জীবনে অনন্ত জন্মে সে ব্যাবৃত্তির ক্রম বিকাশ। যতদিন ব্যাবৃত্তির পূর্ণ পরিণতি না হইবে, তত-দিন সে ব্যাবৃত্তি চলিবে, ততদিন জন্মান্তর চলিবে।

দুইটী পাখীর ডিম দেখিতে এক প্রকার, আকারে গঠনে বর্ণে কোন বিভিন্নতা নাই। কিমিতি শাস্ত্রমতে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যে

পদার্থের সমবায়ে ডিম দুটী গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, পরিমাণের কোন তারতম্য নাই, তথাপি একটী ডিম হইতে কাক অন্যটী হইতে কোকিল উৎপন্ন হয়—কেন? জন্ম জন্মান্তরে পূর্ব্ব পুরুষের কর্ম্মে প্রকৃতির বিশেষত্ব ব্যাবৃত হইয়াছে। সহস্র জন্মের সহস্র কর্ম্ম কোন অভাবনীয় ভাবে এই ডিম দুটীর ভিতর লুক্কায়িত আছে—সময়ে সেই কর্ম্ম ফলে একটী হইতে কাক অন্যটী হইতে কোকিল উৎপন্ন হয়। এই বিবর্ত্তবাদীর মত। বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মফলে আমার জন্ম প্রভাবিত স্বীকার করিবে না—বলিবে আমারই কর্ম্মফলে আমার জন্ম প্রভাবিত অথবা আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম এই নূতন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে যাহাকে আমি আমি বলি। অথবা আমি আমার আমিত্ব আমা হইতেই উভয়াধিকার করিয়াছি। সুতরাং বৌদ্ধ মত হিন্দু মতও নহে, বিজ্ঞানের মতও নহে।

ফুলের গন্ধ ফুল ভিন্ন থাকিতে পারে না। গন্ধের একটী আধার চাই—চরিত্রেরও একটী আধার চাই। এই আধার কোথা হইতে আসে? কর্ম্ম দুই প্রকার—উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর। নিষ্কাম কর্ম্ম অনুর্ব্বর। সে কর্ম্মে অঙ্কুর উঠিবে কিন্তু অচিরে লয় পাইবে—তাহা হইতে নূতন শস্য, জন্মান্তরের কারণ, উৎপন্ন হইবে না। সকাম কর্ম্ম উর্ব্বর। ইহা হইতে আধার ও আধেয়—চরিত্র ও দেহ, তুষ ও দানা, উভয়ই উৎপন্ন হইবে, জন্মান্তরের কারণ উৎপাদিত হইবে। লোভ, ঘৃণা ও মোহ জনিত কর্ম্ম জন্মান্তরের জনয়িতা।

মিলিন্দ আচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভন্তে নাগসেন! কি কারণ সকল মানুষ সমান হয় না? কেহ অল্পজীবী, কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ সুস্থ, কেহ অসুস্থ, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ কেন হয়?

মহারাজ! সব গাছ সমান হয় না কেন? কোনটা টক, কোনটা মিষ্ট, কোনটা ঝাল, কোনটা তিত, কোনটা লোণা, কোনটা বিস্বাদ কেন হয়?

ভন্তে! বোধ হয় বীজের পার্থক্য হেতু।

মহারাজ! কর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু মানুষ বিভিন্ন হয়—কর্ম্মই মনুষ্যের পৈতৃক ধন, কর্ম্মই মনুষ্যের উত্তরাধিকার, কর্ম্মই মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্মই আধার, কর্ম্মই আশ্রয়—কর্ম্মই মহত্ত্ব বা নীচত্ব ঘটাইয়া দেয়।

মিলিন্দ পঞ্হ।

ভিক্ষুকগণ! যদি বল, কর্ম্মের অনুযায়ী ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, তবে ধর্ম্ম জীবনের—ধ্যান ধারণা সমাধির আবশ্যক হয় না। যদি বল, যে যাহা ভোগ করে, তাহা তাহার কর্ম্মের অনুযায়ী, তবে ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা থাকে। একটী ক্ষুদ্র পাপ করিয়া কেহ নরকে যায়, সেই ক্ষুদ্র পাপ করিয়া আর একজন নরকে যায় না, সে সে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করে। একবাটী জলে এক মুঠা নুন দিলে সে জল লবণাক্ত হয়—কিন্তু গঙ্গাগর্ভে এক মুঠা নুন ফেলিলে গঙ্গাজল লবণাক্ত হয় না। একটী পয়সা চুরি করিয়া কেহ জেলে যায়, একটী পয়সা চুরি করিয়া কেহ জেলে যায় না। যে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, সে একটী পয়সা চুরি করিয়া জেলে যায়, যে ধনী ও অভাবের অতীত সে একটী পয়সা চুরি করিয়া জেলে যায় না।

অঙ্গুত্তর নিকায়।

ভন্তে নাগসেন! জন্মচক্র কাহাকে বলে?

মহারাজ! এখানে জন্মিয়া এখানে মরা, এখানে মরিয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করা, অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে মরা, সেখানে মরিয়া আবার অন্যত্র জন্মগ্রহণ করা ইহাকে জন্মচক্র বলে।

ভন্তে! একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিন।

মহারাজ! যদি একজন একটী পাকা আম খাইয়া আঁটীটী পুতিয়া দেয়, সে আঁটী হইতে গাছ হয় ও ফল ফলে, সে যদি সে ফলটী পাকিলে খায়, আবার তাহার আঁটীটী পুতিয়া দেয় এবং এইরূপ বরাবর করে, তবে গাছ ও ফলের কি ইয়ত্তা থাকে?

মিলিন্দ পঞ্হ।

ভন্তে নাগসেন! এমন কি কেহ আছে, যে মরিয়া আর পুনর্জন্ম লাভ করে না?

মহারাজ! কেহ মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে না।

ভন্তে! কে মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে, কে করে না?

যাহার মলিনতা আছে, সে মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে, যাহার মলিনতা নাই, সে মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে না।

ভন্তে! আপনি মরিয়া কি পুনর্জন্ম লাভ করিবেন?

মহারাজ! যদি আমার কোন প্রকার বাসনা থাকে, আমি মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিব। আর যদি আমার সকল প্রকার বাসনা ঘুচিয়া যায়, তবে আমি মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিব না।

ভন্তে! কেহ কি জানিতে পারে যে, তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে?

পারে।

ভন্তে! কেমন করিয়া সে জানিতে পারে?

মহারাজ! একজন কৃষক হাল দিয়া ধান বুনিয়া শস্য কাটিয়া শুখাইয়া ঝাড়িয়া যদি সে গোলায় পূরে, এবং সে শস্য খাইয়া ফেলে বা বিলাইয়া দেয়, সে কি জানিতে পারে যে, পর বৎসর তাহার গোলা আর পূর্ণ হইবে না?

ভন্তে! নিশ্চয়ই সে জানিতে পারে।

মহারাজ। কেমন করিয়া পারে?

যেহেতু যাহা করিলে গোলা পূরে, সে কার্য্য সে করে নাই।

মহারাজ যে কার্য্য করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, যে সে কার্য্য করে, সে জানে তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

মিলিন্দ পঞ্হ।

ভন্তে নাগসেন! ইহকাল হইতে পরকালে কোন পদার্থ বা গুণ না যাইলে পুনর্জন্ম কি হইতে পারে?

পারে।

একটী দৃষ্টান্ত দিন।

মহারাজ! একটী প্রদীপ হইতে আর একটী প্রদীপ জ্বালিলে এ প্রদীপের আলোক কি ও প্রদীপে চালিত হয়? আপনি গুরুর নিকটে বাল্যকালে দু একটী শ্লোক শিখিয়া থাকিবেন। সে শ্লোক কি গুরুর নিকট হইতে আপনার নিকট সঞ্চালিত হইয়াছিল? ঠিক এইরূপে কোন কিছু পরজীবনে সঞ্চালিত না হইলেও পুনর্জন্ম ঘটিতে পারে।

ভন্তে নাগসেন! কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?

নামরূপ পুনর্জন্মে জন্ম গ্রহণ করে।

পূর্ব্ব জন্মের নামরূপ কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?

সে নামরূপ নহে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের নামরূপে লোকে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম বশতঃ পরজন্মে অন্য নামরূপ জন্মিয়া থাকে।

ভন্তে নাগসেন। ইহজন্মের নামরূপ পরজন্মে না জন্মিলে লোকে কি ইহজন্মের কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হয় না? মহারাজ! যদি পুনর্জ্জন্ম না হইত, তবে লোকে ইহজন্মের কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইত। পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে কেহ মুক্তি লাভ করে না।

একটী দৃষ্টান্ত দিন।

মহারাজ! কেহ যদি একজনের আম চুরি করে। যাহার আম সে তাহাকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া যায় এবং নালিশ করে যে, এ ব্যক্তি আমার আম চুরি করিয়াছে। কিন্তু চোর যদি বলে যে, আমি নিরপরাধী, কারণ যে আম এ পুঁতিয়াছিল, আমি যাহা লইয়াছি, তাহা হইতে ভিন্ন—আমি ইহার আম লই নাই—মহারাজ এ ব্যক্তি কি দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে?

না! কারণ যে আম সে চুরি করিয়াছে, যাহা বোনা হইয়াছিল, সে আমেরই ফল—চোর যাহাই বলুক না কেন, সে দণ্ড পাইবে, কারণ তাহার চুরি করা আম যে পূর্ব্বের রোপিত আম হইতে জন্মিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মহারাজ! ঠিক এই কারণেই এক নাম ও রূপ লইয়া যে একটী কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের ফলে তাহার জন্মান্তর, নামান্তর ও রূপান্তর ঘটে। নামরূপ জন্য ভিন্ন হইলেও সে যে সেই এবং সেই কর্ম্মফলে যে সে এই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সুতরাং কৃতকর্ম্মের ফলভোগ তাহার নূতন জন্মে লাভ হয়।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিন।

মহারাজ! আগুন পোহাইবার জন্য শীত কালে যদি কেহ আগুন জ্বালে এবং আগুন পোহান হইলে চলিয়া যায়, আগুনটী না নিবাইয়া চলিয়া যায় এবং সে আগুনে একজনের ক্ষেত্র দগ্ধ হয় এবং যে আগুন জ্বালিয়াছিল, তাহাকে রাজার কাছে ধরিয়া লইয়া যায় এবং বলে যে, ধৃত ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র জ্বালাইয়াছে, কিন্তু সে যদি বলে যে, যে আগুনে ইহার ক্ষেত্র জ্বলিয়াছে, সে আমার জ্বালা আগুন নয়। আমার জ্বালা আগুন স্বতন্ত্র এবং যেখানে জ্বালিয়াছিলাম, সে স্থানও স্বতন্ত্র, সে তৃণ ও কাঠ স্বতন্ত্র, মহারাজ! তাহার দণ্ড হইবে কি না?

যদি কেহ আপন ঘরে একটী প্রদীপ জ্বালে, সে প্রদীপে যদি প্রতিবাসীর গৃহ জ্বলে, সে গৃহের আগুনে যদি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ জ্বলিয়া যায়, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের আগুন হইতে যদি ক্রমে সমুদয় গ্রাম জ্বলিয়া যায়, কিন্তু যে প্রদীপ জ্বালিয়াছিল, সে যদি বলে যে, যে আগুনে গ্রাম জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপের আগুন নহে, তাহার দণ্ড হইবে কি না?

অবশ্যই হইবে। সে যাহাই বলুক না কেন, তাহার আগুনের ফলে যে ক্ষেত্র ও গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদি কেহ একটী বালিকাকে বিবাহ করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়, আট দশ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, অপরে তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে। সে কিন্তু যদি বলে, যাহাকে এ বিবাহ করিয়াছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই, সে বালিকা এ যুবতী, সে কৃশ এ স্থূল, রূপে, গুণে, গঠনে ইহার বিবাহিতা বালিকা ও আমার বিবাহিতা যুবতী স্বতন্ত্র, মহারাজ! আপনি কাহার সপক্ষে রায় দিবেন?

প্রথমের! কারণ যুবতীত বালিকা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ! যদি কেহ গোয়ালার নিকট

এক ভাঁড় দুধ কিনে, দুধ কিনিয়া গোয়ালার কাছে রাখিয়া হাটে যায়, হাট হইতে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া দুধের ভাঁড় চাহিলে গোয়ালা যখন ভাঁড় বাহির করিয়া দেয়, তখন দেখে যে ভাঁড়ে দধি রহিয়াছে। সে যদি বলে, আমি দধি কিনি নাই, দুধ কিনিয়াছি, আমাকে এক ভাঁড় দুধ দাও, তোমার দধি তুমি লও। আর গোয়াল যদি বলে, তোমার ক্রীত দুধ আপনা হইতে দধি হইয়াছে, তোমাকে এই দধিই লইতে হইবে এবং উভয়ে বিবাদ করিয়া যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তবে আপনি কাহার অনুকূলে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন? গোয়ালার অনুকূলে, কারণ ক্রেতা যে দুগ্ধ কিনিয়াছিল, তাহাই দধিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং ক্রেতাই সে দধি লইতে বাধ্য।

মহারাজ! অন্য জন্মে যে নামরূপ ঘটে, পূর্ব্বজন্মের মৃত্যু দিনে যে নামরূপ শেষ হইয়াছিল। উহা তাহা হইতে ভিন্ন হইলেও উহা যে তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেজন্য নামরূপ ভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ আপন কৃত কর্ম্মের দণ্ড পুরস্কার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

কড়চা সমালোচনের প্রতিবাদ। *

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী দ্বারা প্রকাশিত গোবিন্দ দাসের কড়চা সম্বন্ধে সম্পাদকীয়-স্তম্ভে যে সমালোচন বাহির হয়, ভাবিয়াছিলাম কোন বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন লেখক উক্তকর্ম্মে ব্রতী না হওয়ায় সত্যের সম্মান রক্ষার্থ আমাকে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইতে হইতেছে।

নব্যভারত আমার বড় আদরের সামগ্রী, এই পত্রিকার সম্পাদককে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; সম্পাদক মহাশয়ের মুখে অবগত হইলাম, গোবিন্দ দাসের কড়চার সমালোচক বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বী মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় প্রথিতনামা লেখক সমালোচনের দায়িত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, শিশির বাবুর প্রমুখাৎ শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া কড়চাকে অসম্পূর্ণ এবং প্রকাশককে অপূর্ণপুস্তক প্রচলনে উন্মুখ বলিয়া তাঁহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

ক্ষীরোদবাবু কড়চার অপূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার হেতুবাদের অবতারণা করেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন—"আমরা শুনিয়াছি, শিশিরবাবুর নিকটে পণ্ডিত মহাশয় পুঁথিখানি রাখিয়া আসেন, সেখান হইতে কোন প্রকারে উহার কএকটী পাত হারাইয়া যায় আর পাওয়া যায় নাই।" ক্ষীরোদ বাবুর এ সংবাদ অমূলক নহে। কড়চার প্রথম অংশের কয়েকটা পাত হারা-

---

* সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতিবাদ নব্যভারতে ছাপাইবার রীতি নাই। দুই একটা গুরুতর কথার আলোচনার জন্যই এই প্রতিবাদ এবং ইহার প্রত্যুত্তর একত্রে ছাপাইলাম। নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হইল বলিয়া পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাই। ন, স।

ইয়া গেলে, গোস্বামী মহাশয় ঐ অংশ পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহার নিকটে প্রথম আদর্শ প্রাপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে ঐ অংশটুকু আর প্রাপ্ত নাই। সুতরাং বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ খণ্ডিত ভাবেই পড়িয়া থাকে। অনন্তর শ্রীধাম নবদ্বীপে জগন্নাথ দাস বাবাজীর নিকটে ঐ অংশটুকু পাইলেন। এই পুস্তকের সঙ্গে পূর্ব্ব পুস্তকের সকল স্থানে মিল না থাকিতে পারে, কারণ হস্ত লিখিত পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত-শ্লোকের সংখ্যা বিরল নহে। কিন্তু উক্ত বাবাজী বৈষ্ণব-সমাজে একজন প্রামাণিক লোক বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

গোবিন্দ দাসের কড়চার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি ও সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে ভক্তির বীজ উপ্ত করিতে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় গুণগ্রাহী ও গম্ভীর প্রকৃতি লোককে গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি কোমল ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

৪০১ গৌরাঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত গোবিন্দ দাসের কড়চা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মতি বাবু যে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত আপত্তি সমূহের সহিত ক্ষীরোদ বাবুর যদি ঐকমত্য থাকে, তাহা হইলে, দীনেশ বাবুর প্রচারিত ঐ অংশটুকু পাঠ করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

গোবিন্দ দাস কর্ম্মকার কি কায়স্থ এ যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহার খণ্ডন দীনেশ বাবু করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাস যে কর্ম্মকার ছিলেন, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে আমারা তাহার অখণ্ড প্রমাণ পাইয়াছি যথা—

"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস নদীয়া গঙ্গা পার।"

আরও ১৩০৪, সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় ২১৩ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গাগনের মধ্যে স্পষ্ট গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের কড়চা নামক যে চৈতন্য-জীবনী প্রচলিত আছে, ইনিই তাহার রচয়িতা।" গোবিন্দ দাসের কড়চাকে সম্পূর্ণ ভাবে বাহির করিবার নিমিত্ত গোস্বামী মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন,একথা আমরা অবগত আছি। কবিতা-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কড়চার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাস্নাত ও সুরভিত কবিতার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বলিত হইতেছে। ক্ষীরোদ বাবু কড়চাকে অসম্পূর্ণ বলিবার কারণ নির্দ্দেশ করিলে পরে আমরা তাহার উত্তর প্রদান করিব।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

প্রতিবাদের উত্তর।

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে গোবিন্দদাসের কড়চার সমালোচনা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়,ঐ সালের কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় পণ্ডিত জয় গোপাল গোস্বামীর সংস্করণ স্বহস্তে বাবু মতিলাল ঘোষ ঘোষণা করেন। ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে

তাহার প্রতিবাদ বাবু বেগোয়ারীলাল গোস্বামী প্রেরণ করিয়াছেন। বেগোয়ারী বাবুর পিতৃভক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি—পিতার নিন্দা অপনোদনে চেষ্টা সৎপুত্র মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তবে চেষ্টা একটু অগ্রে করিলে দেখিতে ভাল হইত। এবং পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীর স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে প্রতিবাদ সুন্দর হইত। জগন্নাথ দাস এখন জীবিত নাই। তাঁহার জীবিত কালে প্রতিবাদ প্রকাশিত হইলে ভাল হইত।

গোবিন্দ দাসের কড়চাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে ছাপাইয়া গোস্বামী প্রভু ভাল করেন নাই, আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম এবং লিখিয়াছিলাম যে, আমরা শুনিয়াছি যে, শিশির বাবুর নিকট হইতে হাতে লেখা পুঁথির কয়েকটা পৃষ্ঠা হারাইয়া যায়। বেগোয়ারী বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, শিশির বাবুর কাছে শুনিয়াই আমরা ওরূপ লিখিয়াছিলাম। তাঁহার এ অনুমানটী সত্য নহে। পাতা কয় খানি শম্ভু বাবুর নিকট হইতে হারাইয়া যায়—শিশির বাবুর নিকট শুনিলে এ অপরাধ শিশির বাবুর স্কন্ধেই আমরা চাপাইতাম না। বস্তুতঃ যে ভাবে গোবিন্দ দাসের কড়চা ছাপান হয়—পুস্তক প্রকাশিত হইবার অনতিবিলম্বে সাহিত্যানুরাগী সমাজে সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এখন কথা হইতেছে যে, গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করা হইয়াছে কি না? বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অমৃতবাজার সম্পাদক পূজ্যপাদ বাবু মতিলাল ঘোষ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ কোন আদালতে আবশ্যক হয় না। মতি বাবুর প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে দীনেশ বাবু যে অনুমান প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা বালকোচিত ও অগ্রাহ্য। জয়ানন্দের গ্রন্থ প্রামাণ্য কি না, নগেন্দ্র বাবু প্রতারিত হইয়াছেন কি না—এ সব কথার এখন মীমাংসা হয় নাই। সাহিত্য বৈঠকে জয়ানন্দ মোকদ্দমার বিচার হইবার বিলম্ব আছে। আয়ার্লাণ্ডের প্রতারণা বাঙ্গালা ভাষায় এখন সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্য পরিষদের অনুগ্রহে রাতারাতি অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে উদয় হইয়াছে—এখন জয়ানন্দের কথায় নির্ভর করিয়া গোবিন্দ দাসের জাতি নির্ণয় করিবার সময় হয় নাই।

মতি বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, নব্যভারতের কোন কোন পাঠক হয় ত তাহা পড়েন নাই। এজন্য মতি বাবুর কথাগুলি এই স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীল জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় যে গোবিন্দের কড়চা ছাপাইয়াছেন, ইহার কিয়দংশ অলীক তাহার সন্দেহ নাই। এই অলীক অংশটী গোড়ার ৫০ পাতা পর্য্যন্ত।

সমগ্র হস্ত লিখিত কড়চা কেবল গোস্বামী প্রভুর নিকটে ছিল। উহার প্রথম হইতে রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্য্যন্ত যে অংশ তাহা রাণাঘাটের বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভু জয়গোপালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া শিশির বাবুকে অর্পণ করেন। তিনি ঐ পাতাগুলি পাইবা মাত্র পাঠ করেন এবং এরূপ বিমোহিত হন যে, উহা বারবার পাঠ করিয়া উহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কাহিনী সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। শেষে এই সংক্রান্ত দুই একটী প্রস্তাবও তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ায় লিখেন। হস্ত লিখিত পাতাগুলি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ফেরত দেওয়া হয় এবং আমাদের যতদূর স্মরণ আছে তিনি উহা "রেইস ও রাইয়তের" সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন।

কিন্তু তিনি উহা ফেরত দেন না এবং এইরূপে আদিম কড়চার গোড়ার পাতাগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

এই ঘটনার পর গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শিশির বাবুর সাক্ষাৎ হয়। যে পাতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া উভয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন—কিন্তু আশা থাকে উহা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারিবে। যাহা হউক, এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, কড়চা খানি ছাপান কর্ত্তব্য। নষ্ট পাতাগুলি পাওয়া যায় ভালই, না পাওয়া যায়, ঐ অংশ বাদদিয়া ছাপা যাইবে এবং তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না যেহেতু ঐ অংশে যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ছিল, তাহা শিশির বাবুর কণ্ঠস্থ আছে এবং অমিয় নিমাই চরিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গোবিন্দের কড়চা ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়া প্রভু জয় গোপাল গোস্বামী আমাদিগকে দর্শন দিয়া বলেন যে, হারান কয়েকটী পাতার নকল তিনি পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঠিক বলিতে পারেন না ঐ সকল অলীক কি না, কিন্তু তাঁহার বাসনা যে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত না হয়। এই নিমিত্ত তিনি ঐ নকল সহিত পুস্তকখানি ছাপিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি আরো বলিলেন যে, নকলটি যদি প্রকৃতই অলীক হয়, তাহা হইলে উহা প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি উহা ধরিয়া দিবেন এবং আসলটুকু হয়ত এই রূপে বাহির হইয়া পড়িবে। গোস্বামীপ্রভু এইরূপে অতি অতি সরল ভাবে এবং যাহাতে অঙ্গহীন অবস্থায় কড়চা খানি প্রকাশিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ নকল তাঁহার প্রকাশিত প্রস্তাবে স্থান দেন। কিন্তু এই নকল সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। এই নকল ছাপায় পুস্তকে প্রবিষ্ট হওয়ায় সমস্ত কড়চা খানি অবিশ্বাস্য হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। কল্পিত অংশের লেখক বড় চতুর, কিন্তু অতি অজ্ঞ, অতি মূর্খ এবং প্রভুর লীলার সামান্য ঘটনাগুলি পর্য্যন্ত অবগত নহেন। এই জন্য তিনি কথায় কথায় ধরা পড়িয়াছেন। লেখক যে আসলটুকু দেখিয়াছিলেন, তাহারও কিছু কিছু পরিচয় তিনি দিয়াছেন। লেখক চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে একটী অতি অলীক ও জঘন্য আখ্যা দিয়া লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে পাঠক তাহার আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আরো অদ্ভুত কথা শুনুন। শিশির বাবু যখন কড়চার প্রথম অংশ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উহাতে কালা কৃষ্ণ দাসের নাম দেখেন না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ বিষয় সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সংগৃহীত নকলে দেখিতেছি যে, কালা কৃষ্ণদাসের নাম রহিয়াছে। লেখক কি অভিপ্রায়ে এই অলীক অংশটুকু লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার কার্য্য অতি ভয়ঙ্কর।

মতি বাবু আরো বলেন যে, গোবিন্দ কায়স্থ বলিয়া মূল গ্রন্থে আপনাকে পরিচয় দিয়াছিলেন এবং পুত্রবধুর তাড়নায় গৃহত্যাগী হন। নকলে গোবিন্দকে কর্ম্মকারও স্ত্রীর তাড়নায় গৃহত্যাগী বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এমন স্থূল বিষয়ে এমন পরিবর্ত্তন কেন হইল, আমরা বুঝিতে পারি না।

দীনেশ বাবু বলেন যে, প্রকাশিত পুস্তকের প্রথমাংশের রচনা ও পরবর্ত্তী রচনা সর্ব্বতঃই, এক লেখনীর ছাপবিশিষ্ট। কি ভাব, কি ভাষার কোনরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়

না। মতি বাবুর দৃষ্ট কয়েক পৃষ্ঠা কি ছিল, তাহা এখন পাওয়া যাইবার সম্ভব নাই—কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তুলনায় সমালোচনা করা চলে না।

সম্ভবতঃ দীনেশ বাবু আয়র্লাণ্ডের জুয়াচুরির রহস্য অবগত নহেন। নতুবা অনুমানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উড়াইবার চেষ্টা করিতেন না।

গোবিন্দদাসের কড়চা সম্পাদন রহস্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলিতে বাকী রহিল। পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মতি বাবুর কথা গুলির স্বয়ং প্রতিবাদ করিলে সে কথা গুলি আমরা পরে বলিব।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

তমলুকের ইতিহাস।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

পূর্ব্বে দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক, এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে একটি পুত্র জন্মেন। নাগকন্যার ও মণিপুররাজ-তনয়ার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে সকল পুত্র জন্মেন, তাঁহারা মাতামহ কুলেই চিরবাস করিতেন, সুতরাং ভারতযুদ্ধে তাঁহারা নিহত হন নাই। হিড়িম্বা-গর্ভজাত ভীমতনয় ভীমপরাক্রম ঘটোৎকচ এবং সুভদ্রানন্দন মহাবল পরাক্রম আর্জ্জুনি অভিমন্যুই কেবল মাত্র উক্ত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে শিবির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত সন্তানগণ মহাপাপ দ্রৌণি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রিয়সুহৃৎ কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত-শোক-সন্তপ্তচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্ব্বীর ধরাতল ভোগ করিতে বীতস্পৃহ হইয়া মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়সে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে, ২৪০০ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই 'মহাপ্রস্থান'টি সংঘটিত হয়।" (৫১)

জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি গর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন যে,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড় দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥৩"

সপ্তর্ষিচারোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। (৫২)

"এই বচনটির প্রথম পাদের ব্যাখ্যা এই যে, মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল নির্দ্দেশার্থ

(৫১) আর্য্য দর্শন, দশমখণ্ড, ৩৮৭-৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫২) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করিলে পর শকটাকৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডল অর্থাৎ অগস্ত্যাদিমুনি-নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র মঘাদি নক্ষত্রে ছিল—অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ও পূর্ব্বফল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দারম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কাল-পুরুষ-সংজ্ঞক অধোঽধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকেই মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘা-নক্ষত্র-পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটির অপর পাদের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইতে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গ মুনি এই শ্লোকটী দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮১৯ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে ৪৯৯৮ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের জীবনকাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত ২৫২৬ বৎসর হইতে ২৪০০ বৎসর বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট যে ১২৬ বৎসর থাকে, তাহাই তাঁহার জীবনকাল।" (৫৩) এই গণনানুসারে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ হইতে বর্ত্তমান বৎসর ৪৩৪৫ বৎসর হইতেছে।

এই মহাযুদ্ধের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভারতীয় ইতিহাস লেখক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রায়ই বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া অধিকাংশই অনুমানের উপর নির্ভর করতঃ যে কত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোন মহাত্মা (৫৪) লিখিয়াছেন যে, এই মহাযুদ্ধ খ্রীষ্ট জন্মের ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কোন মহাত্মা (৫৫) লিখিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ খ্রীষ্ট জন্মিবার ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এবং কোন মহাত্মা (৫৬) লিখিয়াছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১২০০ বৎসরের কম নহে। আবার এই সকল দেখিয়া (বোধ হয়) আমাদের স্বদেশী মহাত্মা রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টাব্দের

(৫৩) আর্য্যদর্শন, দশমখণ্ড, ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫৪) "The birth of Parikshita 1115 years before the accession of Chandra Gupta in 315 B. C. that is, in 1430 B. C. By this account the birth of Parikshita, the grandson of Arjuna, took place just six (?) years before the great war in B. C. 1424."—Cunningham.

(৫৫) Vide Cowell's Elphinstone, book III, ch. III, p. 156.

(৫৬) Hunter's brief History of the Indian people, pp. 58-59.

১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ হয়। (৫৭) ফলতঃ ইহার যে কোন মত ধরিলেও তাম্রলিপ্তনগরীর বিশেষ প্রাচীনত্বের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"এক্ষণে আমরা একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট জন্মের চারিহাজার আট বা চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা হইলে ঐ ৪০০৮ বা ৪০০৪ বৎসরের সহিত বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৭ যোগ করিলে ৫৯০৫ বা ৫৯০১ বৎসর পৃথিবীর বয়ঃক্রম পাওয়া যায়। তবে ঐ ৫৯০৫ বা ৫৯০১ বৎসর হইতে বর্ত্তমান কলিযুগাব্দ ৪৯৯৮ বৎসরটী অন্তর করিলে কলি যুগারম্ভের ৯০৭ বা ৯০৩ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরন্তু পৃথিবীর এরূপ সৃষ্টি অসম্ভাবিতও নহে। কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক যুগের আদিতে ও অন্তে পৃথিবীতে খণ্ডপ্রলয় বা জলপ্লাবন হইয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয় প্রভৃতিতে পৃথিবীর কিয়দংশ জলপ্লাবিত হয়। সুতরাং বোধ হয়, কলির ৯০৭ অথবা ৯০৩ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবন হইয়া পাশ্চাত্যভাগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সর্ব্ব বিষয়েই আধুনিক জাতির আধুনিকতা এবং প্রাচীন জাতির প্রাচীনতা বোধটি অস্বাভাবিকও নহে।" (৫৮) এই নিয়মেই (!) উক্ত মহাযুদ্ধের সময় নির্ণয় হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

খিল হরিবংশেও তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—

"ভোজাঃ পাণ্ড্যশ্চ অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।৫৫"
অষ্টাবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথর্ব্ববেদ-পরিশিষ্টেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

ইংলিস-হোম। (২)

ইংরাজের ঘরের আর একটী বিশেষত্ব আমাদের নজরে পড়ে। সেটী ইহাদের একত্রে ভোজনের রীতি। পাঠকেরা জানেন, এদেশের লোকেরা দিনে রেতে চার বার ভোজন করে—ব্রেকফাষ্ট, ডিনার, টি ও সপার। আমি অবশ্য, এখানে মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ ইংরাজ পরিবারদের কথাই বল্‌ছি। কেননা, অনেকে মধ্যাহ্নে ডিনার না খেয়ে লঞ্চ খান এবং রাত্রিতে সপার না খেয়ে ডিনার খান। মোট খাওয়া চার বারই হয়; তবে অবস্থাভেদে বা ফ্যাসান ক্রমে অনেকে মধ্যাহ্নে ডিনার না খেয়ে লঞ্চ এবং রাত্রে সপার না খেয়ে ডিনার খান বলেন। যাই হো'ক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। তা, এই চার বারই, আহারের সময় পরিবারের সকলে একত্রে ভোজন করে। আমাদের দেশের রীতি যেমন ছেলেরা সর্ব্বাগ্রে, তারপর পুরুষগণ এবং সব শেষে স্ত্রীগণ আহার করেন, এদেশে সে রীতি নাই। বাপ-মা, ভাই-বোন্, নিমন্ত্রিত বা অভ্যাগত পুরুষ ও রমণী, বালক ও বালিকা, সকলে এক টেবিলে বসে একসঙ্গে আহার

(৫৭) R. C. Dutt; History of Civilization in Ancient Indi Vol. I. p. 38.

(৫৮) আর্য্যদর্শন, দশমখণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পান করেন। প্রত্যেক আহারে যদি গড়ে আধ ঘন্টা সময় দেওয়া যায়, (কোন কোন খাবারে যেমন ডিনার কিংবা টি তে অনেকে এক ঘন্টার বেশী সময় আহারে যাপন করেন, তাহ'লে অন্ততঃ দুই ঘন্টা বা ততোধিক সময় পরিবারের সকলে একত্রে মিলিত হন। তাহলে, দেখা যাচ্চে, সমস্তদিনের মধ্যে অন্ততঃ দুঘন্টা কি তিন ঘন্টা বাড়ীর সকলে বাপ-মা ভাই-বোন—মিলিত হন, একসঙ্গে সকলের সহবাসে কালাতিপাত করেন। আমরা যেমন কেবল মাথা গুজে খেতেই মত্ত থাকি, খাবার সময় এদেশে সে রীতি নয়। খাবার সময় যত রাজ্যের নানা কথা কয়ে, সময়টা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে কাটান হয়। প্রফুল্ল হৃদয়ে, গল্প গাছা করতে করতে এবং ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করে আহার করলে ভুক্ত পদার্থ যেমন সহজে জীর্ণ হয়, এবং সেই জন্য শরীরের যেমন বলাধান করে, এমন আর কিছুতেই নয়। ইংরাজ-পরিবার আহার প্রক্রিয়ার এই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক অংশের মূল্য বিশেষরূপে বুঝে। কিন্তু ইহা ছাড়া একত্র ভোজনের আর একটী অবান্তর ফল আছে। বাপ-মা খেতে খেতে কেবল খোষ-গল্প করেন না। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গল্প করেন। খেতে খেতে পিতামাতার মুখে এই সব কথা শুনে শুনে ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়স হতেই কতই না অভিজ্ঞতা লাভ করে। তা ছাড়া, মস্তিষ্ক ও চিন্তা শক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য খাবারের সময় বাপ মা ছেলেদের সঙ্গে নানা আমোদজনক খেলার অবতারণা করেন। ইহাতে অজ্ঞাতসার ছেলেদের মানসিক বৃত্তির কত উপকার সাধন হয়। আমি আপনার পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। যদিও অন্য মজলিসে বসে এ রকম খেলা যেতে পারে এবং খেলাও হয়, তাহলেও, অনেকস্থলে, ছেলে-মেয়েদের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য খেতেখেতেই এরকম খেলা হয়। আর তা যে খুব ভাল, তার কোন সন্দেহ নাই। কেননা, পেট ঠাণ্ডা হতে হতে অল্প অল্প করে আমোদের ছলে মনোবৃত্তির চর্চ্চা, এক অতি প্রশস্ত পন্থা, নিশ্চয়ই। তাই বল্‌ছিলাম, একটী খেলা হচ্চে, বর্ণ-যোজনার। মনে করুন ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ এই ছয়জনে এক টেবিলে বসে আহার ক'রছে। ক, মনে মনে একটী শব্দ ঠিক করে বল্লে যে, তার প্রথম অক্ষরটী হচ্চে অ। খ কে এখন, অ-কে প্রথম অক্ষর নিয়ে মনে মনে আর একটী শব্দের কথা ঠিক করতে হবে। মনে করুন, ক মনে করেছিল, "অবিনাশ" কিন্তু খ "অধম" মনে ভেবে অ-র পর দ্বিতীয় অক্ষর "ধ" ব'লেছে। এখন যদি গ তৃতীয় অক্ষর "ম" বলে, তাহলে পদটী পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তাহলে গ-র (খেলার ছলে) মৃত্যু হবে। সুতরাং গ আপনাকে বাঁচাবার জন্য এমন কোন একটী শব্দ ভাবিবে, যার প্রথম দুই অক্ষর অ-ধ হবে, অথচ, তার বলা অক্ষরটী নিয়ে একটী পূর্ণ শব্দ হবে না। মনে করুন, গ বল্লে ধ-এ হ্রস্বই। তাহলে শব্দটী এমন হ'ল "অ-ধি"। ঘ এখন ভাববে তার পরের অক্ষর—যাতে অবশ্য শব্দটী পূর্ণ হয়ে সে না 'মরে'। মনে করুন যেন গ, "অধিকরণ" শব্দ মনে ঠিক করে ধ-এ হ্রস্বই বলেছিল। ঘ হয়ত—"অধিকৃত" ভেবে বল্লে কৃ, এখন শব্দটা দাঁড়াল "অধি কৃ"। চ-কে এখন ভাবতে হবে, তার পরের এমন অক্ষর, যাতে সে না মরে। আমরা দেখছি, এ উদাহরণটীতে চ আপনাকে কোন মতেই বাঁচাতে পারবে না। কেননা, বোধ হয়, অধিকৃত

ছাড়া, "অধিক" নিয়ে আর কোন শব্দ গঠন করা যেতে পারে না। যাই হোক্, এইরূপ চর্চ্চায় ছোট ছোট ছেলেদের কেবল নয়, অনেক যুবক যুবতী ও প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারাও অনেক ফল ও আমোদ লাভ করতে যে পারে, তা বোধ হয় পাঠক অস্বীকার করতে পারবেন না। ইহাতে কেবল বর্ণজ্ঞান নয়, চিন্তাশক্তির বিকাশ ও বিস্তার জন্মে। ভাবুন দেখি, খেতে খেতে বাপমার সঙ্গে বসে কচি কচি ছেলে মেয়েদের এ রকম চর্চ্চা কত শিক্ষণীয় ও কল্যাণজনক। আর একটী খেলা ছেলেরা টেবিলে খেতে খেতে বা অন্য সময়ে সচরাচর খেলে। পাঠক, আপনি মনে করুন, নিমন্ত্রিত হয়ে এ রকম পরিবারের সঙ্গে একত্র ভোজন করছেন, আপনার সম্মুখে ও পাশে হয়ত প্রফুল্ল আনন, আহ্লাদ-বিস্ফারিত বিশাল নেত্র, গোলাপ গঠন, গোলাপী ওষ্ঠ ও অধর, সুবেশ, সুঠাম, সুপরিষ্কার, সুপরিচ্ছন্ন ছোট ছেলে মেয়েরাও উঁচু উঁচু (ছেলেদের খাবার ও বসবার সুবিধার জন্য টেবিল উঁচু বলে, তাদের চেয়ার উঁচু করতে হয়) চেয়ারের টেবিলের ধারে ব'সেছে। আপনার সঙ্গে একবার পরিচয় হ'লে দু চারটী কথা কয়ে একবার তাদের স্বাভাবিক সলাজভাব দূর করে দিতে পারলে, তারা আপনার সঙ্গে কত নানা কথা কইবে। হয়ত, তার মধ্যে একজন আপনাকে বলবে, মশায়, আপনি একটা কোন জিনিসের নাম মনে করুন, আমি বলে দেব কিম্বা আমার এই ছোট বোনটী বলবে। আপনি বল্লেন, বলবে, আচ্ছা বল, আমি মনে করেছি। ছেলেটী আরম্ভ করবে এই বলে যে, আপনার ভাবা কথাটী খনিজ, উদ্ভিদ বা জান্তব পদার্থ কি না, (whether it is mineral, vegetable or animal) তারপর আপনাকে জেরার উপর জেরা, তার উপর জেরা করে ক্রমে আপনার মনের কথা টেনে বার করবে। এক এক ছেলে এ সম্বন্ধে এমন দক্ষতা দেখায় যে, আশ্চর্য্য না হয়ে থাকা যায় না। এ রকম টেবিলে খেতে খেতে কোন অভ্যাগত ব্যক্তি একবার মহারাণীর হাতের অঙ্গুরীয়কের কথা মনে করেছিলেন, আর একজন ছেলে নাকি তাঁকে জেরা করে করে শেষকালে বলতে পেরেছিল যে, তিনি মহারাণীর হাতের আংটি মনে করেছেন! অবশ্য এর মধ্যে কোন যাদু খেলা নাই, অথবা স্পিরিচুয়ালিষ্টদের "অটরিডিং"র বাহাদুরীও নাই। এ এক সরল খেলা। খেতে খেতে বা পাঁচ জনের সঙ্গে এক মজলিসে বসে পরস্পরের চিত্ত-রঞ্জনের জন্য এ রকম খেলার অবতারণা। তা ইংরাজ পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাপ মার কাছ থেকে, অতি অল্প বয়সেই এ সব চিত্ত-রঞ্জক ও মস্তিষ্ক-বিকাশক, চিন্তা পরিসারক বিশুদ্ধ আমোদে ও খেলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে। খেতে খেতে এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ দ্বারা, ইংরাজ বালক বালিকার, কুমার কুমারীর যে শারীরিক ও মানসিক অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তা কে অস্বীকার করবে? ইংরাজ জাতির মহত্ত্ব-সৌধের ইষ্টকগুলি ইংলিশ-হোমের এমনি সকল বিশুদ্ধ ও অনুকূল অবস্থার মধ্যে পরিগঠিত হয় বলিয়াই, আজ মুষ্টিমেয় ইংরাজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থান অজেয় বাহুবলে ও অমিত বুদ্ধি কৌশলে অধিকার করিয়া জগতের সমূহ বিস্ময়ের একমাত্র উদাহরণস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৈকালীন চা পান ইংরাজের ঘরে এক বিখ্যাত প্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠান। অভ্যাগত

দর্শক, বন্ধু-বান্ধব, বা আত্মীয়গণ পরস্পরের সহিত দেখাশুনা ক'রবার জন্য অন্য যে-সে সময়ে না এসে, প্রায়ই বৈকালে, ডিনার খাওয়ার পর আসেন। সুতরাং দেখা ক'রে ফিরে যাবার পূর্ব্বে প্রায়ই এক কপ্ টি খেতে অনুরুদ্ধ হন। আরো লোককে নিমন্ত্রণ করে অল্প স্বল্পের মধ্যে আহার পান করিয়ে তাঁর তৃপ্তি সাধন করা, বৈকালীন চা দ্বারা যেমন হয়,আর কিছুতেই তেমন হয় না। তাই যদি কারো সঙ্গে একবার আলাপ হল, প্রথম খাবার নিমন্ত্রণ প্রায়ই এই টি-তে। এই জন্য ইংরাজের ঘরে afternoon tea এত প্রসিদ্ধ। তা ভাবুন, বৈকালে বা খাবার সময় বাড়ীর লোকগুলি ভিন্ন আরো দু এক-জন অভ্যাগত বা বন্ধু বা আত্মীয়ের সমাগম হয়। সুতরাং, এক টেবিলে বসে খাবার রীতি চলে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে-রাও ইহাদের সকলের সহিত বসে চা-পান করে এবং অন্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের যে সকল কথোপকথন হয়, তার উপকার লাভ করে। আমাদের দেশে বালকেরা বয়স্কদের সহিত মিশিতে পায় না; অনেক স্থলে পিতা মাতা এরূপ মিশ্রণ অনুমোদন করেন না। ছেলে ছেলের সঙ্গে মিশিবে, বুড়ো বুড়োর সঙ্গে মিশিবে; ছেলেতে বুড়োতে মিশলে খারাপ ফল হবে কিম্বা ছেলে বেয়াদব হবে—আমাদের দেশের বোধ হয়, অনেকের এ রকম একটা ধারণা আছে। আমরা তাই অনেক সময়েই ছোট ছেলেদের বয়স্কদের সঙ্গে মিশিতে বা বেশী বাক্যালাপ করিতে দিই না। এ দেশে পরস্পর মিশ্‌তে কি বাক্যালাপ ক'রতে, এমন কি নির্দ্দোষ ব্যায়াম বা ক্রীড়া ক'রতে বয়সের পার্থক্যের কোন বাধাবাধি নাই। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ বেশ সরলভাবে নানা গল্প ক'রবেন, নানা প্রকার সরল ও আমোদজনক খেলা খেলবেন। ইহাতে বয়স্ক ব্যক্তির যেমন সম্মানের লাঘব হয় না, তেমনি, সুকুমারমতি বালক বালিকারও শরীর মন ও চরিত্রগত কোন মন্দ ফল জন্মে না। পরন্তু সর্ব্বথা সুফলপ্রদ হয়। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা হয়ত অন্য আহারের সময় কেবলি বাপ মার সঙ্গ পায়, কিন্তু টি-র সময় বাপ মা ছাড়া অন্য পাঁচ জনের সহবাস সম্ভোগ করে। আর নিশ্চয়ই সবাই একত্রে বসে নানা বিষয়ে গল্প করে ব'লে, ছেলেরা অজ্ঞাতসারে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ইংরাজ-ঘরের fire place আর একটী সুন্দর আকর্ষণ। আমরা অনেক সময়েই শুনি, একটী যুগল কথা—Hearth and Home —ইংরাজের Hearth ইংরাজ ঘরের এক অতি পবিত্র ও সুখপ্রদ স্থান। 'হোমের' সকল স্মৃতি 'হার্থের' সহিত অবিচ্ছিন্ন ডোরে গাঁথা। ঘরের সকল সুখ ঐশ্বর্য্য, সকল শান্তি সান্ত্বনা, সকল আমোদ প্রমোদ,সকল ঐকান্তিকতা ও বিশেষত্ব—রান্না ঘরের আগুন-গোড়ার সহিত যেন একীভূত। যদি ইংরাজকে স্বদেশের জন্য উত্তেজিত করিবার আবশ্যক হয়, কেবল "to defend your your home" বল্লে হবে না; বল্‌তে হবে "to defend your *hearth* and home" কেন? পাঠক কি বোঝেন, ইংরাজ-গৃহের অন্য সব ছেড়ে ইংরাজ নিজের উনুনের এত পক্ষপাতী কেন? স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, ভাই গেল, বন্ধু গেল, ঘর সংসার সকলি গেল; কিন্তু স্বদেশ-বৎসল ইংরাজ ঘরের উনুন গোড়ার জন্য হৃদয়ে তপ্ত শোণিত দিতে এত তৎপর কেন হয়? আছে; অতি নিগূঢ় মর্ম্মস্পর্শী কারণ আছে, নৈলে 'প্রাকটি-

ক্যাল ইংরাজ ঘরের সামান্য অগ্নিকুণ্ডের জন্য,—সামান্য উনুন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রত না। অবশ্য, প্রথমতঃ,উনুন না হলে, জন বুলের 'বিফ্-ষ্টেক' কোথায় রান্না হবে? আর বিফ্ ষ্টেক না হলে জনবুলের জীবন-ধারণ অসম্ভব—একথা দুবার ব'লবার আবশ্যক নাই। কিন্তু বিফ্ ষ্টেক না খেয়েও যদি প্রাণধারণ সম্ভব হয়, নিদারুণ শীতের ভয়ঙ্কর অত্যাচার নবারণের জন্য এবং শীতের কঠোর হস্ত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আগুন না পোয়ালে প্রাণরক্ষা করা দায়। যখন ডিসেম্বরে সুমেরু প্রান্ত হতে বরফ মিশান কন্‌কনে হাড়ভাঙ্গা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, যখন তুষার স্তূপে গাছ পালা, মাঠ ঘাট, পথ-প্রান্ত, গৃহ-প্রাঙ্গণ, স্থল জল পরিপূর্ণ হয়ে যায়, গভীর অগভীর জলাশয় জমে বরফ হয়ে পড়ে, বাহিরে বেরুলে শরীরের শোণিত শিরা ও ধমণী ছেড়ে ত্বক্ বিদারণ করে স্ফূরণ হতে চায়; যখন গৃহ-মধ্যে বস্তা বস্তা কম্বল, মোটা মোটা পশমী মোজা, প্যান্টালুন, কোট ও ওভারকোট, নানা পশু-লোম গায়ে জড়িয়েও নিদারুণ শীতের প্রকোপ এড়ান যায় না, দাঁতে দাঁতে লেগে যায়, হস্ত পদের অঙ্গুলি গ্রন্থিগুলো যেন খসে পড়ে—জীবনের সোয়াস্তি একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, জীবন-ধারণ এক বিড়ম্বনার বিষয় হয়—তখন পাঠক, ভাবুন দেখি, ঘরের মধ্যে খুব জলন্ত আগুন-গোড়া কত সুপ্রিয়, কত প্রাণপ্রদ,কত আরামজনক, কত অমূল্য, কত সান্ত্বনার! ঘরের অন্য সব অংশ পরিত্যাগ করে, সংসারের অন্য সহস্র আবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করে, এমন কি, শরীর ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক যে আহার, তাও পরিত্যাগ করে কে আগুন পোয়াতে ইচ্ছে করেনা? অন্য সবার চেয়ে গৃহের উনুন বা অগ্নিকুণ্ড কি বিশেষ প্রিয় বোধ হয়না! নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবল তাই নয়। ইংরাজের "হার্থ" ইংরাজের বিফ্-ষ্টেক-প্রস্তুত করে, ইংরাজকে নিদারুণ শীতের হস্ত হতে রক্ষা করে। এই দুই না করলে ইংরাজজাতি এতদিনে কোনকালে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হতে অন্তর্হিত হত; ইংরাজের পৃথিবীব্যাপ্ত বর্ত্তমানের এ মহত্ব সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকত। ইংলিশ-হার্থ ইংরাজের শরীর পোষণের ও শরীর ধারণের যেমন প্রভূত-সহায়, তেমনি ইংরাজের মনোবৃত্তি গঠনের,ইংরাজ চরিত্রের নানা মহৎ গুণ সঞ্চারের এক প্রধান ক্ষেত্র। শীতার্ত্ত ইংরাজ-পরিবার দিবসের নিত্য কর্ম্ম সমাপন ক'রে, আহারাদি শেষ ক'রে, সন্ধ্যার পর সকলে একত্রে এই আগুনের চারিপাশে বসে, অগ্নির সুমধুর উত্তাপ সম্ভোগ করতে করতে নানা কথায় ও আন্দোলনে সময়াতিপাত করে। যতক্ষণ শোবার সময় না হয়, ততক্ষণ পরিবারের সবাই মিলে আগুন পোয়াতে পোয়াতে নানাবিধ মানসিক চর্চ্চা ও অনুশীলনে,আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করে। শীতের জন্য বাড়ীর বাহির হবার যো নাই। কাজেই সকলকে একত্রে আগুন গোড়ায় বসতে হয়। অবশ্য ধনীর ঘরে কিছু রান্নাঘরের আগুন-গোড়ায় বসে আগুন পোয়াতে হয় না। গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে সেই প্রশস্ত স্থান। ঘরে ঘরে আগুন করতে গেলে ঢের খরচ হয়। সুতরাং রান্নাঘরের এক আগুনেই রান্না ও আগুন-পোয়ান, দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইংরাজের 'হার্থ' তাই এত প্রিয়। ইংরাজ বালক বালিকার আহারের সময় যেমন বাপমার সঙ্গে নানা গল্প গাছা ক'রে অভিজ্ঞতা লাভ করে,তেমনি বাপমার সঙ্গে আগুন-গোড়ায় বসে নানা গল্প গাছায় নানা শিক্ষা লাভ করে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, অতি বাল্যকাল হতেই ইংরাজ শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ভার বাপ মার হাতে পড়ে। ইংরাজ-শিশু বাপমার সঙ্গেই জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করে। পিতামাতার সহবাসে ও সুদৃষ্টান্তে, সদুপদেশে ও যত্নে ইংরাজ বালক বালিকা মানুষ হয়। ঘরে বাহিরে, আহারে উপবেশনে, সকালে ও সন্ধ্যায় পিতা মাতা; পিতামাতা বই অন্য কাহারও সঙ্গ নয়। খাবারের টেবিলে বসে খেতে খেতে বাপ মা শিক্ষা দিচ্চেন ও সদুপদেশ দিচ্চেন; আগুন-গোড়ায় বসে আগুন পোয়াতে পোয়াতে বাপ মা ছেলেদের সুনীতি শিক্ষা দিচ্চেন; পথে বেড়াতে বেড়াতে বাপ মা ছেলেদের বাহ্য-জগতের প্রকৃতির নানা রহস্য মর্ম্ম বিশদ করে বলে দিচ্চেন; ক্রীড়াভূমিতে ছেলেদের সহিত খেলতে খেলতে অপরোক্ষ ভাবে বাল শরীরের সুচারু গঠন ও উন্নতি সাধন করছেন। ছেলেরাও আশৈশব পিতা-মাতা বই আর কাহাকেও জানেনা এবং বাপমার স্নেহ-যত্নে লালিত পালিত হ'তে হ'তে আপন আপন 'হোম' ও 'হার্থের' চারিপাশে প্রীতিজনক ও স্নেহমমতাপূর্ণ নানাবিধ মিষ্ট ও মধুর ভাবের স্মৃতি-উর্ণা দ্বারা এমন এক মধুময় স্বর্গের সৃষ্টি করে, যে কিছুতেই সে স্বর্গরাজ্য-শোভা অপসারিত হয়না। আমরণ হৃদয়ে স্বর্গের সুষমাপূর্ণ, অতি পবিত্র অতুল্য স্মৃতি জাগান থাকে।

আমাদের "ঘরে" ও ইংরাজের "ঘরে" আর একটী পার্থক্য দেখতে পাই। আমরা ইংরাজের মত নির্ম্মল, নির্দ্দোষ আমোদের চর্চ্চা ঘরে করি না। পিতামাতার নিজেরাও করবেন না এবং ছেলেদেরও করতে দেবেন না। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, শরীরের উন্নতির জন্য যেমন আহার ও ব্যায়াম চাই, মনের উন্নতির জন্য তেমনি নির্ম্মল আমোদ ও অধ্যয়ন চাই। আমরা শরীরের জন্য আহার করি, মনের জন্য পড়াশুনা করি। ব্যায়াম বা আমোদ আমরা ভাল চক্ষে দেখিনা। আমাদের এইরূপ অভ্যাসের বা ধারণার কুফলের সহস্র উদাহরণের উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি দেখি, ইংরাজের ঘরে সমানঃভাবেই শরীর ও মনের উন্নতি-বিধায়ক ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত আছে। ছেলেপিলেদের নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করা সম্বন্ধে এদেশের পিতা-মাতাদের মনের ভাব খুব উদার। তাই দেখতে পাই, ইংরাজের ঘরে নানা বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের, হাসির উচ্ছ্বাসের, চিত্ত-রঞ্জনের নানা উপায়ের অভাব নাই। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায় প্রতি গৃহ হতে সুমধুর পিয়ানোর ধ্বনি উত্থিত হচ্চে। তার সঙ্গে হয়ত যুবতীর কলকণ্ঠ-নিস্বন অথবা বালক বালিকার উচ্ছ্বাসময় গীতি লহরীতান মিলিত হয়ে অতি সুস্বরে সুলয়ে তোমার কর্ণকুহরে প্রীতি রসের সঞ্চার করছে। আমরা যেমন বাদ্য ও গীতকে সব সময়ে ভাল চক্ষে দেখিনা, এ দেশের রীতি তা নয়। পুরুষ কিংবা স্ত্রীর অন্য পাঁচ বিষয়ে অন্য পাঁচ রকম সদ্গুণে ভূষিত হবার ন্যায়, গীত ও বাদ্য পারকতা প্রদর্শন একটা বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। কেবল বিশেষ গুণ নয়, এক অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য গুণ। বিশেষতঃ মেয়েছেলেদের সম্বন্ধে দুটো গান গাহিতে শেখা, ও দুটা গৎ বজেইতে শেখা ইংরাজ বালক বালিকার (অবশ্যঃ বালিকাদেরই বেশী) নিত্য নৈমিত্তিক, আহার পানের ন্যায়, ক্রীড়া ও ব্যায়ামের ন্যায়, শিক্ষা ও আলোচনার ন্যায়, জীবনের এক প্রধান অঙ্গ

হয়ে দাঁড়ায়েছে। এজন্য দেখা যায় সামান্য মুদী পশারি, তেলি তামালি, মুচি কসাই, ফুল ফল-ওয়ালা থেকে মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের ঘরে ঘরে অন্ততঃ একটী পিয়ানো আছে। গৃহিনী, সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে, অবসর হলেই দুদণ্ড পিয়ানো নিয়ে বাজাচ্চেন, ছেলেমেয়েদের বাজনা ও গান শেখাচ্চেন। সন্ধ্যার পর, স্বামী পুত্র কন্যায় পরিবেষ্টিত হয়ে, হয়ত শীতকালে ঘরে আগুন পোয়াতে পোয়াতে পিয়ানো যন্ত্র সহযোগে বিশুদ্ধ সংগীতালাপেতে শীত ঋতুর সুদীর্ঘ রজনীর নিরানন্দতা বিদূরিত করছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হয়ত মা'র পাশে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে, আনন্দবিকশিত চক্ষু মেলে, মা'র সঙ্গে সমতানে গাচ্চে। বয়স্কা ভগিনী হয়ত ছোট ভাই বোন্‌দের নিয়ে বাপমার সমক্ষে সুন্দর গান গাচ্চেন,বাজনা বাজাচ্চেন, অথবা সবাই মিলে গান অভ্যাস করছেন। পাঠক! ভাবুন দেখি, এ দৃশ্য কেমন? ইহা কি অনাবিল স্বর্গের ছবি নয়? ইংরাজের ঘরে ঘরে এই সুন্দর স্বর্গের ছবি প্রতি নিশায়, প্রতি সন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

বাপ মার সঙ্গে গান বাদ্য করে বলে কি ইংরাজের ছেলে মেয়েরা "বয়ে" যায়? তা যায় না। বরং তাদের নৈতিক রীতি পদ্ধতি বিশুদ্ধ হয়। আমাদের দেশের মত, বাপ মাকে লুকাইয়া, মন্দ স্থানে ও মন্দ সংসর্গে গিয়া, ছেলেদের চিত্ত বিনোদনের এই স্বাভাবিক বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করিতে হয় না। বরং ইংরাজ পিতামাতা ছেলেপিলেদের অতি বাল্যকাল হতেই গীতবাদ্য শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করেন। সে জন্য এ দেশের ছেলেদের গান বাজনা শেখবার জন্য অন্যত্রে বা অন্য সংসর্গে মিশে জীবনকে অতি বাল্যাবস্থা থেকেই কলুষিত করতে হয় না। পিতা মাতার নিকট মিথ্যা বা কপটতাচরণ ক'রতে হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা আজও সংগীত ও বাদ্যের উপকারিতা ও নির্ম্মল আমোদ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সংগীত ও বাদ্যচর্চ্চায় কেবল যে একটী স্বাভাবিক মানববৃত্তির অনুশীলন ও বিকাশ সাধন হয়, তাহা নয়, জীবনের কত নিরানন্দ মুহূর্ত্তে, কত বিষাদ ও দুর্ভাবনার মেঘে পরিবেষ্টিত হয়ে, কত নিরাশা ও নিরুৎসাহে চিত্ত বিকৃত হয়ে, কত নানা শারীরিক ও মানসিক অসুখ ও অসোয়াস্তির মধ্যে পড়েও,—গীত বাদ্যানুশীলনে জীবনে শান্তি পাই,—মনের বিশ্রাম পাই, চিন্তা দুর্ভাবনা এড়াই, পীড়ার যাতনা ও মানসিক বিকার হতে অব্যাহতি লাভ করি! ইংলিস-হোম তাই ধন্য, ইংরাজের ঘর তাই সুখের আকর, ইংরাজ তাই সৌভাগ্যবান, যে নিজের ঘরে বসে, বাপমার সঙ্গে একত্রে সংগীত ও বাদ্যের এমন এক অপার্থিব বিমল আনন্দভোগ ক'রতে পায় এবং সেই আনন্দ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সম্ভোগ করে নিজের ভবিষ্য জীবন পরিগঠন ক'রতে পারে।

দিবানিশি পুঁথি নিয়ে মুখগুজে পড়াশুনা ক'রলেই যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী ঘরের ছেলেরা কোন যুগে মানুষ হয়ে, হয়ত একবারে মানুষের বার হয়ে যেত। কেননা, আমাদের বাপমারা ছেলেদের পড়া শুনা বই অন্য কিছু ক'রতে দিতে নিতান্ত নারাজ। ছেলে রাতদিন যাতে বই নিয়ে পড়ে, খেলাদেলায় এক মুহূর্ত্তও সময় না দেয়, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের এক

বিন্দুও আস্বাদ না পায়, বাপমার তাই আন্তরিক ইচ্ছা। সেইজন্য, সেই উদ্দেশ্যে পিতামাতারা বাচনিক বা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর উপায়ে, যেমন দৈহিক শাসনে, কোমলমতি গরিব বালকদের প্রাণে প্রতি নিমেষে নির্ম্মল আমোদ প্রমোদের প্রতি, বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম বা ভ্রমণের প্রতি যাতে একটা আস্থা না বাড়ে, তার সবিশেষ চেষ্টা করেন। সৌভাগ্যের বিষয় নিশ্চয়ই ইহা আমি আমাদের সমগ্র জাতির সৌভাগ্যই মনে করি, ছেলেরা পিতামাতার সহস্র সাবধানতা সত্ত্বেও, পিতামাতার নানা কঠোর শাসনের ভয় থাক্‌লেও, বাল-স্বভাব-সুলভ এবং বাল-শরীর মন পরিবর্দ্ধনোযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় খেলাদেলা, তাঁদের অজ্ঞাতসারে করে। পিতামাতার অপ্রিয়ভাজন হবার সমূহ আশঙ্কা সত্ত্বেও ছেলেরা লুকিয়ে চুরিয়ে দু দণ্ড হাঁপাহাঁপি, দাপাদাপি ও ছুটোছুটি ক'রে নিয়ে শরীর মনের উন্নতি সাধনের সহায়তা করে নেয়। নৈলে, আগে যেমন বলেছি, যদি বাঙ্গালীর ছেলেরা ঠিক বাপমার আদেশ ও উপদেশে চলে, খেলাদেলা, আমোদ পরিত্যাগ করে, কেবল মানসিক উন্নতির জন্য পুস্তিকালয়েই দিন কাটায়, তাহলে আমাদের বাঙ্গালীর ছেলেরা আজ কোন্ কালে মানুষের বার হ'য়ে যেত!

ইংরাজ পিতামাতা সন্তানদের জন্য ঘরে ও বাহিরে এত নানা ক্রীড়ার উপাদান, আমোদের উপকরণ সংগ্রহ করেন ও যোগান যে, তা দেখ্‌লে ও ভাব্‌লে, আমাদের ঘরের পদ্ধতির সঙ্গে এদের ঘরের পদ্ধতি, ধারা ও রীতি আকাশ পাতাল প্রভেদ মনে হয়। আমরা আগেই বলেছি, শরীর ও মনের সমবায় উন্নতি সাধনের জন্য, কেবল আহার ও পাঠ করলেই হয় না। শরীর পোষণের জন্য যেমন আহারের আবশ্যক, তেমনি, শরীরের সুচারু ও সবল পরিবর্দ্ধন ও পরিগঠনের জন্য ব্যায়াম ও ক্রীড়া অত্যাবশ্যক। মনের উন্নতির জন্য যেমন পড়াশুনা নিতান্ত দরকার, তেমনি, মনের স্বাস্থ্যকর বিকাশের জন্য নানা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ দ্বারা মানসিক চর্চ্চার কঠোরতা হতে নিয়মিতরূপে যাহাতে মন বা মস্তিষ্ক শিথিলতা লাভ করিতে পারে, সেরূপ উপায়াবলম্বনও নিতান্ত দরকার। বলা বাহুল্য, ইংরাজের ঘরের ছেলে মেয়েরা এ সম্বন্ধে আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের চেয়ে অনেক গুণে ভাল অবস্থাপন্ন। যাতে প্রতিদিন ছেলেরা নিয়মিতরূপে কোন না কোন বাহিরের খেলা খেল্‌তে পারে, সে সম্বন্ধে পিতামাতা বিশেষ মনোযোগী হন। আমাদের দেশে যদি ছেলে একটা ব্যাট কেনে, সে কথনই পিতার নিকট ব্যাটের দাম চাহিয়া নিতে পারে না, অথবা পিতার অনুমতি ক্রমে ব্যাট কিনতে পারে না। ছেলের খেলবার জন্য ব্যাট ও বল কিনে দেওয়া আমাদের দেশে পিতা মাতার পক্ষে তাজ্জব ব্যাপার! সুতরাং সেরূপ কোন ইঙ্গিত করতেও আমি সাহসী নই। কিন্তু আমাদের দেশে, পিতামাতার ছেলের খেলার সম্বন্ধে এরূপ অনাস্থা দেখেন ব'লে, অনেক স্থলেই ছেলেরা নিজেদের জলখাবার পয়সা বাঁচিয়েই হোক্, অথবা পিতার বা মাতার বাক্স হতে অসদুপায়ে টাকা পয়সা বার করে নিয়েই হোক্ ব্যাট ও বল কিনিতে বাধ্য হয়। অনেক বাপমাই জানেন বা জান্‌তে পারেন, ছেলে ক্রিকেট খেলে, কিন্তু ছেলে যে কোথা হতে পয়সা পায়, তার খেলার সরাঞ্জাম কেনবার, খুব অল্প বাপমা

তার খোঁজ রাখেন বা করেন। তার ফল হয় এই যে, অতি অল্প বয়স হতেই ছেলে কুনীতি অভ্যাস করে।

এখানে দেখুন, পিতা নিজে ছেলের জন্য ব্যাট বল কিনে দিচ্চেন, নিজে ছেলের সঙ্গে কোট খুলে কামিজের আস্তিন গুটিয়ে ক্রিকেট খেলছেন। মা ছোট ছেলেদের নিয়ে নানাবিধ দৌড়-ধাপড়, খেলাদেলা করছেন। পিতামাতা ছোট ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে টেনিসের সময় টেনিস খেলছেন। যদি ছেলেরা খেলতে অপারক হয়, তাহাদের বাপ মা হয় ত টেনিস খেলেন, ছেলেদের বল কুড়াবার জন্য নিয়োগ করেন। ইহাতে ছেলেদের আমোদ ও উপকার দুই হয়। অতি ছোট ছোট ছেলে মেয়ের হাতে ব্যাটবল, র্যাকেট সচরাচরই দেখা যায়। আর যদি কোন ক্রীড়া প্রাঙ্গণে বা প্রকাশ্য পার্কে যাওয়া যায়, দেখা যাবে, অতি ছোট ছোট পাঁচসাত বছরের ছেলে মেয়েরা টেনিস খেলছে, ক্রিকেট খেলছে এবং আর কত অশেষ প্রকারের খেলাদেলা করছে। পিতামাতা, খেলা করতে অনুৎসাহ না দিয়ে বরং সম্পূর্ণরূপে উৎসাহই দেন।

এদেশের ছেলেরা তাই খেলাদেলার জন্য পিতামাতাকে ভয় করে না। বাইরে হোক্ আর ঘরের মধ্যে হোক, ছেলেরা অবাধে ও নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে বাপমার সঙ্গে অথবা সমক্ষে নানাপ্রকার খেলা খেলে শরীর মনের অশেষ উপকার সাধন করে। আমাদের দেশের ছেলেদের মত খেলবার জন্য, একটু আমোদের জন্য, ঘরের কোণে লুকাতে হয় না, অথবা পিতামাতার অজ্ঞাতসারে পরের বাড়ী কি অন্যত্রে কি অন্য সংসর্গে মিশিতে হয় না। আশ্চর্য্য! আমরা সবাই জানি, খেলা দেলা ও আমোদ করা ছেলে স্বভাবেই হোক্, বুড়ো স্বভাবেই হোক্, কত স্বাভাবিক। অথচ, আমরা যাই ছেলেদের হাত বেঁধে রাখতে অথচ আমাকেই খেলাদেলা হতে ছেলেদের দূরে রাখতে। আমরা মনে করি না, মনে রাখি না যে, সেজন্য ছেলেদের কাছে নিজের 'ঘর' কত অল্প আদরের হয়। আমরা মনে ভাবিনা, সেজন্য কত সময়ে আমাদের ঘরে ছেলেরা কুপথে যায়, কুসংসর্গে মেশে, চির দিনের জন্য পিতামাতার জীবনের প্রধান অসুখের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভাবিনা, খেলা দেলার প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে আমার আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে কত কুঠারাঘাত করি। আমরা ভাবি না, আমাদের ছেলেদের খেলাদেলার স্বাভাবিক বৃত্তির রোধ ক'রতে গিয়ে আমরা স্বভাবের নিয়মের কত বৈধাচরণ করি।

নিশ্চয়ই যদি আমরা আমাদের ছেলেদের ছেলে স্বভাব-সুলভ মনের গতি অনুসরণ করে, তাদের অবাধে ও অসংকোচে খেলতে দিই, নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করতে দিই, ক্রীড়া ও আমোদ সম্ভোগ ক'রবার জন্য উপকরণ ও অবসর দিই, তাহ'লে, আমরা অপোরোক্ষভাবে তাদের কুরীতি ও কুনীতি অনুসরণ করা থেকে অব্যাহতি 'দিতে পারি। তাহ'লে ছেলেদের নৈতিক উন্নতি ও আস্থা ক্রমেই পরিশোধিত ভাবে জন্মাবে ও বাড়্বে। আমাদের দেশে এই খেলাদেলা বা আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ছেলেদের বাপমার সঙ্গে একটা লুকোচুরি সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। সেটা যে বড়ই খারাপ, সমূহ অনিষ্টজনক, তার কোন সন্দেহ নাই। পিতা, তাস খেলতে পারবেন, কিন্তু ছেলে পারবে না; পিতা থিয়েটারে যাবেন, ছেলের যাওয়া নিষেধ; বাপ অমুক তামাসা দেখতে গেলেন, ছেলেকে সেখানে নিয়ে

গেলেন না; পিতা মাঠে বা নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন, ছেলেকে হুকুম করে গেলেন, সে সময়ে পড়া মুখস্থ ক'রতে। এই গুলো অস্বাভাবিক ও অনিষ্টকর মনে হয়। এই রকম সব ব্যবহারেই বাপ মা ও ছেলে-দের মধ্যে লুকোচুরি করবার অবসর জন্মায়। ছেলে তাই লুকিয়ে তাস খেলা শেখে, ছেলে তাই লুকিয়ে থিয়েটারে যায়, ছেলে তাই লুকিয়ে "ঘোড়দৌড়" দেখতে যায়। অনেক কাজে তাই ছেলে, পিতার রাগে প'ড়বার ভয় থাকলে লুকিয়েও করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ দেশের সে রীতি নয়। বাপ-মা ও ছেলেপিলের মধ্যে একটা লুকোচুরির সম্বন্ধ নাই। স্বাধীন রাজ্যে, প্রমুক্ত বায়ুতে সবই খোলাখুলি। পিতা যা অন্যায় মনে করেন, তা নিজেও করেন না এবং ছেলেকেও ক'রতে দেন না, যদি আপনি তাস খেলেন, কি থিয়েটারে যান, কি তামাসা দেখতে যান, ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়েই যান। যদি নিজেও না যেতে পারেন, যাতে ছেলেমেয়েদের সে আমোদ সম্ভোগ হতে বঞ্চিত হতে না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাহ'লে দেখুন, বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগের জন্য এ দেশের ছেলেদের পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে কিছুই ক'রতে হয় না। পিতামাতারাই স্বেচ্ছাক্রমে এ সম্বন্ধে ছেলে-দের স্বাভাবিক কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করেন। এক কথায়, শারীরিক বা মানসিক, কোনরূপ ক্রীড়া বা আমোদ সম্ভোগ করবার জন্য ইংরাজের ঘরে ইংরাজকে বাপমার সঙ্গে লুকোচুরি ক'রতে হয় না। পরন্তু,যাতে ছেলেরা সমূহ সুবিধা পায়,সে সম্বন্ধে ইংরাজ পিতামাতা, কায়মনবাক্যে সর্ব্বথা চেষ্টান্বিত হন।

তাহ'লে একবার ভেবে দেখুন, ইংরাজের ঘর বাস্তবিকই কত মনোরম, কত সুরুপ, কত অপূর্ব্ব স্মৃতির কেন্দ্র। কিশোরমতি শিশু সন্তানের শরীর মনের সম্যক উন্নতি সাধনে ইংলিশ-হোম কেমন উপযোগী। এখন কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারি, আমার পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজবৃদ্ধ বন্ধুটির সগর্ব্ব উক্তি—"It is our home that has made us a great nation."—এই সগর্ব্ব পদটী মনে ক'রতে ক'রতে এখন এই মনে হ'ল যে, যদি ইংরাজের "ঘর" ইংরাজকে মহৎ করে থাকে, তাহলে আমাদের "ঘরই আমা-দের নীচ" ক'রেছে। আমাদের জাতীয় অবনতির অন্য সহস্র কারণ থাকলেও আমা-দের ঘরের বন্দোবস্ত, রীতি, ধারা, পদ্ধতি, চালচলন আমাদের সমগ্র জাতির (অতি শোচনীয় যদিও) অবনতি সাধনে এক অতি প্রধান কারণ। দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতির অনেক বীজ আমরা আমাদের "ঘরে" আপনাদের হাতে প্রতিনিয়ত যাপন করেছি। ইংরাজীতে একটা চলিত কথা আছে—"If you sow wind you must reap whirlwind" যদি বাতাস বোন ত ঘূর্ণ-বায়ু কাটতে হবে। আমরা তাই, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন ভাল নয় বলে, ঘরে ঘরে নানা অহিতকর ও অস্বাস্থ্যজনক ফলভোগ ক'রছি। আমাদের ঘরের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতি ও মান-সিক উন্নতির সুব্যবস্থা নাই বলে, আমাদের ছেলে মেয়েরা রুগ্ন শরীর মন নিয়ে, বিরক্ত ও বিকৃত হৃদয় নিয়ে, নিস্তেজ ও নীরস মস্তিষ্ক নিয়ে জগতের হাটে অন্য জাতির তুলনায় অতি খাট হয়ে পড়ছে। বিশুদ্ধ আমোদ ও উপযুক্ত ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার অনুশীলনে আমাদের-শরীর মনে স্বাস্থ্যপ্রদ ভাব ও চিন্তা, সবল উদ্যম, নির্ভীক সাহস, প্রমুক্ত হাবভাব

পূর্ণভাবে স্ফূরিত হতে পায় না। পুত্র কন্যার সহিত পিতা মাতার ভয়ের সম্বন্ধ দাঁড়ায় বলে, বাপ মা ও ছেলে মেয়েদের মধ্যে তেমন একটা সরল উদার বিমুক্ত খোলাখুলির ভাব পরিবর্দ্ধিত হতে পায় না; তেমন একটা অটল নির্ভর, নিশ্চল বিশ্বাস, ঐকান্তিক অনুরাগ, নিঃস্বার্থ মমতা, অনাবিল প্রীতি, অবিচ্ছিন্ন একহৃদয়তা, একপ্রাণতা জন্মায় না। স্বামী স্ত্রী ও পুত্র কন্যার মধ্যে উন্মুক্ত ও সরল, অপ্রচ্ছন্ন ও অসংগুপ্ত একটা অতি স্বাভাবিক মাখামাখির ভাব পরিবর্দ্ধিত হতে পায় না। ইংরাজের "ঘরে" ও আমাদের "ঘরে" সেইজন্য এত তফাৎ। ইংরাজ ঘরের ছেলেতে আর বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেতে তাই এই বিশেষ পার্থক্য। ইংরাজ তাই সবল ও সাহসী, উন্নত-হৃদয়, উন্নত-মস্তিষ্ক, নীতিপরায়ণ, প্রশস্তমনা; বাঙ্গালী তাই দুর্ব্বল, ভীরু, সংকীর্ণ-হৃদয়, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক, শিথিল-নীতি ও কুসংস্কারাপন্ন। ঘরের বন্দোবস্ত, ঘরের পদ্ধতি সর্ব্বাগ্রে সংশোধন না করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি চিরদিনই এক কল্পনার সামগ্রী হয়ে থাকবে।

আমি এ প্রস্তাবে ইংলিস-হোমের অনেক অংশই বিশদ ক'রতে পারিলাম না। আরো ঢের এমন কারণ খুজে পাওয়া যেতে পারে, যার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক ছিল। আবার এমনও অনেকগুলি বিষয় আছে, যা ইংরাজ পরিবারের ইংরাজের সহিত একত্রে বাস না ক'রলে সম্যক্ প্রণিধান করা যায় না। সেজন্য আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি পাঠকদিগের নিকট ইংলিস-হোমের এক অতি অসম্পূর্ণ চিত্রই স্থাপন করছি। আমি সেজন্য পাঠক সাধারণের নিকট ক্ষমা চেয়ে এই আশা করছি, যদি তাঁরা এই অসম্পূর্ণ চিত্র হতেও ইংলিস-হোমের ইংরাজ গার্হস্থ্য-জীবনের মোটামুটি একটা ভাব ধারণায় আনতে পারেন, তাহলেও আমি সুখী হব। ইংলিস-হোমের যে সহস্র সৌন্দর্য্য আছে, সহস্র আকর্ষণ আছে, সহস্র অতি সুফলপ্রসূ প্রাধান্য আছে; আর সেই জন্যই যে ইংরাজের ঘর ইংরাজের নিকট (অবশ্য, কার ঘর নিজের নিকট প্রিয় নয়?) এত প্রিয়, এত মধুময়; আর ইংরাজের ঘর এত অশেষ সুখের আকর বলে, এত নানাবিধ সুখ, আরাম ও শান্তি-পূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত বলে, এত সমূহ দৈহিক ও মানসিক উন্নতির অনুকূল বলে,—ইংরাজের ঘরে ইংরাজ-সন্তান মহত্ত্বের দোলায় জন্মগ্রহণ করে, জগতের সমুন্নত মঞ্চে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে পূজ্য হয়, —পাঠকেরা যদি এইটুকু বুঝতে পারেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে মনে ক'রব। আর এই প্রবন্ধ পড়ে, যদি পাঠক পাঠিকাদের কেহ আপন ঘরে ইংলিস-হোমের আদর্শ অনুকরণ ক'রতে এক বিন্দুও ইচ্ছুক বোধ করেন, তাহলে লেখক আপনাকে নিতান্তই ধন্য মনে ক'রবেন।

আজ আর না। বাঙ্গালির শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠলে যা হয়, আমারও এ দেশে বাসও তাই হয়ে পড়ল। কেননা, প্রস্তাব আরম্ভ ক'রবার পূর্ব্বে ভাবি নাই যে, এ প্রস্তাবের কলেবর উপদেশের ছড়াছড়ি ক'রব। সামান্য পত্রের মধ্যে ইংরাজ ঘরের দুটো কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। তা দেখুন, ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক গরম হয়ে উঠল, আর আপনার নিরীহ ও সহিষ্ণু পাঠক পাঠিকার উপর উপদেশ উদ্গীরণ করে ব'সলাম। আমাদের দেশে উপদেশের অভাব নাই, উপদেশ পালনের অভাব; আদর্শ আঁকবার অভাব নাই,

আদর্শ হইবার অভাব। যাহোক্, পাঠকেরা যেন সেজন্য লেখককে ক্ষমা করেন।

আমি এ প্রবন্ধ শেষ ক'রতে যাব মনে ক'রছি, এমন সময়ে একটী ইংরাজি সংগীতের কথা মনে প'ড়ল। সংগীতটীর নাম "Home, Sweet Home." বোধ হয়, আপনার পাঠকেরা অন্ততঃ তাঁহাদের কেহ কেহ এই সঙ্গীতটী জানেন। স্বদেশের গৌরব ও মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সংগীত ও পদ্য নানা দেশের নানা ভাষায় আছে। আমরা পড়ি ও শুনি। কিন্তু নিজের "ঘরের" জন্য, নিজ ঘরের মধুরতা মনে করে, করুণ-স্মৃতিতে উদ্বেলিত হ'য়ে, কোন কবি, কোন গীত-রচক কোন ভাষায় কোন গান রচনা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না। আপনি কি জানেন, আমাদের বাঙ্গালায় নিজের ঘরের জন্য কেহ কোন গান বেঁধেছেন কি না? আমার বিবেচনায় ইংরাজী Home Sweet Home গানটীই, ইংলিস হোম যে প্রকৃতই অতি সুন্দর, মধুময়, তার আর একটী প্রমাণ। আপনার পাঠকদিগের জন্য সংগীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করে আজ বিদায় নিলাম।

'Mid pleasures and palaces though we may roam,
Be it ever so humble, there's no place like home.
A charm from the skies seems to hallow us there,
Which, seek through the world, is not met with elsewhere,
An exile from home, splendour dazzles in vain.
Oh, give my lowly thatched cottage again!
The birds singing gayly that came at my call,
Give me with them that peace of mind, dearer than all.

Chorus
Home! Home! Sweet, sweet Home!
There's no place like home.
There's no place like home.

শ্রীপতি রায়।

বিরহের সুখ।

আহা কি বাঁশির গান,
আহা কি প্রেমের তান,
কে যেন নূতন করি' শুনাল আমায়!
নব সৌন্দর্য্যের ঘরে,
ফুল মল্লি থরে থরে,
নয়ন ভরিয়া দেখি' জুড়াইল কায়।

নলিনী লাবণ্যময়—
মধুর নয়ন দ্বয়
আধ সরমেতে যেন করিল ইঙ্গিত,
লাজ ভরে ভালবাসা,
করেনি প্রকাশ আশা,
কুটিল চাহনি তার গাহিল কি গীত।

আপনি আপনা ভুলে
লইনু হৃদয়ে তুলে,
সুখ-স্বপনের-মাঝে হইনু মগন।

আদরিণি! সোহাগিনি!
প্রেমময়ি শিখরিণি!
এইরূপ করিলাম কত সম্বোধন;

নিদ্রাল সে কলেবর,
কেঁপেছিল থর থর,
প্রতি শিরা বুঝেছিল মরণের সুখ।
আপন-আনন্দ দিয়ে
চরাচর ভাসাইয়ে,
দেখেছিনু প্রীতিভরে প্রকৃতির মুখ।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেইক্ষণ
হ'ল শুভ আলিঙ্গন,
সুষমার চলস্রোতে ভাসিল অবনী;
গুঞ্জরিল ভ্রমরায়,
বহিল বসন্ত বায়,
বিভাসিত হ'ল প্রাণে প্রণয়ের মণি।

মণি-স্নিগ্ধ হাত খানি,
বুকেতে লইনু টানি,
পরশে হৃদয়-তন্ত্রী উঠিল রণিয়া,
মনে হল সে সময়,
বিশ্ব শুধু মধুময়,
ঊষা যেন স্বর্ণ-স্রোতে গিয়াছে গলিয়া!

দরশ—মাধুর্য্যে ঢাকা,
পরশ—সুধায় মাখা,
পবিত্র সে পরশের মধু বিনিময়;
তার মাঝে শরমের
আধ ফোটা মরমের
দুটী কথা মন্ত্রমুগ্ধ করিল হৃদয়!

ভুলে গিয়ে শতকাজ
কুহুকণ্ঠে ঋতুরাজ
মিলন মন্দার-বনে ধীরে দাঁড়াইল!
গুঞ্জরি ভ্রমরী-বেণু
মাখি অঙ্গে পুষ্পরেণু
গুণ গুণি বেহাগেতে প্রাণ মাতাইল।

যেন অমৃতের ধারা
ভাবে-ঘেরা অর্থ হারা,
কি যে সেই আধফোটা লাজময়ী বাণী;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
এখনো কি মোহভরে,
সেই বাসরেরে লয়ে করে টানাটানি?

কাল নীরদের প্রায়,
কাল বিরহের গায়,
স্বর্ণ-প্রভা প্রেমরবি ছড়ায়েছে কর;
তাই বিরহের তনু,
হীরকে জড়িত যনু,
তাই তার ব্যবধান এত মনোহর।

কত যেন অনুরাগে
স্নিগ্ধ-স্মৃতি প্রাণে জাগে,
অতীত হইয়া আছে চির বর্ত্তমান;
সুখের রোদন লাগি,
বিরহ রয়েছে জাগি,
দুঃখ যেন হয়ে গেছে প্রিয়ার সমান।

ইন্দ্রজাল প্রসারিয়া
পরিমল ছড়াইয়া,
ফুল-মালা পরা স্বপ্ন জেগে থাক্ প্রাণে।
বাসনার কিসলয়ে
তোমা বসাইয়া ভয়ে
তার প্রাণে চেয়ে রব মোহিত নয়ানে॥

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণবদর্শন। (৮)

৭৮। যে সকল প্রক্রিয়া ও সাধনানুগত হইয়া, পরমাত্মতত্ত্ব লাভোপযোগী অভিনব জাতীয় ইন্দ্রিয় সংস্থান প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছু কিছু বিবৃতির এখানে প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে। তদুদ্দেশে এই পর্য্যন্ত বক্তব্য হইতে পারে যে, জৈবিক ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ন্যায় এখানেও দুই বিভিন্ন দিক—বিপরীত দিক হইতে আনুসঙ্গিক আনুকূল্য আসিয়া, এই পারমাত্মিক ইন্দ্রিয়গ্রামের স্ফূর্ত্তি-সম্পাদনে সহায় হইয়া থাকে। স্থূলাদি দেহ জরায়ুমধ্যে গঠন-সম্পন্ন হইলে, ইন্দ্রিয়োৎপাদক চিদাত্মক অনুকণাপুঞ্জ (molecules) যে সমস্ত তথনও পর্য্যন্ত তন্মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহারা বাহ্য সংশ্রবে আসিবার বা গর্ভাগার মুক্ত হইবার পরক্ষণ হইতেই সেই গঠিত দেহের সর্ব্ব-স্থল হইতে যথাযথ ইন্দ্রিয়-স্থানে

আকৃষ্ট সমাগত ও সংস্থিত হইয়া, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই এক দিক—ইহা স্বকীয় দেহের দিক। অপর দিক্—বাহিরের দিক্—সেই দেহের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র দিক্। আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতের বা তন্মাত্রের অনুকণাপুঞ্জও সহজভাবে ও ব্যক্তোন্মুখ ইন্দ্রিয় চেষ্টা যোগে সমাকৃষ্ট হইয়া, যথাযথ ইন্দ্রিয় স্থানে আসিয়া, ক্রমশঃ সংস্থান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সৃষ্টির পূর্ণতা সম্পাদন করে। ভাবাঙ্গে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি স্থলেও ঠিক এই একইরূপ নিয়ম প্রণালী। এখানেও বিষয়ীর পূর্ব্বসৃষ্ট ভাবদেহ এবং সাধু-সজ্জনগণের ভাবাঙ্গভূত ইন্দ্রিয়োৎপাদক নিরঞ্জন অনুকণাপুঞ্জ এই দুই ভিন্নদিক—বিপরীত দিক্ হইতে, সেই ভাবাঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রামের সংস্থান হয়। বিষয়ীর ভাবদেহের গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া, আত্মতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি লব্ধ হইলে, নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়োৎপাদক ভাব-ঘন অনুকণাপুঞ্জ স্বতঃই সেই দেহ মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। সেই ভাবদেহ যোগে যুক্তাত্মা হইয়া, আবশ্যকস্থলে, অনাত্ম বিষয়-রাজ্যের বিষয়পুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হইতে হইতে, বিষয়রাজ্যের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের সংস্পর্শে তাহার স্বকীয় ভাবাঙ্গভূত অনুকণাপুঞ্জ তদীয় যথাযথ ইন্দ্রিয়স্থানে আসিয়া ক্রমশঃ সংস্থিত হইতে থাকে। সেই শব্দ-স্পর্শাদির সঙ্গে ইষ্টবুদ্ধিতে, ইষ্টদৃষ্টিতে, ইষ্টভাবে, ভক্তিতে প্রেমেতে, পরকীয়া বুদ্ধিতে সংযুক্ত হইতে হইতে, পক্ষান্তরে সে সময় পুরাতন ঔদাস্য ভাব, বৈরাগ্যভাব, ভাববিহীন তাচ্ছিল্যভাব, অন্যমনস্কভাব, ও স্বকীয়াবুদ্ধি সযত্নে পরিহার করিতে করিতে, সেই ভাবাঙ্গভূত নিরঞ্জন চিৎকণাপুঞ্জ ক্রমশঃ যথাযথ স্থানে আকৃষ্ট হইয়া, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং যথাসময়ে এই অভিনব ইন্দ্রিয়গ্রাম উৎপাদন করে। এ সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকেও সকাম বুদ্ধিতে, সকাম কার্য্যে নিয়োজিত না রাখিয়া, ইষ্ট সেবায়—পরমাত্ম-সেবার ভাবে সাংসারিক নিত্য কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিতে হয়। এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়-যোগে ইষ্ট-সেবায় নিরত ও নিযুক্ত হইতে হইবে,—যাবতীয় ইন্দ্রিয় কার্য্য শ্রীকৃষ্ণে, ভগবানে সমর্পণ করিয়া আমিত্ব-মল-মুক্ত, আনন্দ-বিধৌত ও পবিত্র করিতে হইবে। এইরূপে ভাবাঙ্গভূত ইন্দ্রিয়োৎপাদক পদার্থপুঞ্জ যথাযথ স্থানে সমাগত হইয়া, বিষয়ীর ইন্দ্রিয় গ্রাম প্রস্ফুটিত করিতে থাকে। এই গেল, স্বকীয় ভাবাঙ্গের দিক্। অপরদিক্—বাহিরের দিক,—সেই ভাবদেহের বহির্ভূত দিক্—পরকীয় দিক্। এখানেও এই বহির্ভূত ও পরকীয় দিক্ হইতে পূর্ব্বানুরূপ আনুকূল্য চাই। সে দিক্ এখানে সাধু সজ্জনের দিক্। —নিরঞ্জন বিষয় রাজ্যের দিক্। এই সাধু সজ্জনগণের ভাবাঙ্গভূত দেহের সাক্ষাৎ সন্নিধান প্রাপ্ত হওয়া চাই। সেই সন্নিধানে সেই নিরঞ্জন অঙ্গভূত অনুকণাপুঞ্জও শিষ্য বিষয়ীর ভাবদেহে সংগত ও সাধিষ্ঠিত হইয়া, যথাযথ ইন্দ্রিয় স্থানে আসিয়া, ইন্দ্রিয়োৎপত্তির পূর্ণতা সম্পাদন করে। যেমন সূর্য্য-রশ্মি সন্নিপাতে, অনাত্ম বিষয়পুঞ্জে দর্শনেন্দ্রিয় নির্ম্মাণোপযোগী, চিদাত্মক অনুকণা সমূহ উৎপন্ন হয়; সেইরূপ সাধু-সজ্জনগণের দৃষ্টি রশ্মি, জাল শিষ্য চক্ষের—শিষ্যদেহের উপর এবং শিষ্যের দৃষ্টিজাল সাধু-সজ্জন দেহের উপর অহরহ নিপতিত হইতে হইতে—তাহাদের অন্তরঙ্গ দেহভূত—চন্মভূত বা তত্ত্বজ্যোতীভূত নিরঞ্জন চিৎকণাপুঞ্জও, তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইতে, সেখানে পারমাত্মিক দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহারিক বিকাশ হইতে থাকে।

তাঁহাদের ভাবাঙ্গ-বিগলিত বাক্যামৃত, বিষয়ীর নাদ-পিপাসু কর্ণ-কুহরে অনবরত সিঞ্চিত হইতে হইতে, তদ্দ্বারা সেই ভাবদেহে পারমাত্মিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ সংস্থান সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের শ্রী-অঙ্গ-সংস্পর্শে ও সেবা শুশ্রূষায়, তাঁহাদের ভাবাঙ্গ নিঃসৃত স্পর্শাত্মক পদার্থপুঞ্জদ্বারা শিষ্যের ভগবদ্দেহে, তাহার পারমাত্মিক স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারিক স্ফুরণ হইতে থাকে। অনুক্ষণ তাঁহাদের ভাবাঙ্গভূত তুরীয় পরিমলপূর্ণ অঙ্গ-সৌরভ শিষ্যের ভাবাঙ্গভূত নাশাপ্রদেশ স্পর্শ করিতে করিতে, সেখানে তদ্দ্বারা পারমাত্মিক ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বহির্ম্মুখে সংজাত হইতে আরম্ভ হয়। সেইরূপ তাহাদের প্রসাদান্ন ভক্তিপূর্ব্বক সেবন করিতে করিতে অনুগতজনের ভাবাঙ্গে পারমাত্মিক রসনেন্দ্রিয় বহির্ম্মুখী স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন হইতে থাকে। যেরূপ শব্দ-স্পর্শরূপ রস-গন্ধাত্মক অপূর্ব্ব চিৎশক্তিসম্পন্ন অনুকণ পুঞ্জ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ ভাবে সাধু সজ্জনরূপ নিরঞ্জন বিষয়রাজ্যের ভাবাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ নিসৃত আনন্দঘন চিৎকণাপুঞ্জ (Spiritual molecules) হইতে বিষয়ীর ভাবাঙ্গে এই পারমাত্মিক ইন্দ্রিয়গ্রামের সংস্থান সম্পাদিত হইয়া, এই পারমাত্মিক বাহ্যস্ফূর্ত্তি লব্ধ হইয়া থাকে। এই বাহ্যস্ফূর্ত্তি স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে ভাবেন্দ্রিয়ে পরিণত করিয়া—সেই স্থূল অসার অঙ্গ সারাঙ্গে রূপান্তরিত করিয় প্রকাশ পায়।

৭৯। এই পারমাত্মিক বাহ্যস্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইতে না হইতে, বিষয়ীর ভাবদেহ, পরানন্দময়, প্রেমময়, মহাভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহে পরিণত হইয়া, জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে আনিয়া, তাহাকে সংস্থাপন করিল। সেই দেহাতীত দেহপুরে—সেই ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়পুরে—সেই পঞ্চকোষাতীত "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" যেখানে "বিরজম্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্" সেইখানেই সর্ব্বভূতে সর্ব্বঘটে সমষ্টীভূত এক অখণ্ড পরমাত্মতত্ত্ব ব্যবহারিক ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সেখানে পরমাত্ম তত্ত্বসম্পন্ন সদ্গুরু বা সাধুরূপ নির্ম্মল বিষয় দর্পণে বিষয়ীর প্রেমদৃষ্টিপাত হইবামাত্র, সেই দৃষ্টি তখন তন্ময় হইয়া অন্তর্ম্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল ও আপনার পরম সুন্দর, পরম নিরঞ্জন পরমাত্মস্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, যথার্থই পরম কৃতার্থ হইল। আপনার স্বকীয় স্বরূপে ও সদ্গুরু বা সাধুরূপ পরকীয় পরমাত্ম স্বরূপে, আপনার মহাভাবময় সমষ্টীভূত অখণ্ড বিরাট স্বরূপ দর্শনে উভয়েই একাকার ধারণ করিয়া প্রতিভাত হইল। বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই পরানন্দ ঘন অভিন্ন স্বরূপ হইয়া একাকার হইয়া, বিষয়ীর নবজাত ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রতিভাসিত যাবতীয় পদার্থে অখণ্ডরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উভয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দে, পরমাত্মে, একাকার হইয়া ব্যবহারিক অদ্বৈত ভাবের উদয় হইল।

"হায় একি হ'ল অবশেষে,
ছিল একটু জমি তুমি আমি,
তাওত রসে, যায় গো ভেসে।"

৮০। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে, বিষয়ীর বিষয় বিশেষের তদাকার প্রাপ্তি কালীন যে মিলন, তাহা অবশ্যই তৎকালে তাহার তদেকত্ব বিজ্ঞাপন হেতু অভিন্ন ভাবের মিলন। বিষয়ের আকার, জ্ঞান রাজ্যের অপরিজ্ঞাত, অস্ফূর্ত্ত, অব্যক্ত প্রদেশ হইতে শুভযোগের সুসংযোগে, সহসা তদঙ্গে স্ফূরিত হইয়া, তাহার ব্যবহারিক বিষয়-জ্ঞানের কারণ হইল এবং

সেই বিষয়ের ব্যবহারিক রূপগুণাদি স্ফূর্ত্তির তারতম্যানুসারে, বিষয়ীর জ্ঞানাঙ্গের স্মৃতি-মূলে অল্লাধিক স্থায়ীচিহ্ন অঙ্কিত রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপে বিষয়ীর জ্ঞানাঙ্গে নবীনতর মূর্ত্তি সমূহ সতত উদয় হইয়া, ব্যবহারিক ভাবে তাহাকে তদাকারে আকারিত করিয়া; তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। বিষয়ী এইরূপে নব নব বিষয়াকারে, ব্যবহারিক পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, বিষয়-স্রোতে ভাসমান হইয়া যাইতে লাগিল; কুত্রাপি কখনও সেই জ্ঞান-সমুদ্রোত্থিত বিষয়পুঞ্জ বিষয়ীর আকার ধারণ করিয়া, তাহার সংে আত্মসাৎ বা তন্ময় হইয়া, তাহাকে তাহার আত্মপরিচয় প্রদান করিল না, তাহার আত্মমর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাপন করিল না। তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত, নিজ নিজ কাহিনী সংগোপন করিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। তাহারা না জানি, কি দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে, অণুক্ষণ স্বতন্ত্র থাকিয়া, বিষয়ীকে তদাকার সাৎ, আত্মসাৎ করিয়াও আত্ম কবলিত করিয়াও তদেকত্ব বুঝিতে দেয় না। তাহারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া, বিষয়ীর সঙ্গে আত্মসাৎ হইতে, বিষয়ীর আকারে পরিণত হইতে, বিষয়ীর কবলে কবলিত হইতে তাহারা কোন ক্রমেই স্বীকৃত হয় না। এই রূপ সাধন-বৈপথ্যে পড়িয়া, সাধক রামপ্রসাদ প্রকৃতিকে—বিষয় রাজ্যকে মাতৃ বা তারা সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"তারা এবার আমি তোমায় খাব,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
ভাল করে বুঝে লব।"

য়ীহুদীয় অবতারাখ্য খ্রীষ্টপ্রভু নির্ম্মল বিষয়ের প্রতিভূ হইয়া, শিষ্যগণকে গুরু দেহকবলিত Lord's Supper করিবার সাধন ইঙ্গিত উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের আত্মকবলিত না হইলে, প্রকৃত আত্মিতত্ত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে না, ব্যবহারিক অদ্বৈত জ্ঞানও উদয় হইতে পারে না। এই প্রকৃত মিশামিশির প্রকৃত আদান প্রদানের, প্রকৃত বিষয় কবলিত হইয়া, সেই বিষয়কে কবলিত করিবার, আত্মসাৎ হইয়া, আত্ম-সাৎ করিবার, এক কথায় "খাওয়া খায়ীর" অসদ্ভাবে ব্যবহারিক আত্মজ্ঞান ও অদ্বৈত তত্ত্ব স্ফূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য অনাত্ম প্রকোষ্ঠে লোকের যে অদ্বৈতবাদ, তাহা অসারগর্ভ, শূন্যগর্ভ শুদ্ধ মতানুগত অনুমানাত্মক অস্থির প্রাণ অদ্বৈতবাদ মাত্র হইবেই হইবে। শুষ্ক যুক্তি-তর্কোপরি সংস্থাপিত দার্শনিক অদ্বৈতবাদ মাত্র হইবেই হইবে। স্থিরতর অটলভূমির উপর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত না হওয়াতে, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অনুভূতির উপর সংস্থান লাভ না পাওয়াতে, এরূপ অদ্বৈতবাদকে সংশয়ের হিল্লোলে সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতে হইবেই হইবে। এরূপ অদ্বৈতবাদে আত্মপর ভেদভাব তিরোহিত হইয়া, সর্ব্বত্র স্বভাবসিদ্ধ প্রেমস্ফূর্ত্তি হইবার কোন উপায় ও সম্ভাবনা নাই।

৮১। জ্ঞানের আত্ম-প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর, অন্তরঙ্গ-সম্পন্ন আত্মস্থ বিষয়ের স্বরূপ ও তদাকার প্রাপ্তিকালীন, অন্তরঙ্গে অন্তরঙ্গে যে ব্যবহারিক মিলন, তাহাও অবশ্যই তৎকালে পূর্ব্বানুরূপ তদেকত্ব-বিজ্ঞাপন-হেতু অভিন্ন ভাবের মিলন। অনাত্ম-প্রকোষ্ঠে এই মিলনের প্রথম সূত্রপাত। সেখানে বিষয়ী সর্ব্বাদৌ সাধু সজ্জনরূপ বিষয়ের বাহ্যাকার পরিগ্রহণ করে এবং তদনন্তর সংসর্গ, সহবাস, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ও আনুগত্য প্রভৃতির দ্বারা সেই সারবান বিষয়ের স্বরূপ সাগরে ডুবিতে ডুবিতে ক্রমশঃ সেই বিষয়ের অন্তরঙ্গকৃত তন্ময়ত্ব লাভ করিতে থাকে, এইরূপে বিষয়ী যথাসময়ে সেই

বিষয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশের তলদেশ প্রাপ্ত হইবা মাত্র, সেই সারবান বিষয়ের স্বরূপে ব্যবহারিক ভাবে পরিণত হইয়া, আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর অসার আমিত্ব ক্রমাগত তুমিত্ব-স্রোতে ভাসমান ও নীয়মান হইয়া থাকে, তাহাতে সে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিবার কোন উপায় ও অবসর প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এ প্রকোষ্ঠে সেই আমিত্ব তুমিত্বে পরিণত হইয়া যেখানে নিরস্ত হয় না। বিষয়ের স্বচ্ছত্ব নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত, সেই তুমিত্ব সেখানে আমিত্বভূত, আমিত্বগত হইয়া বিষয়ীর আত্ম-স্বরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বত্রই স্বচ্ছ দর্পণে নিপতিত হইলে স্বাভিমুখে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে। ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এখানে যে পরিমাণে এই আমিত্ব তুমিত্বে পরিণত হয়, সেই পরিমাণে সেই তুমিত্ব ও আমিত্ব গত হইতে থাকে। এখানে যে পরিমাণে সাধু-সজ্জনে আত্ম সমর্পণ, সেই পরিমাণে তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ।

"যেমনি দেনা, তেমনি জেনা,
নগদ বিক্রি ধার রাখে না"

তাই এ প্রকোষ্ঠে এই তুমিত্ব স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় আমিত্ব-ময় হইয়া আত্মস্বরূপ সাক্ষাতের কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠে এই আমি ক্রমাগত তুমিত্বের স্রোতে নীয়মান হইয়া আত্মবঞ্চিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, এখন সেই তুমি তোমার অপার কৃপাগুণে 'আমি' হইয়া—নববেশ ধরিয়া—আমার সঙ্গে আসিয়া একাত্ম হইলে।

"আমি আমি কি তুমি আমি,
আমি কিছুই বুঝিতে নারি।"
"ও আকার অবয়ব, আমাতে দেখ সে সব,
তুমি কি দেখিছ মোর ও আকার ধারী?"

এখানকার এই ভাব। এই তুমি এখানে স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণ, জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে তাহা আত্মগ্রাসী, আত্মাবরক মলিন পদার্থ মাত্র। এই অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব-মিলনে জ্ঞানাঙ্গে যে প্রগাঢ় আত্ম-চিহ্ন অঙ্কিত হয়, তাহা ইষ্টবুদ্ধি বিহীন ভাবে, অন্যজাতীয় বিষয়ের অহরহ তদাকার প্রাপ্তি সত্ত্বেও শীঘ্র অপনীত হইবার নহে, এবং তাহা আত্মস্থ বা পরমাত্মস্থ অন্যান্য সারবান বিষয়ের সংশ্রবে আরও প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। তদ্দ্বারা পূর্ব্বচিহ্ন কোন ক্রমেই ভঙ্গ বা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। এ অবস্থার অদ্বৈতবাদ তাদৃশ মতানুগত, অনুমানাত্মক অদ্বৈতবাদ নহে। তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্থিরতর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিষয়ীর তখন অন্ততঃ এই আদ্যন্তবিহীন বিষয় রাজ্যের এক ক্ষুদ্রাংশেও এই উভয়ের স্বরূপতঃ ঐক্যজ্ঞান অনুভাত হইয়া, তাহার সংস্কার-নিহিত দ্বৈতজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল। সমাধি-সমুদ্রে স্নাত হইয়া জ্ঞানের পুনর্জ্জন্ম লাভ হওয়াতে বিষয়ীর অন্তরে ব্যবহারিক অদ্বৈত ভাবের বীজ রোপিত হইয়াছিল। এখানকার এই অদ্বৈতবাদ মূলহীন অসার মতগর্ভ অদ্বৈতবাদ নহে। তাহা স্থিরতর অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা কার্য্যক্ষেত্রে আত্মপর ভেদভাব তিরোহিত করিয়া স্বভাব-সিদ্ধ সম দৃষ্টি স্ফূর্ত্তির কারণ হইয়া থাকে।

৮২। কিন্তু জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে পরমাত্ম তত্ত্ব সম্পন্ন বিষয়ের সঙ্গে তদাকারত্ব, তদেকত্ব বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি হেতু বিষয়ীর ব্যবহারিক মিলনই প্রকৃত স্বরূপগত অভিন্ন ভাবের মিলন। এই যারপরনাই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মিলনে বিষয় ও বিষয়ী, গুরু ও শিষ্য, ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ,